মুর্শিদকুলী খাঁ

মুর্শিদকুলী খাঁ

সমরেশ বসু

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য
মুদ্রাকর : ভোলানাথ পাল : তনুশ্রী প্রিণ্টার্স : ৪/১ই, বিডন রো, কলিকাতা-৬

মুর্শিদকুলী খাঁ

ঢাকা—জাহাঙ্গীর নগর।

সুবাদারের প্রাসাদ। সামনে প্রাচীরঘেরা বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। তারপর সড়ক। অনেক দূরে নদী। প্রাসাদের অলিন্দে একটি আরামপ্রদ আসনে বসে সেই নদী-তীরবর্তী কর্মব্যস্ততা অবলোকন করছিল স্বয়ং সুবাদার আজিমউদ্দিন।

গ্রীষ্মের উত্তপ্ত মধ্যাহ্ন অনেকটা গড়িয়ে গিয়েছে। তবু উষ্ণ বাতাসের হল্‌কা এসে লাগছে চোখে মুখে। আগ্রার উত্তাপ অনেক গুণ বেশী। তবু সওয়া যায়। এখানকার গরম খালবিল নদী নালা থেকে যতটা সম্ভব জলীয় বাষ্প নিয়ে এসে শরীরকে অস্বস্তিতে ফেলে বড়। অথচ কেটে গেল প্রায় চার বছর। হ্যাঁ, আরও বেশ কয়েক বছর কাটাতে চায় সে। তার টাকার দরকার। হিন্দুস্থানের তখ্‌ত্‌-তাউসে বাবাকে কিংবা নিজেকে বসাবার জন্যে অনেক—অনেক টাকার প্রয়োজন তার। বাংলার সুবাদার সে। কিন্তু তাই বলে, একথা ভুলতে পারে না যে, মুঘল বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের পৌত্রও সে। তার পিতা বাদশাহের জীবিত পুত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। ভুলতে পারে না সে একথা—মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারে না। তাই দূরে নদীর তীরে বড় বড় নৌকো আর জাহাজ নির্মাণরত সূত্রধরদের ব্যস্ততা তার মনকে নাড়া দেয় না। অথচ এই সূত্রধরেরা জগৎ বিখ্যাত। নদীতে ভাসমান গহনা নৌকোগুলোর বৈচিত্র্যও তার হৃদয়ে, শুধু আজ বলে নয়, প্রথম যখন এসেছিল তখনও কোনো ঔৎসুক্য জাগায় নি। প্রথম থেকেই সে জানে, রাজধানী থেকে এত দূরে এই সুদূর অস্বাস্থ্যকর প্রান্তে পড়ে আছে শুধু অর্থের জন্যে। তার পিতৃব্য শাজাহান-পুত্র সুজা সেইজন্যে এসেছিল, শায়েস্তা খাঁয়েরও উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন। এছাড়া ফিদাই খাঁ, শাহজাদা মুহম্মদ আজম, খান-ই-জহান বাহাদুর, ইব্রাহিম খাঁ সবার লক্ষ্য ছিল একই। নইলে এখানে কে থাকে? কদিন পরেই তো বর্ষা নামবে। কী নিদারুণ অবস্থা হবে পথ পথঘাটের—ভাবা যায় না। শায়েস্তা খাঁয়ের মত বিপুল অর্থ নিয়ে যেতে পারলে এভাবে থেকেও সুখ।

কিন্তু তা বোধহয় সম্ভব হবে না। স্বয়ং বাদশাহ যে তার প্রতি স্নেহপ্রবণ হয়েও এমন কাজ করবেন কে জানত! তিনি শত্রুতা করেছেন। হ্যাঁ, জেনেশুনেই শত্রুতা করেছেন। শত্রুর তো অভাব নেই। কেউ তাঁকে বলেছে, রাজকোষে অর্থ জমা দেবার চেয়েও ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য বৃদ্ধিতে তার ঝোঁক বেশী। তাই বাদশাহ একজন নতুন মানুষকে দেওয়ান করে পাঠিয়েছেন তার ওপর খবরদারী করতে। হ্যাঁ, দেখেশুনে

ভেবে চিন্তে পরখ করে তবেই পাঠিয়েছেন লোকটিকে। নইলে এত অল্প সময়ের মধ্যে এভাবে তার অর্থ উপার্জনের প্রতিটি পথ রুদ্ধ করে দিল কোন্ যাদুবলে?

ভাবতে ভাবতে মাথার ভেতরটা গরম হয়ে ওঠে আজিমউদ্দিনের। বাদশাহ নিজে তৈমুর বংশের হয়ে তাঁরই রক্তধারা যার ধমনীতে প্রবাহমান, তার মাথা এভাবে হেট করে দিলেন একজন অজ্ঞাতকুলশীল মানুষের কাছে? অজ্ঞাতকুলশীল তো বটেই। লোকটার জন্ম খানদানী মুসলমান বংশেও নয়। এখানকারই কোন এক হিন্দু ব্রাহ্মণের সন্তান নাকি। বাদশাহ কি জানতেন না একথা। বাদশাহ আলমগীর না জেনে শুনে তো কোন কাজ করেন না।

সূর্য আরও নীচে নামে। আজিমউদ্দিন লক্ষ্য করে তার দুই পুত্র করিমউদ্দিন আর ফারুকশিয়ার দুটো ঘোড়ায় চেপে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে সড়কের দিকে যাচ্ছে। দুজনেই কৈশোরে পা দিয়েছে বেশ কিছুদিন হলো। সে নিজে আর নিজেকে তরুণ বলতে পারে না। তার পিতা মহম্মদ মুয়াজিম তো প্রায় বৃদ্ধ। তবু বাদশাহ আলমগীর বহাল তবিয়তে রাজত্ব করে চলেছেন। বিধাতা এক একজনকে বড় বেশী পাইয়ে দেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আজিম। সেই সময় খুব সুপরিচিত আতরের সুঘ্রাণ পায় সে। জানে, পেছন দিকে হাত বাড়ালেই একগুচ্ছ ঘন নরম কেশদামের সঙ্গে একটি মসৃণ গ্রীবা তার হাতের বেষ্টনীতে ধরা পড়বে। তবু নিশ্চেষ্ট বসে থাকে সে। পৃথিবীটাকে বড় বেশী নীরস, বর্ণহীন আর নিরর্থক বলে মনে হয় তার কাছে। তবে বেগম সাহেবউন্নিসা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে জেনে সে তৃপ্তি পায়। এককালে বেগম তার তারুণ্যে যেমন আগুন লাগিয়েছিল, এখন তেমনি সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে পারে। এমন বাস্তববাদী নারী তার প্রথম জীবনের উদ্ভট ক্রিয়াকলাপ কীভাবে হাসিমুখে মেনে নিত, সায় দিত, সেকথা আজিম প্রায়ই ভাবে। সাহেবউন্নিসা শুধু তার বেগম নয় এখন, তার পরামর্শদাতাও বটে।

পেছন থেকে সুমিষ্ট কণ্ঠে উচ্চারিত হয়—সুবাদার সাহেব বড় বেশী অন্যমনস্ক আজ। আমি জানি—

চকিতে পেছনে ফিরে আজিম প্রশ্ন করে—কী জান?

—তোমার মনের কোথায় কাঁটা বিঁধছে সেই খবর আমি রাখি।

—না রাখলেই অবাক হতাম।

সাহেবউন্নিসা হেসে ফেলে বলে—তার জন্যে এভাবে মুখ গোমড়া করে বসে থাকলে কাজ হবে?

বেগমকে হাত ধরে টেনে কাছে বসিয়ে বলে—কি করতে বল তুমি?

—সরিয়ে ফেল।

—কি বললে?

বেগম সাহেবার যে আয়ত নেত্রের বিলোল কটাক্ষ এককালে আজিমকে সম্মোহিত

করে রাখত, এখনো যা তাকে মুগ্ধ করে, সেই চোখের দৃষ্টি ঝলসে ওঠে। বাদশা-জাদার হাতের ওপর চাপ দিয়ে বেগম বলে—ঠিকই বলছি। আরও স্পষ্ট ভাষায় যদি শুনতে চাও তো বলি, মহম্মদ হাদিকে, যাকে বাদশাহ নাম দিয়েছেন কারতলব খাঁ, তাকে সরিয়ে ফেল ঝটপট্।

—তবু স্পষ্ট হলো না। কোথায় সরাব? উড়িষ্যায়? বিহারে?

—না, মাটির নীচে।

আজিমউদ্দিন চুপ হয়ে যায়। তার মনের অতি নিভৃতে যে বাসনা বাসা বেঁধেছিল, সেটি আজ ভাষা পেল।

—হুঁ। শেষ পর্যন্ত বোধহয় ওই পথই নিতে হবে।

—শেষ পর্যন্ত? বলছ কি তুমি বাদশাহজাদা? যার লক্ষ্য দিল্লী আর আগ্রার তখ্ত্-তাউস্ তাকে আরও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সময় খুব কম। বাদশাহ আলমগীরের বয়স নব্বই ছুঁই ছুঁই। কোন ব্যাপারে হোঁচট খেলে, অন্য একজন এগিয়ে যাবে তোমাকে পেছনে ফেলে।

আজিম উঠে দাঁড়ায়—ঠিক। আজই ব্যবস্থা নিতে হবে।

—কিন্তু কী করে?

—হ্যাঁ, কী করে?

—তোমাকে একটা কথা বলব? কিছু মনে করবে না?

—না। তুমি তো জানই, তোমার যৌবনের দাম ষোল আনা দিই না বটে, হাজার হলেও তৈমুর বংশে জন্ম আমার, কিন্তু তোমার মস্তিষ্কের দাম আমি সব সময় দিয়ে থাকি।

বেগম সাহেবার মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটে ওঠে। আজিমের জীবনে সে তো আর একমাত্র নারী নয়। তবু আজিম তাকে সবচাইতে পছন্দ করে, তার পরামর্শের গুরুত্ব দেয় এইটুকুও কম না। তাছাড়া যদি আজিম কখনো দিল্লীর মসনদে বসতে পারে, তাহলে করিম কিংবা ফারুক—দুজনার একজনের কপাল খুলবেই এতো জানা কথা।

সাহেবউন্নিসা বলে,—দেখো, তোমার বুদ্ধি আছে, সাহস আছে। তুমি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ভাল নেতৃত্ব দিতে পার। তুমি তোমার ব্যবহারে আমীর ওমরাহদের তুষ্ট করতে পার। কিন্তু তবু তোমার একটা দুর্বলতা রয়েছে।

আজিমউদ্দিনের ভ্রূকুঞ্চিত হয়। বলে—সেটা কি?

—এক এক সময় কোন অজ্ঞাত কারণে তুমি শত্রুপক্ষকে অবহেলা কর। মাঝে মাঝে ভেবে বসো, তারা দুর্বল। তুমি কখনো সখনো অপরের ছল চাতুরী বুঝতে পার না। অন্যের খোসামোদে তুমি অল্পতেই গলে যাও। তৈমুর বংশের বড়াই করতে হলে, এ দিকটাও ভাবতে হবে।

—আমাকে একটা দৃষ্টান্ত দেখাও।

—ছোটখাটো কত দৃষ্টান্তই আছে। তবে সবচেয়ে শেষের দৃষ্টান্ত এই কারতলব

খাঁয়ের ব্যাপারে। লোকটা মাত্র কয়েক বছর হলো এসেছে। সবাই ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছে তুমি সুবাদার হলেও, আসলে রসদের চাবিকাঠি ওই লোকটির হাতে। তোমার মর্যাদায় ঘা লাগে না? এতদিন নিজে পয়সা উপায় করতে, ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের বন্দোবস্ত ছিল। লোকটা সব বন্ধ করে দিয়েছে একে একে। সে বাদশাহকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পাঠিয়ে তাঁর মন জয় করে নিয়েছে। তুমি সব দেখেও চুপচাপ। এখনো বসে বসে ভাবছ, কী করবে।

আজিমের ইচ্ছে হয়, তার এককালের অতি প্রিয় নারীকে দুহাতে তুলে ওপর থেকে ছুঁড়ে নীচে ফেলে দেয়। কিন্তু না। বেগমসাহেবা ঠিক কথা বলেছে।

সে পায়চারী করতে করতে বলে—আজই ব্যবস্থা নেব। আবদুল ওয়াহেদকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

—সে আবার কে? নাম শুনিনি কখনো।

—নকদি ফৌজ ওর তত্ত্বাবধানে থাকে। দেখি ওকে সম্মত করানো যায় কিনা।

—কী বললে? তুমি না সুবাদার। তোমার কথায় ওরা উঠবে বসবে।

—তা তো জানি বেগমসাহেবা। কিন্তু মাইনাটা নিতে যে ওদের কারতলব খাঁয়ের কাছে হাত পাততে হয়। আসলে ওরা নগদ পয়সার বিনিময়ে কাজ করে। সেইটাকেই একটা উপলক্ষ্য করতে হবে। একদল ফৌজ গিয়ে মাইনা পায়নি এই অজুহাতে লোকটাকে ঘিরে ধরে আক্রমণ করবে।

সাহেবউন্নিসা মনে মনে আজিমউদ্দিনের বুদ্ধির তারিফ না করে পারে না। অথচ এই বুদ্ধির গোড়ায় মাঝে মাঝে ধোঁয়া না দিলে চলে না। এমন ঝিম্ মেরে যায়।

সে বলে—ওসব হলো তোমাদের, মানে পুরুষদের ব্যাপার। তুমি ভাল বুঝবে, কী করতে হবে। আমি শুধু জানি মহম্মদ হাদি বেঁচে থাকতে তুমি সুবাদার হয়েও সম্মান রাখতে পারবে না। এক আকাশে দুই চাঁদ?

এবারে আজিম ক্ষেপে ওঠে।—কি বললে? কাকে চাঁদ বলছ? জান, ওর বাবা খেতে পেত না বলে দেওয়ান হাজি সফি ইস্পাহানীর কাছে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দেয়। তবেই না ও আজ কারতলব খাঁ। ওকে তুমি পবিত্র চাঁদের সঙ্গে তুলনা করছ? তুমি না—

—আমার অপরাধ হয়েছে। তবু ও তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী।

—হ্যাঁ। সেই রকমই চেষ্টা করছে বটে। কিন্তু ওর ধমনীতে কার রক্ত কেউ জানে? আজ ও দেওয়ানীতে এত পারদর্শী তার কারণ ফারসী ভাষা ভাল করে রপ্ত করেছে পারস্য দেশে বহু বছর কাটিয়ে। তারপর ধর্ম বাপ হাজি সফির সঙ্গে সঙ্গে থেকে টাকা পয়সার ব্যাপারটা খুব ভাল বুঝতে শিখেছে। কিন্তু অস্ত্র ধরার বেলায় দেখতে পাবে আবদুল ওয়াহেদের লোকের সামনে কেমন মোরগের মত ছট্ফট্ করতে করতে মরবে।

বেলা পড়ে আসে। নদীর পার ধূসর হয়ে আসে। প্রাচীরের ওপারের সড়কের ওপর মানুষের আনাগোনা। কিছু দূরে একটা বাজার আছে। সেখানে কতরকম দ্রব্যের কেনাবেচা। বিশেষত বস্ত্রশিল্পের বিপুল সম্ভার দেখা যায় ওখানে। বিদেশীদের ভীড় বেশী। বিক্রি হয় সরবতী, মলমল, আলাবালী, তঞ্জীব, তেরিন্দাম, নয়নসুখ, ডুরিয়া, জামদানী আরও কত কি।

দূরে থেকে আজানের শব্দ ভেসে আসে। আজিমউদ্দিন কান পেতে শোনে। এখনি প্রাসাদের বাতিগুলো একে একে জ্বলে উঠবে।

সাহেবউন্নিসা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে বলে—আপনার নমাজের সময় হলো। আমার ধৃষ্টতা মাপ করে দেবেন শাহজাদা।

আজিম অন্যমনস্ক অবস্থায় হাসে। তার মনের মধ্যে দুটি নাম বারবার ঘোরাফেরা করতে থাকে—কারতলব খাঁ আর আবদুল ওয়াহেদ। আবদুল ওয়াহেদ আর কারতলব খাঁ।

সন্ধ্যার প্রাক্কাল। কারতলব খাঁ তার প্রিয় ঘোড়ায় চেপে নগর পরিভ্রমণে বেরিয়েছিল। এটা তার শখ বললে ভুল হবে। তার জীবনে শখ বলে কোন পদার্থ নেই। যা করে সব কিছুর পেছনে কারণ রয়েছে। আর সেই কারণের প্রধান লক্ষ্য কীভাবে বাদশাহের কাছে এই বাংলা থেকে বেশী পরিমাণে অর্থ পাঠানো যায়। মনে পড়ে তার, বাদশাহ আলমগীরের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময়ের কথা। সেইদিন তাকে বাংলার দেওয়ান আর বাংলারই এক নগর গঙ্গাতীরবর্তী মুখসুসাবাদের ফৌজদার বলে ঘোষণা করেন বাদশাহ! বলেন,—তোমার পালক পিতা হাজী ইস্পাহানী খুব সুদক্ষ দেওয়ান ছিলেন। তুমি তাঁর কাছে কাজ শিখেছ। আমি লক্ষ্য করেছি, দেওয়ান হবার পুরোপুরি যোগ্যতা তোমার রয়েছে। তুমি সুদক্ষ, কুশলী, কর্তব্য-পরায়ণ। আমার আশা তুমি ভাল চালাতে পারবে। একটা কথা বলছি, দিল্লী ছেড়ে এই বয়সে শখ করে আমি দক্ষিণ ভারতে পড়ে নেই, সেকথা তুমি জান। আমি চাই মৃত্যুর আগে এই দেশকে ঠাণ্ডা করতে। আর তার জন্যে অর্থের প্রয়োজন। তোমার কাছ থেকে আমি নিয়মিত অর্থ চাই। পৌত্র সুবাদার আজিমউদ্দিন, আমার আশা ঠিক পূরণ করতে পারছে না, যে কোন কারণেই হোক। অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে আমি তোমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলাম। আজিমউদ্দিনও এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। যদি করে, খবর পাঠিও আমাকে, ওকে আমি ওখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র পাঠাবো। টাকা চাই। বুঝলে, টাকা চাই।

কারতলব খাঁ বিনীত ভাবে মাথা নুইয়ে বলে, যে সে বুঝেছে। আসলে সেই

দিনই মহম্মদ হাদিকে বাদশাহ কারতলব খাঁ উপাধি দেন। সেদিন বাদশাহের চোখে এক অদ্ভুত দৃঢ়তার রেখা সে ফুটে উঠতে দেখেছিল। সেই সঙ্গে পাশাপাশি দেখেছিল একটা হতাশার ছায়া। জীবন শেষ হয়ে আসছে—দক্ষিণ ভারতকে বুঝি পদানত করা গেল না।

কারতলব খাঁ গম্ভীর ভাবে বলেছিল, বাদশাহ, আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই মসনদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব। আমি আজ থেকে জানব, এই মসনদই আমার মালিক। মসনদে যিনি আরূঢ় থাকবেন, তাঁর কাছে বাংলা থেকে প্রতি বছরের সংগৃহীত অর্থ ঠিক এসে পেঁাছোবে। কখনো অন্যথা হবে না।

আলমগীর কারতলবের এই কৌশলী জবাবে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তার পরে দুই বার সে অর্থ পাঠিয়েছে দুই বৎসরের। আদায়ের পরিমাণ বেড়েছে। বাদশাহ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে চিঠি দিয়েছেন। তাছাড়াও মাঝে মাঝে উৎসাহ দিয়ে চিঠি পাঠান। এই চিঠিগুলো কারতলব খাঁয়ের কাছে প্রেরণার উৎস স্বরূপ।

সন্ধ্যা আরও ঘনিয়ে আসে। কারতলব খাঁ তার অশ্বকে নদীর দিকে চালিত করে। সেখানকার কর্মব্যস্ততায় সে দেশের নাড়ির স্পন্দন অনুভব করে। বেশ কিছুদিন মখসুদাবাদে যাওয়া হয়নি। সেখানকার ফৌজদার সে। তাছাড়া ঢাকার চেয়ে মুখসুদাবাদ লোকালয়টিকে তার পছন্দ বেশী। জায়গাটি বাংলার ঠিক মাঝখানে। পাশ দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত। সমস্ত দেশের ওপর নজর রাখতে ওই জায়গাটি চমৎকার। বিদেশী ব্যবসাদাররাও ওখান থেকে শুরু করে সাগর সঙ্গমের আগে পর্যন্ত অনেক জায়গায় ব্যবসা করে। কুঠিও বানিয়েছে। বিদেশীদের ঠিক পছন্দ করে না কারতলব খাঁ। তাদের বশে রাখতে গেলে ঢাকার চেয়ে মুখসুদাবাদ মোক্ষম স্থান।

সামনে বিপরীত দিক থেকে দুই ঘোড়সওয়ারকে এগিয়ে আসতে দেখে কারতলব খাঁ। হতে পারে বাদশাদের পৌত্র সুবাদার আজিমউদ্দিনের লোকজন। যেই হোক, কারতলব খাঁকে দেখে নিশ্চয় অশ্ব থেকে অবতরণ করে সম্মান জানাবে। অপেক্ষা করে সে। দুই অশ্বারোহীকে আরও কাছে আসতে দেয়। কিন্তু এ কি। এযে সুবাদারের দুই তরুণ-সন্তান, করিম আর ফারুক। তাড়াতাড়ি কারতলব ঘোড়া থেকে নেমে রাস্তার পাশে সরে দাঁড়ায়। দুই তরুণকে অভিবাদন জাগায়। এদের মধ্যে বাদশাহী রক্ত। হিন্দুস্থানের মসনদে এরা একদিন বসতে পারে। সুতরাং এরা সম্মানীয়।

ওরা দুজনাও অবতরণ করে। করিমউদ্দিন বলে—এভাবে নেমে পড়লেন কেন দেওয়ান সাহেব।

—আপনাদের দেখতে পেলাম কিনা।

—তাতে কি? আপনি কত সম্মানের।

—বাদশাহের চেয়ে নই।

—আমরা কি বাদশাহ!

কারতলব খাঁ বলে—বাদশাহের শকটও আমার কাছে সম্মানের বস্তু। বাদশাহের নৌবহরও।

করিমউদ্দিন কৌতুক অনুভব করে। সে ঠাট্টা করে কিছু বলতে গেলে ফারুক তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে—আপনার এই মনোভাবকে আমিও সম্মান দিই দেওয়ান সাহেব'।

ফারুকের সংযত ব্যবহারের প্রশংসা মনে মনে না করে পারে না কারতলব। সে জানে কিভাবে অন্যের সম্মান আদায় করতে হয়। অপরকে সম্মান দিয়েও সম্মান আদায় করা যায়। অথচ তার বাবা আজিমউদ্দিন অন্য ধরণের মানুষ। সে অপরকে অবহেলা করে সম্মান পেতে চায়। তাই বোধহয় সব ক্ষেত্রে সফল হয় না। যেমন হয়নি জবরদস্ত খাঁকে তুচ্ছ করে। জবরদস্ত-এর মত অমন বিশ্বস্ত বীর সেনাপতির সাফল্যকে হেয় চোখে দেখায়, সে মনের দুঃখে দক্ষিণ ভারতে ফিরে গিয়েছে। অথচ তার মত মানুষের কত প্রয়োজন এই বাংলায়।

কারতলব খাঁ বলে—অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগে বাড়ি ফিরে যান শাহজাদা।

করিমউদ্দিন বলে ওঠে—কেন? কেউ খুন করবে নাকি?

—হিন্দুস্থানের সর্বত্র আপনাদের মিত্র, সব জায়গায় আপনাদের শত্রু।

—তাই বলে এই ঢাকা নগরীতে?

—হ্যাঁ, সেইজন্যেই আরও বেশী করে বলছি। কারণ এখানে আপনারা থাকেন। সহজেই আপনাদের ওপর নজর রাখা যায়।

—বাইরে আসব না? বন্দী নাকি আমরা?

করিমউদ্দিনের কথাবার্তা কারতলব খাঁয়ের ভাল লাগে না। তবু প্রশ্নের উত্তর না দেওয়াটা হবে বেয়াদপি। সে বলে—কিছু দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে এলে ভাল হতো।

—হুঁ, দেহরক্ষী। আমাদের সঙ্গে অস্ত্র আছে।

ফারুক তার অগ্রজকে বলে—দেওয়ান সাহেব গুপ্তঘাতকের কথা বলছেন। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না।

শাহজাদারা চলে যায়। কারতলব খাঁ আবার এগোতে থাকে। তাকে একটু চিন্তান্বিত দেখায়। আজ যদি সে বাদশাহের অনুগ্রহ না পেত তাহলে তার অবস্থাও জবরদস্ত খাঁয়ের মত হতো। সুবাদার আজিমউদ্দিন আভাসে ইঙ্গিতে বহুবার তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেছে, তাকে অপদস্থ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সইতে হবে। এই ঢাকা নগরীতে তার থাকা চলবে না। মুখসুদাবাদই তার আসল স্থান। তার দেওয়ানীর কাজ ওখান থেকেই ভাল চলবে। প্রথমেই আফগানী, পারাসিক, তুর্কী পাঠান, সব উচ্চাভিলাষী মক্ষিকাকুলকে ওখান থেকে তাড়াতে হবে। ওদের সবার এক লক্ষ্য কী করে পয়সা লুটবে। ওদের দিয়ে চলবে না। তার দেওয়ানীর কাজে নিতে হবে স্থানীয় হিন্দুদের। মাথা তাদের চমৎকার। উচ্চাশা বিশেষ কিছু নেই।

সামান্য একটু সুখস্বাচ্ছন্দ—কিছু টাকাকড়ি কোঠাবাড়ি। এরা বিশ্বাসঘাতকতা খুনখারাবি করতে সাহস পাবে না। এরা অর্থের হিসাবে কারচুপি করলে একটু মোচড় দিলেই সত্যি কথা বলে ফেলবে। যে কোন কারণেই হোক চারিত্রিক দৃঢ়তা এদের তেমন নেই। বোধহয় বহুদিন রাজত্ব ভোগ করেনি বলে রাজকীয় চরিত্র হারাতে বসেছে।

কে যেন কারতলব খাঁয়ের অন্তর থেকে বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলে ওঠে—তুমি নিজে কি মহম্মদ হাদি? তোমারও যে গোড়ায় গলদ। আজ ধার করা নাম কারতলব খাঁ পেয়ে নিজেকেই ভুলে গেলে? মহম্মদ হাদি নামটিও তো ধার করা। তোমার পালক পিতার দেওয়া। আসল নামটি কি? তার পূর্বপুরুষরা কি রাজত্ব করত?

বিমর্ষ হয়ে পড়ে কারতলব খাঁ। সত্যিই সেই নাম আজ আর মনে নেই তার। বিশেষ কোন নামকরণ তখনো হয়ত হয়নি, যখন সেই অজানা গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাকে হাজি সফী ইস্পাহানীর হাতে সমর্পণ করেছিল। সেই দিনের কথা মন থেকে মুছে গিয়েছে বললে মিথ্যা বলা হবে। মনে আছে। তাকে একটা কিছু বলে ডাকা হতো, তাও মনে আছে। কিন্তু কি বলে? সেটা স্মরণে আনতে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। অথচ সেই গাঁয়ের দিগন্তবিস্তৃত মাঠ আর মাঠের পাশে গ্রামের প্রান্তদেশে সেই অদ্ভুত-দর্শন বট গাছের কথা আজও তার মনে আছে। মনে আছে, তার অতি শীর্ণ এক মা ছিল। সে চিরকালের জন্যে চলে আসার সময় সেই মা পাতার ছাওয়া কুঁড়ে ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে ভাঙা গলায় কেঁদে উঠেছিল। মনে আছে এসব কথা। কিন্তু মনে থেকেও আর লাভ নেই। শত চেষ্টা করেও সেই গ্রাম কি আর খুঁজে পাবে সে? পাবে না। আর পেলেই বা কি লাভ। তাছাড়া সে মুসলমান। ইসলামকে সে তার রক্তের সঙ্গে হৃদয়ের সঙ্গে কলিজার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। সে এক অপরিসীম পরিতৃপ্তি পেয়েছে। তাই আজ ফেলে আসা জীবনকে খুঁচিয়ে তুলতে চায় না। ভালো লাগে না। সেই জীবন সম্বন্ধে তার কিছুমাত্রও ধারনা নেই। তবে সেই জীবন কখনই শান্তির হতে পারে না। ইসলাম যার ধর্ম নয়, সে কি করে শান্তি পায়? সে কি বিধাতার কাছে এভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারে? বোধ হয় না।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। কারতলব খাঁ ঘোড়ার ওপর চুপচাপ বসে থাকে। তাঁকে নিজের খুশী মত চলতে দেয়। জানে, বিশ্বস্ত জীবটি তাকে তার গৃহে নিয়ে গিয়ে থামবে। বেশ গরম পড়েছে। তাই রাস্তাঘাটে মানুষ জনের আনাগোনা ভালই আছে। পথিপার্শ্বে দোকানপাটে কেনাবেচা চলছে এখনো। রাস্তার কয়জন মানুষই বা দেওয়ান সাহেবকে চেনে। তাছাড়া বাদশাহের বংশধর সুবাদার সাহেবই হলো এদেশের প্রধানতম চরিত্র। তার তুলনায় সবাই গৌণ। কিন্তু কারতলব জানে এর মধ্যেই যেভাবে জমিদারীর ব্যবস্থা সে করেছে, যেভাবে কর আদায় আরম্ভ হয়েছে তাতে দেশের প্রধান প্রধান ধনী ব্যক্তিরা ইতিমধ্যেই তাকে সমীহ করতে শুরু করেছে।

বাদশাহের আনুকুল্য থাকলে দুদিন পরে তাকে সবাই ভয় পেতে শুরু করবে। তখন সুবাদার তাদের মন থেকে ধুয়ে মুছে যাবে। এই জন্যেই আজিমউদ্দিন তাকে সহ্য করতে পারছে না। ওষুধ ধরতে আরম্ভ করেছে। সুবাদারের নিজেরও অসদুপায়ে উপার্জনের পথ বন্ধ হয়েছে। এখন বাংলা ও উড়িষ্যার সব সংগৃহীত অর্থের মাত্র একটি গন্তব্যস্থল—সেটি হলো হিন্দুস্থানের বাদশাহদের অর্থকোষ।

অশ্বটি দাঁড়িয়ে পরে। আঙিনায় এসে হাজির হয়েছে। দুজন লোক বাতি হাতে নিয়ে ছুটে আসে। একজন দেওয়ান সাহেবের হাত থেকে লাগাম নেবার জন্যে অপেক্ষা করে। অন্যজন বাতি নিয়ে তার পথ দেখাবার জন্য অপেক্ষা করছে।

কারতলব খাঁ অবতরণ করে। ওপর দিকে চেয়ে তার আবাসগৃহের বাতায়নে দৃষ্টি ফেলার চেষ্টা করে। অন্ধকারে দৃষ্টি পড়ে না। কিন্তু জানে তার বেগম-সাহেবা ঠিকই নজর রেখেছে তার প্রতি। অন্যথা হয়নি কখনো। জীবনে তার এই একটি নারীই এসেছে এবং টিকে আছে। পালক পিতা হাজি সফী ইস্পাহানীর মৃত্যুর পর সে যখন পারস্যদেশ থেকে হিন্দুস্থানে ফিরে আসে বেগমকে নিয়ে তখন অনেকে তাকে হালকা রসিকতা করে বলেছিল—আবার কষ্ট করে বেগমকে অতদূরে থেকে সঙ্গে করে আনলে কেন? এখানে কি বেগমের অভাব হবে? কয়টা চাই?

মনে মনে জ্বলে উঠলেও মুখে কিছু বলেনি কারতলব খাঁ। সে চিরকাল তার মস্তিষ্ককে হিসাব করে ব্যবহার করে। বেফাঁশ কিছু করেনা। তবে সে প্রমাণ করতে পেরেছে এতদিনে, নারীর প্রতি অহেতুক লালসা তার নেই। শুধু নারী কেন কোন কিছুতেই তার লালসা নেই। খাদ্য পোষাক পরিচ্ছদ সুরা—কিছুতেই নয়। সে মুসলমান। অপব্যয় কে সে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। সে খোদাতায়লার প্রতি সমর্পিত প্রাণ। সেই পথে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে তার ক্ষমা নেই।

পথপ্রদর্শককে চলে যেতে বলে নিজেই গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে কারতলব খাঁ। বাতির দরকার নেই। একাই যেতে পারবে। অন্ধকারে চলতে চলতে এক কোনে অস্পষ্ট হাসির শব্দ শুনতে পায়। থমকে দাড়ায়। নারী কণ্ঠের হাসি। এই অন্ধকারে? তারই আবাসগৃহে? ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় সে। কন্যা জিন্নৎ উন্নিসা? সে এই অন্ধকারে হাসছে? কেন? আর কেউ আছে নিশ্চয়। চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে কারতলব খাঁয়ের। সে ঠিক করে ফেলে তেমন কিছু দেখলে নিজের কন্যাকেও রেহাই দেবেনা—একমাত্র কন্যা বলে নিস্তার পেয়ে যাবে, তা যেন না ভাবে জিন্নৎ। দেখেশুনে তার বিয়ে দিয়েছে আফসার তুর্কী বংশীয় এক যুবকের সঙ্গে। এসব ব্যাপারে পুরুষদের সে ক্ষমা করলেও করতে পারে। কিন্তু নারীদের? কখনো নয়। আর এত জায়গা থাকতে তারই আবাসগৃহে?

কোমর থেকে তরবারি বের করে পা টিপে টিপে এগিয়ে যায় সে। আগে ওই বদমাইশের খুনে অস্ত্রটিকে সিক্ত করে নিতে হবে, তারপরে জিন্নৎ-এর সঙ্গে বোঝাপড়া। এমন দেখেশুনে সাদি দেবার পরেও এই অবস্থা?

কিন্তু নিজের মেয়ের ওপর হঠাৎ এই অবিশ্বাস কেন তার? জিন্নৎ তা কখনো তার চরিত্রের কোন রকমের দুর্বলতা দেখায় নি এ পর্যন্ত। তবে? হারেমে যুবতী কোন নারী নেই বলে? থাকবে না কেন? বেগমসাহেবার পরিচারিকারা আছে। অন্য বাঁদীরা আছে।

চোয়াল শক্ত করে এগোয় কারতলব খাঁ। কিন্তু সেই কোনে গিয়ে পৌছোবার আগেই অন্ধকারের মধ্যে এক শক্তিশালী পুরুষ তাকে ধাক্কা দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়। কারতলব খাঁয়ের চোখ দিয়ে আগুণ ছোটে। আর সেই আগুণেই বোধহয় দেখতে পায় দেয়ালের কোনে যে নারী তার দিকে বিভীষিকা মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে থরথর করে কাঁপছে সে তার কন্যা জিন্নৎউন্নিসা নয়—একজন পরিচারিকা।

চেষ্টা করেও প্রথমে কারতলব খাঁয়ের মুখ দিয়ে আওয়াজ বের হয় না। হাতে অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও অন্ধকারের সুযোগে পুরুষটি পালালো এটা সহ্য হয় না। তার ওপর এই বাঁদীর এত স্পর্ধা!

যুবতীটির নাম মনে করতে পারে না কারতলব। কিন্তু তার নম্রতা আর সেবা-পরায়ণতায় তাকে পছন্দই করত সে। হয়ত মেয়েটির হাল্কা স্নিগ্ধ সৌন্দর্যই এর কারণ। কিন্তু তাই বলে ক্ষমা সে পাবে না। বেগমের শত অনুরোধেও নয়। তার বেগম তাকে দোষারোপ করতে পারে এই বলে যে তার অতি-মিতব্যয়িতার পাগলামীর জন্যে এ ধরনের পাপ কাজ প্রাসাদে ঘটতে পারে। এত অন্ধকার অনেক কিছুর সুযোগ করে দেয়। সে চায় না সুবাদারের আবাসগৃহের মত তার অট্টালিকা সন্ধ্যা নামতে না নামতেই আলো-ঝলমলে হয়ে উঠুক। তার গায়ে মুঘল রক্ত নেই। ব্যভিচারের মত অমিতব্যয়িতাও তার না-পছন্দ।

—এগিয়ে এসো।

মেয়েটি এক পা দু পা করে এগিয়ে আসে। অন্ধকার চোখে সয়ে গিয়েছিল বলেই তাকে চিনতে পেরেছিল সে। আর ওরা অনেক আগে থেকে এখানে ছিল বলে, তাকে দেখতে পেয়েছিল সে দেখার অনেক আগে।

—কে ওই পুরুষ?

মেয়েটি তার পায়ের কাছে ভেঙে পড়ে। তার মুখ দিয়ে অদ্ভুত ধরণের চাপা কাতরোক্তি বের হয়। কারতলব খাঁ অর্থোদ্ধার করতে পারে না।

চাপা গর্জন করে বলে—কে পালালো?

মেয়েটি মরিয়া হয়ে মাথা ঝাঁকায়। বলতে চায় না। কারতলব মেয়েটির বাহু বেষ্টনী থেকে তার পা মুক্ত করার জন্যে ছুঁড়ে দেয় একটি পা। পরিচারিকা কেঁদে উঠে মাথা ঝাঁকাতে থাকে। তবু সে বলতে চায় না।

কারতলব খাঁ ক্রোধে কাঁপতে থাকে। এ যেন সেই বহু-কথিত মুঘল হারেমের অনাচার তারও হারেমে। ভাবা যায় না। এ অসহ্য। তার জীবনের কৃচ্ছ্রসাধন, তার সংযম ধর্মানুরাগ সব কিছুর মুখে এই ঘটনা চুনকালি মাখিয়ে দিয়েছে। পরদিন

ভোর হবার আগে এই নারীর দেহ বুড়ি গঙ্গার অতলে তলিয়ে যাবে সন্দেহ নেই। কিন্তু কে ওই অসংযমী পুরুষ ? তাকে ধরতে হবে। এই নারী জানে।

—বলবে না ?

—না না। পারব না। কিছুতেই না।

এভাবে অস্বীকার করছে কেন এ ?

জিন্নৎ-এর স্বামী সুজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁ সম্বন্ধে কানাঘুষা কিছু শোনা যাচ্ছে। ছেলেটা ভাল বংশের জেনে জিন্নৎ এর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল সে। তখনো বাংলায় আসেনি। তখনো হায়দারাবাদের দেওয়ান সে। সেখানে ওর সম্বন্ধে কিছু শোনা যায়নি। বরং অনেকে প্রশংসা করেছেন। কারতলব নিজেকেও একটু গর্বিত ভাবত। হাজার হলেও সে তার বংশের উৎস কোথায় সেকথা ভুলতে পারে না। পারেনা বলে, তার সংকোচ কম নয়। বাদশাহী আমলে বাদশাহের স্নেহভাজন হয়েও সে যেন অনেকটা পেছিয়ে। সবার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে তার দ্বিধা। যদিও বাদশাহ ঘৃণাক্ষরেও এমন ইঙ্গিত কখনো তাকে দেননি। তিনি তাকে পছন্দ করেন বলে দেননি। কিন্তু অন্য কেউ যে কোন সময়ে বলতে পারে কাফের বংশের রক্ত তার ধমনীতে। উৎসের কটাক্ষ কেউ যাতে না করতে পারে, তাই সে সাচ্চা মুসলমান হতে চায়। মনে মনে সে জানে আলমগীরের মত ধার্মিক ব্যক্তিও প্রতিদিনের প্রতিটি অভ্যাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার সঙ্গে পারবেন না। সে অনেক এগিয়ে। এরজন্যে তার গর্ব একটুও নেই। ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির আবার গর্ব কি ? পরিতৃপ্তি—অপরিসীম পরিতৃপ্তি লাভ করা যায় ধর্মানুসরণে, নিষ্ঠার সঙ্গে সব কিছু পালন করে। সে ভাবতে পারে না, তার জন্ম হিন্দু পরিবারে। ভাবতে পারে না বলেই ইসলামকে আরও আঁকড়ে ধরেছে মনে প্রাণে। ধর্মের ব্যাপারে কোন ভাঁওতা নেই, কোন অপোস নেই।

বাংলায় এসে জামাতা সুজাউদ্দিন সম্বন্ধে মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছে। কন্যা জিন্নৎকে প্রশ্ন করলে সে চুপ করে থাকে। এক পুত্র আর এক কন্যার জন্মদাত্রী হয়েও বোঝা যায় সে সুখী নয়। বেগম সাহেবাকে প্রশ্ন করলে বলে, সবাই তোমার মত হবে তার কি মানে আছে? অদ্ভুত উত্তর। কী যেন চেপে যায়।

পরিচারিকা চোখের জলে পা ভাসিয়ে দেয়। কোন লাভ নেই। নিজের গৃহে অনাচার সে সহ্য করবে না। সে জানতে চায় আসল অপরাধী কে। কিন্তু মেয়েটি বলবে না কিছুতেই। না বলুক।

আলো হাতে কে যেন এগিয়ে আসছে। বেগমসাহেবা। এতক্ষণ আগে ঘোড়া থেকে নেমেও ওপরে উঠছে না বলে বোধ হয় কৌতূহলান্বিত হয়েছে বেগম-সাহেবা। তাই কাউকে না পাঠিয়ে নিজেই এগিয়ে আসছে। দাসদাসী পরিবৃত হয়ে থাকার অভ্যাস তার নেই। হতে দেওয়া হয়নি। নিজে যেমন সে সাধারণভাবে থাকে, বেগমকেও তেমনি শিখিয়েছে। বাঁদী যারা আছে, তারা অন্য কাজ করে।

স্বামীকে অন্ধকারের মধ্যে ওই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বেগম সাহেবা স্তম্ভিত হয়।

—তুমি? এখানে? কি করছ?

কারতলব খাঁ ভূলুণ্ঠিত পরিচারিকাকে দেখিয়ে দেয়।

—এ কে? এ যে দেখছি মতি। কি করছে তোমার কাছে।

—আমার কাছে আর করার কি আছে? একেই জিজ্ঞাসা কর।

মতি এবারে সশব্দে কেঁদে হামাগুড়ি দিয়ে বেগমসাহেবার পা জড়িয়ে ধরে।

—একি! কি হয়েছে!

—আমার দোষ নেই বেগম-সাহেবা। আমাকে লোভ দেখানো হয়েছিল। আমি ভুলেছিলাম তাতে।

—কিছুই তো বুঝতে পারছি না। কে লোভ দেখিয়েছিল?

মতি চুপ করে থাকে। বেগম সাহেবা অদ্ভুত দৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে চায়। তার এতবছরের বিশ্বাসের মূলে কি নাড়া লাগলো?

কারতলব খাঁ গম্ভীর হয়ে বলে—আমিও সেই কথাটা উদ্ধারের চেষ্টা করছি। কে? তোমার কি মনে হয়?

বেগমসাহেবার মুখ সামান্য একটু বিবর্ণ হয় যেন। কিন্তু অত অল্প আলোয় সেই বিবর্ণতা কারও চোখে পড়ার কথা নয়।

—মতি বলুক। ওকেই বলতে হবে।

—না না। আমি পারব না। বলেও রক্ষা পাব না।

কারতলব খাঁ সন্দিহান হয় এই জবাবে। বলে—বলে দিলেও নিস্তার পাবে না? বটে? এত উঁচুদরের মানুষ?

সেই সময় অন্ধকার ভেদ করে ভূতের মত আবির্ভূতা হয় কন্যা জিন্নৎউন্নিসা। সেই সামান্য আলোয় জিন্নৎ-এর চোখ জ্বলতে থাকে।

সে বলে—হ্যাঁ, খুব উঁচুদরের মানুষ। কত বড় বংশ। তোমার তো মনে হয়েছিল বুঝি তোমার ধমনীতেও তুর্কী রক্ত বইতে শুরু করবে।

কারতলব খাঁ চেঁচিয়ে ওঠে—কি বলছিস তুই? এসব কথার মানে কি?

—মানে খুব স্পষ্ট। আমি সন্দেহ করেছিলাম, মতির সঙ্গে তোমার জামাতার কথা বলার ধরণে। অনেকদিন আগেই সন্দেহ করেছিলাম। টোপ অনেকদিন আগেই ফেলেছিল।

—সত্যি! সুজাউদ্দিন!

কারতলব খাঁয়ের মুখের ওপর কেউ যেন একখাবলা কালি নিক্ষেপ করে। নিজেকে বড় দুর্বল বলে মনে হলো তার। আজ যদি সুজা না হয়ে তার নিজের ছেলে হতো? হ্যাঁ, তাহলে কঠোর শাস্তি দিতে পারত। কিন্তু জামাতার ওপর কি মানুষের টান বেশী থাকে? না, থাকে না। তবু বোধহয় কন্যার অসহায়তার

কথাই সব পিতার অন্তরে বড় হয়ে দেখা দেয়।

সেই রাতেই সবাই জেনে গেল হারেমে কোন সন্দেহ চরিত্রের নারীর স্থান নেই। এমন কি কোন অল্প পরিচিত নারীও হারেমে প্রবেশ করতে পারবে না। বিশ্বস্ত পুরাতন খোজারা ছাড়া অন্য খোজাও ভেতরে আসতে পারবে না ভবিষ্যতে।

সুজাউদ্দিন কিছুদিন সবাইকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলল। তবে মতি বাঁদীর দেখা কেউ পায়নি সেই রাতের পরে। তার কথা কেউ আলোচনাও করে না আর। শুধু জিন্নৎ মনে মনে নিজেকে অপরাধী ভাবে। সে সুজাউদ্দিনকে হাড়ে হাড়ে চেনে। মতির সাধ্য ছিল না তাকে অস্বীকার করা। প্রথমত সুজা ভীষণ রকমের সুপুরুষ, তার ওপর তার প্রভাব প্রতিপত্তি মতির মত রূপসী রমণীকে প্রলুব্ধ করবেই এক সময় না এক সময়ে। তাই ওভাবে সব বলে না দিয়ে বরং মতিকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে পারত। তাহলে তাকে পাতালপুরীর ওই গুপ্ত প্রকোষ্ঠে দিনের পর দিন না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হতো না। এর চেয়ে নদীর জলে হাত পা বেঁধে ডুবিয়ে দেবার যে মতলব তার বাবা প্রথমে করেছিল সেটাই ভাল ছিল। এত জানাজানি হতো না। তার ছেলে আসাদউল্লা আর মেয়ে নাফিসা পর্যন্ত জেনে গিয়েছে। আসাদউল্লার ভাবগতিক দেখে মনে হয় বাপের মত দুশ্চরিত্র হবে। তার মনটা নরম বলে, যাকে তাকে জাপটে ধরতে পারবে না। ভীতু প্রকৃতির। লুকিয়ে লুকিয়ে সুন্দরী বাঁদীদের দেখে। চোখে চোখ পড়লে লজ্জা পেয়ে যায়। এককথায় ওটা একটা অপদার্থ। তবে নাফিসা সাধারণ হয়েছে। কিন্তু ও একেবারেই ছোট এখনো। পরে কি হবে কে জানে।

নকৃদি ফৌজের দলপতি আবদুল ওয়াহেদ চালাক চতুর মানুষ। গর্বও তার খুব। সে তো আর সাধারণ সিপাই সামন্ত নয় যে বেতনের ঠিক ঠিকানা নেই। তার ফৌজ পেটে গামছা বেঁধে যুদ্ধ বিগ্রহ করে না। ফেল কড়ি মাখো তেল। নগদা-নগদি ব্যাপার সব। অন্য সাধারণ সৈন্য সামন্তদের চেয়ে তাদের পার্থক্য সেইখানে। তবু কি আশা মেটে? সাধারণ মানুষ যারা নানা কাজকর্ম করে খায়, তাদের ভয় দেখিয়ে চাপ সৃষ্টি করে নানান্ ভাবে অর্থ উপার্জনের ফিকিরে থাকে। দলের কিছু লোককে সঙ্গে নিয়ে সে তাই অবসর সময়ে নগরে এবং নগরপ্রান্তে ঘুরে ফিরে বেড়ায়।

তাঁতী আর জোলা পাড়ায় ঘুরছিল ওয়াহেদ্ একদিন। ঘরে ঘরে তাঁত। ডুগডুগ্ ফটাশ ফটাশ করে তাঁতের শব্দ, মাকুর ছোটাছুটির আওয়াজ প্রতি ঘরে। কোথাও ঝট্পট্ তৈরী হচ্ছে কমদামী ডুরে শাড়ি আর গামছা, কোথাও উঁচুদরের জামদানী, নয়নসুখ আর তেরিন্দাম। সেখানে তাঁতের শব্দ অমন উদ্দাম নয়। অতি

সতর্ক শব্দ, কোন তাঁতে তৈরী হচ্ছে শুধু শিরবান্ধানি। আবার কোথাও ঘরের দরজার চৌকাঠে বসে বয়স্ক তাঁতী অতি যত্নের সঙ্গে মসলিনের ওপর কারুকার্য করছে। হয়ত বছরের পর বছর একই কাজ করে যাচ্ছে একখানা কাপড়ের ওপর। ওয়াহেদ প্রায় সবারই নাম জানে। নাম জানলে কাজ হয় যাদুর মত। নইলে ও কত্তা, ও মিয়া বলে মানুষকে বশে রাখা যায় না। মসলিন কাপড়ের ওপর যে কাজ করছিল, ওয়াহেদ জানে তাকে বিরক্ত করে কোন লাভ নেই। বরং ঘোর বিপদে পড়বে সে। কাপড়টি তৈরী হচ্ছিল খোদ বাদশাহের ছেলে আকবর, যিনি বিদেশে মারা গিয়েছেন তাঁর কন্যার জন্য। নগরীর সবাই জানে সেকথা। দাম পড়বে সাড়ে চার হাজার টাকা। উরে আল্লা। ভাবাই যায় না। যে দেড় টাকা পায় মাসে, সে সারামাস প্রতিটি দিন পোলাও আর কালিয়া খায়। আর এই কাপড়ের দাম সাড়ে চার হাজার টাকা। ওই টাকায় নাকি পাঁচেট কিংবা শেরগড় পরগণার অনেকটাই কিনে নেওয়া যায়। সুতরাং বৃন্দাবন তাঁতীকে না ঘাঁটিয়ে তাকে আপন মনে কাজ করতে দিয়ে সে যায় মোজাহার জোলার ঘরের সামনে।

—মোজাহার ভাই, কী করছ?

—আর বলবেন না। বাজার একেবারে খারাপ। বিক্রিপাটা কিছু নেই। এই দেখুন পাঁচখানা ভুরিয়া করে রেখেছি। পড়ে থেকে থেকে শেষে ইঁদুরে কাটবে।

—তোমার কাছে যখনই আসি, তখনই বাজার খারাপ। আর সবাই তো একথা বলে না। তোমার ওই জানলা দিয়ে রাস্তাটা অনেক দূর অবধি দেখা যায়। আমাকে আসতে দেখলেই তাঁত বন্ধ হয়ে যায়। আর বাজার খারাপ হয়ে যায়।

ওয়াহেদের কণ্ঠস্বরে উষ্ণতা প্রকাশ পায়। তাতে মোজাহার ঘাবড়ে যায়। কিন্তু সত্যি সে গরীব। ওয়াহেদকে সে বছরে একবার বড় জোর সন্তুষ্ট করতে পারে। পোষ্য তার সাত আট জন। এক টাকায় আট মন চাউল কিনে আর থাকে কি?

তবু ওয়াহেদ ওয়াক্ থু করে থুথু ফেলে স্থানত্যাগ করে। যে পিঁপড়ের পেটে গুড় নেই, সেই পিঁপড়ের পেট টিপে ধরে লাভ নেই। বরং হরিশচন্দ্র তাঁতীর ঘরে যাওয়া ভাল। সে আজকাল নাকি আলবালি আর তঞ্জীব বোনায় খুব নাম করেছে। তার ছেলে গোবিন্দও নাকি বেশ হাত পাকিয়েছে।

—এই যে হরিশচন্দ্র। সময় ভালই কাটছে মনে হয়।

গোবিন্দর গা জ্বালা করে। এখনি তার বাবা উঠে ঘরের মধ্যে গিয়ে কড়ির বস্তা থেকে এক থলি কড়ি নিয়ে এসে এই বদমাইশটার হাতে দেবে।

হরিশচন্দ্র মুখে কৃতার্থের হাসি ফুটিয়ে বলে—কি ভাগ্য, আপনি এসে গিয়েছেন। অনেকদিন বাঁচবেন।

ওয়াহেদ এক গাল হেসে বলে—কেন? কেন?

—আপনার কথাই তো ভাবছিলাম। কতদিন দেখিনি। ভাবলাম, নিশ্চয় পথ ভুলে গিয়েছেন।

—না না। ভুলব কেন? কত কাজ যাকে। সুবাদার সাহেবের কাছের লোক আমরা।

—তা তো বটেই।

—তা হরিশচন্দ্র—

—আরে কথা পরে হবে। ও গোবিন্দ কি করছিস। মুসলমানের হুঁকোটা এগিয়ে দে। ছিলিম তৈরী আছে। আমি লাগিয়ে দিচ্ছি হুঁকোর মাথায়।

—না না ওসব এখন থাক। তুমি হরিশচন্দ্র মানুষটা খুব ভাল।

—হেঁ হেঁ, আপনাদের কৃপায়।

সেই সময় বাইরে অনেক লোকের কথা শোনা গেল। ওয়াহেদের দুই সঙ্গী বাইরে মুখ বাড়িয়েই বলে ওঠে—বেলায়েৎ আসছে অনেকের সঙ্গে।

বেলায়েৎ হচ্ছে নর্কাদ ফৌজের লোক। তার এখানে আসার কথা নয়। বিরক্ত ওয়াহেদ বাইরে গিয়ে দাঁড়াতেই বেলায়েৎ ছুটতে ছুটতে কাছে আসে। তার মুখের চেহারা দেখে ওয়াহেদের বিরক্তি মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়। পরিবর্তে একটা ভয় বুকের ভেতরটা কাঁপিয়ে দেয়।

বেলায়েৎ বলে ওঠে—সুবাদার সাহেবের লোক আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। খবর দিলে গিয়েছে, আপনাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

ওয়াহেদ চেঁচিয়ে ওঠে—কে বলল আমাকে পাওয়া যাচ্ছে না। এই তো আমি। তুমি পেলেনা আমাকে?

ওয়াহেদ তখন রাস্তা দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছে আর বেলায়েৎ তার পেছনে পেছনে দৌড়োচ্ছে। সেই ভাবেই ওয়াহেদ চিৎকার করতে করতে বলে—ওরা বলল, আমাকে পাওয়া যাচ্ছে না, আর তুমি চুপ করে থাকলে?

—আমি তো বললাম, পাওয়া যাবে। তাই তো এসেছি।

—কি করে বুঝলে পাওয়া যাবে? কি করে তুমি জানলে এখানে আসব? কে বলেছে তোমাকে?

বেলায়েৎ বলে—আন্দাজে। আগের দিনে নদীর পাড়ে সূত্রধরদের কাছে গিয়েছিলেন, তাই ভাবলাম আজ এখানকার পালা।

—আগের দিনের খবরও তুমি পেয়ে গিয়েছ?

—সেইজন্যেই বলি আমাকেও সঙ্গে নিতে। আমি আরও কয়েক জায়গার খবর জানি।

—কোথায়?

—সঙ্গে নিলে বলতে পারি।

ওয়াহেদ তখনো বেশ জোরে হাঁটছে। তাঁতী পাড়ার সব ঘর থেকে উঁকি দিয়ে মানুষ কৌতূহলান্বিত হয়ে দেখছে। সবাই ওর মৃত্যু কামনা করে। ব্যাটাকে সুবাদার সাহেব বরখাস্ত করলে বেশ হয়। কিংবা শূলে দিলে। পয়সা নিয়ে নিয়ে

ছিবড়ে করে ছাড়লো।

বেলায়েৎ এর কথায় ওয়াহেদ বলে—বেশ নেব তোমাকে সঙ্গে।

—শাঁখারিপাড়ায় চেষ্টা করেছেন কখনো?

—না।

—তাই তো বলছিলাম। আরও আছে।

—কোথায়?

—পরে বলব। এখন সুবাদার সাহেবকে সামলান। মনে হলো ক্ষেপে আছেন।

শেষ কথাটা বেলায়েৎ বানিয়ে বলল। ওয়াহেদ ভাবে জাহাঙ্গীর নগরে তার শত্রুর অভাব নেই। তাকে ফুলে ফেঁপে উঠতে দেখে অনেকের চোখ টাটায়। কে কি লাগিয়েছে কে জানে।

সুবাদার সাহেবের বাড়ির সামনে এসে সে থমকে দাঁড়ায়। সামনে ফটক। সে পেছনে তাকিয়ে দেখে বেলায়েৎ আর দলের অন্যেরা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। বেলায়েৎ ইসারা করে বলে ভেতরে ঢুকে যেতে। লোকটা ভীষণ চতুর।

সেই সময়ে আজিমউদ্দিনের খাস কর্মচারী মফিজউদ্দিন তাকে দেখতে পেয়ে দ্রুত এগিয়ে এসে বলে—কোথায় ছিলেন এতক্ষণ। আপনাকে বহুক্ষণ থেকে খোঁজা হচ্ছে।

মফিজউদ্দিন এমন কিছু উঁচু পদের মানুষ নয়। কিন্তু আজিমউদ্দিনের কাছের লোক বলে সবাই তাকে সমীহ করে। ওয়াহেদও করে। মফিজউদ্দিনও এ ব্যাপারে খুব সচেতন। সে জানে বর্তমান সুবাদার যদি বাংলা মুলুক ছেড়ে চলে যায় তাহলে তাকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করা হবে।

ওয়াহেদকে আজিমউদ্দিনের কাছে পেঁাছে দিয়ে মফিজ চলে যায়। শরীরের ওপরের অর্ধাংশ সোজাভাবে সামনে ঝুঁকিয়ে ওয়াহেদ কুর্নিশ করে। আজিমউদ্দিন স্থিরভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে। ওয়াহেদ তার অপরিচিত নয়, কিন্তু আজ তাকে প্রথম অভিনিবেশ সহকারে দেখল এবং বুঝল লোকটা ক্রুর, খল। তাকে দিয়ে সব কিছু করিয়ে নেওয়া যায়।

—নাকুদি সিপাহীদের টাকা কড়ি ঠিক মত দেওয়া হচ্ছে? আমি বলছি কি। দেওয়ান গড়িমসি করছেন না তো?

ওয়াহেদের মনের ভেতরে খটকা লাগে। এ আবার কেমন কথা? এই রকম ওস্তাদ দেওয়ান সাহেবের ওপর সন্দেহ হয়েছে নাকি? কিনা তাকে যাচাই করতে চাইছেন সুবাদার সাহেব। দেওয়ান সাহেবের কৌশল কিনা কে জানে।

সে বলে—আমাদের কোন অসুবিধা নেই। এই দেওয়ান সাহেব আসার পর থেকে সেই দিকে আমরা নিশ্চিন্ত।

—তাই নাকি? আমি যদি বলি তোমাদের ঠিক মত পাওনা দেওয়া হচ্ছে না?

তাহলে তোমার কি বলার আছে ?

ওয়াহেদের হেঁচকি ওঠার অবস্থা। সুবাদার সাহেবের মনের ভেতরে ঢুকে একবার যদি দেখে নিতে পারত। সেটা যখন সম্ভব নয় তখন না-ছুঁই-পানি উত্তর দিতে হবে।

সে সম্ভ্রমের সঙ্গে বলে—আপনি খুদাবন্দ যখন একথা বলছেন, তখন সে কথা ঝুট্ হবে কি করে ?

—ঠিক। তাহলে তুমি বলছ যে দেওয়ান সাহেব তোমাদের পাওনা গণ্ডা ঠিক মত দিচ্ছেন না।

ওয়াহেদের মনে প্রবল দ্বন্দ্ব। সুবাদার সাহেব তাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে চান। তারপর একবার যদি সে স্বীকার করে তাহলে দেওয়ান সাহেবের কানে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার নোকরি খতম্।

সে জবাব দেবার আগে এদিক ওদিক ইতস্তত চাইতে থাকে। আর সেই সময় সুবাদার সাহেবের পেছনে একটি সুদৃশ্য চিক-এর আড়ালে নারীর একজোড়া চক্‌চকে চোখ নজরে পড়ে। আর সেই নারীর নির্দেশে একজন দাসী চিকের বাইরে একটু এসে ওয়াহেদকে ইসারা করে স্বীকার করে নিতে বলে।

সে ভাবে, বাব্বা ক্রীতদাসীর রূপেই মাথা ঘুরে যায়। এদের যৌবন কি আর হেলায় অস্তমিত হয় ? নিমক ঝাল চাটনির মত বাদশাহের আত্মজনের ভোগে লাগে। চিকের অড়ালে ওই চক্‌চকে চোখের অধিকারিণী নিশ্চয় বেগমসাহেবা। সুতরাং তাঁর নির্দেশ পাওয়া গিয়েছে। এখন মাথা নীচের দিকে করে ঝাঁপিয়ে তাকে পড়তেই হবে। অন্যপথ নেই।

সে বলে—দেওয়ান সাহেব কি আর আমাদের দিকে নজর দেন ? তাহলে ভাবনাই থাকত না।

—এই দেওয়ান সাহেব মরে গেলে কেমন হয় ?

ওয়াহেদ এতক্ষণে সব বুঝে ফেলেছে। বলে—আমরা নিস্তার পাই। আপনি মালিক, আপনিই পারেন ওঁকে এই মুলুক থেকে সরিয়ে দিতে।

—হ্যাঁ পারি। তবে তোমার সাহায্যে।

—আমি সামান্য—

আজিমউদ্দিন ধমকে ওঠে—শোন, যা বলছি। ওই কারতলব খাঁয়ের পেছনে লোক লাগাও। হ্যাঁ, তোমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত কিছু লোককে লাগাও। তারপর সুযোগ মত একদিন তাকে রাস্তা ঘাটে ঘিরে ধরে চেঁচামেচি শুরু করে দাও, বকেয়া পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দেবার জন্যে, বুঝেছ ?

—জরুর হুজুর। কিন্তু তারপরে যে উনি আমাদের আস্ত রাখবেন না।

—তারপরে ? কার পরে ?

—ওই চেঁচামেচি হৈ হট্টগোলের পরে ?

—তারপরে তো দেওয়ান কারতলব খাঁ কবরের নীচে চলে যাবে। তোমার

লোকেরা ছেড়ে দেবে নাকি ?

ওয়াহেদের মাথা বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে থাকে। তার সামনে বসে রয়েছে স্বয়ং বাদশাহ আলমগীরের পৌত্র। এ যেন অবিশ্বাস্য। তার মনে হতে লাগলো বুঝি মেঝেতে আছড়ে পড়বে। অতি কষ্টে সামলে নিয়ে সে মুখের দাঁতগুলো বের করে গদগদ কণ্ঠে বলে—এবারে পরিস্কার বুঝে ফেলেছি খোদাবন্দ্‌।

—কবে থেকে লোক লাগিয়েছ ?

—আজ থেকে।

—কত দিনের মধ্যে কাজ হাসিল করতে পারবে ?

—প্রথম সুযোগে।

—বাস্‌। যাও।

ওয়াহেদ টলছিল। দেওয়ান সাহেব কী সাংঘাতিক সে জানে। তার গায়ে হাত ? তবু উপায় নেই। টলতে টলতে সে আজিমউদ্দিনের প্রাসাদ ত্যাগ করে।

যেদিন নগরীর বাইরে গিয়েছিল কারতলব খাঁ, যেদিন ফিরতে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, সেদিনই প্রথম নজরে পড়েছিল তার, কে যেন তাকে অনুসরণ করছে। ভাবলো, হতে পারে কারও কৌতূহল। দেওয়ানের পদটি তো নগণ্য নয়। তার ওপর মুখসুদাবাদের ফৌজদার সে। লোকে হয়ত ভাবে এত যার ক্ষমতা, এত যার অর্থবল সে একা একা এভাবে ঘোরাফেরা করে কেন ? ভাবতে পারে। সামান্য একটু ক্ষমতা যার আছে, তার বিলাসিতার অন্ত নেই এই নগরীতে। অথচ সে খুবই সাধারণ, সঙ্গে দেহরক্ষীও রাখে না।

কিন্তু তার পরের দিনও, তার পরের দিনও। কে বা কারা তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে। সন্দেহ দানা বাঁধে কারতলব খাঁয়ের। ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের মানুষ সে। তার ওপর সব ব্যাপারেই সে হিসাবী। এক আর একে যে দুই হয় একথা তার অবিদিত নয়। সে ধারণা করে নেয়, তাকে হত্যার চেষ্টা হলেও হতে পারে। বাংলার রাজস্বের অপব্যয় সে রোধ করেছে। যথেচ্ছ ভাবে লুটপাট করে কেউ নিজের অর্থ ভাণ্ডারকে আর স্ফীত করতে পারছে না। সবাই ফুঁসছে। সুবাদার আজিমউদ্দিন বিশেষ করে ভীষণ বেকায়দায় পড়েছে। বাদশাহের কাছে কোটি টাকার ওপর অর্থ পাঠাতে সফল হয়েছে সে। তার সুনাম বেড়েছে। সুতরাং আজিমউদ্দিন ক্রুদ্ধ হবেই।

একদিন সন্ধ্যায় নমাজের পরে সে বেগমসাহেবাকে আর কন্যা জিন্নৎউন্নিসাকে ডেকে বলে—এমন দিন আসতে পারে যেদিন আমার বাড়ি ফেরা হবে না।

উভয় নারী অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে কথাটার মর্মার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করে। এ

গের ধোঁয়াটে কথা বলার অভ্যেস মহম্মদ হাদি বা কারতলব খাঁয়ের নেই। তাই নাই নীরব।

কারতলব বলে—মনে হয় আমার পেছনে লোক লেগেছে।

বেগমসাহেবার প্রশ্ন—কী জন্যে ?

—আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে।

—অস্বাভাবিক কিছু নয়। একথা তোমার না জানার কথা নয়। পারস্য দেশ কে এসেছ বলে তুমি পারসিক হয়ে যাওনি। তোমার মূল যে এদেশে, আমীর রাহ সবাই ভালভাবে সেকথা জানে। বাদশাহ যখন তোমাকে হায়দারাবাদের ওয়ান করলেন, তখনকার দিনের কথা মনে নেই ? রাতারাতি বন্ধুরা শত্রু হয়ে লো। এদেশে এসে তুমি কি ভাবতে আরম্ভ করেছিলে, পুরোণো বন্ধুরা শত্রুতা ন গেল ?

—না, সেকথা ভাবিনি।

—তবে সঙ্গে দেহরক্ষী রাখোনা কেন ? কতবার বলেছি। তোমার কিছু হলে মই দায়ী থাকবে অন্য কেউ নয়।

বেগমসাহেবার মুখে এ ধরনের কড়া কথা বহুদিন শোনেনি কারতলব খাঁ। সে রে কন্যার মুখের দিকে চায়। সেই মুখ নির্বিকার। জিন্নৎকে দেখে মনে হয় জকাল পৃথিবীর ওপর তার সমস্ত আকর্ষণ যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। কেন এমন হে, এখন অনেকটা স্পষ্ট। সুজাউদ্দিন এককথায় চরিত্রহীন।

কারতলব খাঁ ভাবে, সংসারের এই অশান্তি, বিপদ বিরুদ্ধাচরণের মধ্য দিয়ে তাকে র শান্ত ভাবে পথ করে চলতে হবে। ইসলাম তাকে তাই শিক্ষায় দিয়েছে। এ ত্রে সে একা—তবু অবিচল।

বেগমসাহেবা স্বামীর চোখের মধ্যে কী দেখল কে জানে, চড়া স্বরকে হঠাৎ নম্র বলে—তোমার গায়ে হাত দেয় কার সাধ্য ? তুমি পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়। তুমি রে তিনমাস রোজা কর, তুমি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কোরান নকল করে যাচ্ছ নর পর দিন। কে তোমার গায়ে হাত দেবে ?

—তুমি বিশ্বাস করো ?

—হ্যাঁ রীতিমত করি।

—জিন্নৎ ?

জিন্নৎ বেশ কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলে—আমি ঠিক জানিনা। রার ওপর বিশ্বাস রাখা এক জিনিস আর দীর্ঘজীবী হওয়া আর এক জিনিস।

বেগম সাহেবা অসহিষ্ণু হয়ে বলে—কী বলতে চাস তুই ?

—আমি বলতে চাই, খোদাতায়লার প্রতি সমর্পিত প্রাণ হলে নিশ্চয় শান্তি পাওয়া। বিপদে শক্তি পাওয়া যায়, সহ্য করার ক্ষমতা সহস্রগুণ বাড়ে। তাই বলে ম দীর্ঘজীবী হবই একথা হলফ করে বলা যায় না।

—কেন, যায় না ?

—আল্লা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনেক কিছু সাধন করছেন। তাতে আমার ভূমি কিছুই নয়। তাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখা মনে হয় তাঁর কাছে অতটা গুরুত্বপূর্ণ ন হতে পারে—যতই আমি সমর্পিত প্রাণ হই না কেন। আমাকে দিয়ে তিনি তাঁর উদ্দে সাধন করলেই আমি কৃতার্থ।

—তোকে একথা কে বলেছে ?

—কে আবার বলবে ? আমার মন।

বেগমসাহেবা উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—তোর মনটা পচে গিয়েছে।

কারতলব খাঁ এক হাত উঁচু করে বলে ওঠে—আঃ। তোমরা থামো।

নিজের জীবনের মূল্য অপরিসীম তার কাছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূ ব্যাপার হলো রাজকোষে অর্থপ্রেরণ। অর্থের স্রোতধারা একটু ক্ষীণ হলেই বাদশা অনুগ্রহের ধারাও কমে যাবে, একথা সে ভালভাবে জানে। বাদশাহের অনুগ্রহ নিভ করে স্বার্থের ওপর। তাই সে কোন বিশেষ বাদশাহের প্রতি আবেগে অনুরা আপ্লুত হবে না কখনো। বাদশাহ আলমগীর এখন তখ্‌ত্‌তাউসে আছেন ব তিনি তার মালিক। কিন্তু আজই যদি তিনি সিংহাসনচ্যুত হন, তখন তাঁকে অ চিনবে না কারতলব খাঁ। যদিও উপাধিটা তিনিই দিয়েছিলেন। নতুন যিনি দণ্ড ধরব তিনিই হবেন কারতলব খাঁয়ের সর্বেসর্বা। অন্য কাউকে সে চিনবে না। সুত সারাজীবন তাকে এই মুলুক থেকে অর্থ প্রেরণের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। গ বারে এক কোটি পাঠিয়েছে, পরে আরও বেশী পাঠাতে চেষ্টা করতে হবে। আর সে সম্ভব। কারণ দূর থেকে বাংলা মুলুককে মনে হয় বুঝিবা পরিত্যক্ত। কিন্তু হিন্ স্থানের কোথাও যদি ব্যবসায়ের ক্ষেত্র থাকে তা হলো এই দেশ। নইলে সাত সম তেরো নদী পার হয়ে ওই ফিরিঙ্গিরা এখানে এসে ভীড় করত না।

স্বামীকে হঠাৎ চিন্তামগ্ন দেখে বেগমসাহেবা কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে স্থানত্যাগ ক স্বামীর মধ্যে কখনো সে কোন উচ্ছ্বাস দেখেনি। এমন কি যৌবনেও নয়। সব স মস্তিষ্ক ঠান্ডা। প্রতিটি কাজে হিসাব। প্রতিহিংসা গ্রহণের ব্যাপারেও তা কখনো কেউ যদি তার ক্ষতি করে কিংবা শত্রুতা করে, সে নীরব থাকে। তার স আগের মতই স্বাভাবিক ব্যবহার করে। এমনকি কখনো কখনো আরও ভাল ব্যবহ করে। তারপর কোন একদিন সুযোগমত তার ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে। সে প্রতিহিংসা হয় বড় মর্মান্তিক। বেগমসাহেবার কাছে তখন মানুষটাকে আর মান বলে মনে হয় না। তবু সে মানুষই। তাই শত সহস্র গুণের মধ্যে দোষও কি কিছু আছে।

অবশেষে যে আশঙ্কায় দিন কাটছিল কারতলব খাঁয়ের সেই দিনটি এলে সুবাদার আজিমউদ্দিন যতই তাকে অপছন্দ করুক, তবু সে সুবাদার। তার ও

বাদশাহের পৌত্র—বলা যায় শাহজাদা। তাকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে কখনো ঠত হয় না কারতলব খাঁ। মাঝে মাঝে আজিমউদ্দিনের প্রাসাদে গিয়ে সে তার মান জানিয়ে আসে। বাদশাহ টাকা পয়সার ব্যাপারে তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা য়ছেন বটে, কিন্তু সুবাদার তো করেননি। সুবাদার সবার ওপরে।

সেদিনও সে কোরাণ নকল করার পর পোষাক পরে রওনা হয়। একবার ভাবে রক্ষী কাউকে নেবে। তারপর আর নেয় না। সঙ্গে তো অস্ত্র থাকেই। নগরীর াশ্য পথে সৈন্যসামন্ত নিয়ে কেউ তার ওপর চড়াও হবে না। কিন্তু কিছুটা পথ ক্রম করতে এক উন্মুক্ত স্থানে তার ঘোড়া মাথা উঁচুর দিকে তুলে হঠাৎ থেমে ড়। সন্দিগ্ধ হয় কারতলব খাঁ। ঘোড়াটি এই ধরণের অদ্ভুত আচরণ যতবার ছে, ততবারই একটা না একটা কিছু ঘটেছে। এক অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে রাটির। নিজেকে প্রস্তুত করে নেয় সে। হয়ত কিছু ঘটতেও পারে। সে ঘোড়াটির টে পা দিয়ে খোঁচা দেয়, ছোট্ট বেত দিয়ে সামান্য একটু আঘাত করে, তবু সে নের ওই সংকীর্ণ গলির ভেতরে প্রবেশ করতে চায় না।

বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করে কারতলব খাঁ ওই উন্মুক্ত স্থানটিতে। চারদিকে একবার ট মেলে সে। কোথাও কেউ নেই। তারপর সামনের গলির দিকে নজর পড়ে। ান থেকে বেরিয়ে আসছে কিছু অস্ত্রধারী। সামনের লোকটিকে তো চেনে। দুল ওয়াহেদ। নকদি সিপাহীদের টাকা পয়সা সে নেয়।

ওয়াহেদ সামনে আর তার পেছনে আরও পাঁচ ছয় জন। ওরা কারতলবকে ঘিরে ায়।

—কি ব্যাপার? এভাবে দাঁড়িয়েছ কেন?

ওরা চোখ রাঙিয়ে বলে—জানেন না? মাগনা খাটিয়ে নিচ্ছেন, পয়সা কই? াদের পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিন সব।

ওরা হৈ চৈ শুরু করে। মুহূর্তে কারতলব খাঁ বুঝতে পারে ওদের উদ্দেশ্য। াজাদা শেষ পর্যন্ত ওদের ক্ষেপিয়ে তুললো? ওদের আসকারা দিতে হয় কখনো? াড়া ওদের প্রতিটি পাওনাগণ্ডা মেটানো আছে। এটা অজুহাত। তাকে হত্যা র অজুহাত।

দাঁতে দাঁত চেপে কারতলব খাঁ তরবারি উন্মোচিত করে বলে ওঠে—মেটাচ্ছি তোদের না গণ্ডা। আয়—

প্রচণ্ড বেগে সে আক্রমণ করে আবদুল ওয়াহেদকে। হকচকিয়ে যায় সে। বর্ম-নেই তার। কয়েকজন আহত হতেই ওরা পালায়। ওদের মনে বিদ্বেষ ছিলনা মরিয়া হয়ে আক্রমণ করতে পারল না। কারণ ওদের বেতন খুব নিয়মিত দেওয়া যা প্রত্যাশার অতীত।

ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কারতলব খাঁ ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় আজিমউদ্দিনের র দিকে। আজ একটা হেস্তনেস্ত সে করতে চায়। কিছুতেই ছাড়বে না।

এর জন্যে দিল্লীর মসনদের অমর্যাদা হয়ত কিছুটা হবে। কিন্তু এখন নরম হ
অমর্যাদা আরও বাড়বে। তাছাড়া তার নিজেরও একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে। শ
দাসত্ব করার জন্যে সে এখানে বসে নেই।

আজিমউদ্দিনেরও কপাল মন্দ। অন্যান্য দিনে এই সময়ে তিনি হারেমে থাকে
আজ বাইরে এসে ওয়াহেদের প্রতীক্ষা করছিল। কালকে তাকে কড়া ভাবে ধমকে দিয়ে
অনর্থক সময় নষ্ট করার জন্য। ওয়াহেদ আর মাত্র একটি দিনের সময় চেয়ে নিয়েছি
কিন্তু তার পরিবর্তে স্বয়ং কারতলব খাঁকে দেখে সে ভূত দেখার মত চমকে ও
তার পোষাকের ছিটে ফোঁটা রক্তের দাগও চোখে পড়ে।

—এ কি? দেওয়ান সাহেব! আপনি?

—বিশ্বাস হচ্ছে না বোধহয়। ভাবছিলেন নকুদি ফৌজের সেই শয়তানটা এ
আপনাকে কুর্নিশ করে দাঁড়াবে হাসিমুখে।

মুহূর্তে আজিমুদ্দিন বুঝতে পারে এই তীক্ষ্ণবুদ্ধির মানুষটির কাছে সে ধ
পড়ে গিয়েছে। ওয়াহেদ একটা বেআক্কেলে বেকুফ। ওর উপর ভার দেওয়া
হয়েছে। কিন্তু কারতলব খাঁ-এর মত মানুষ শিষ্টাচার পর্যন্ত ভুলে গেল? সো
তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে? অস্বস্তির ব্যাপার।

ধমনীর তৈমুর-রক্ত তাকে সংযত করল। সে বলে—দেওয়ান সাহেব যতই উত্তে
হন, শিষ্টাচার ভুলতে আগে কখনো দেখিনি। এই জাহাঙ্গীর নগরীর নদীতে বাদশ
জাহাজ আসলে দেওয়ান সাহেবকে দেখেছি সেই জাহাজকে অবধি সেলাম জানাতে
দিল্লীর দিকে মুখ করে বাদশাহকে কুর্নিশ করতে। অথচ—

ভুল ভেবেছিল আজিমউদ্দিন। দেওয়ান সাহেবের ধমনীতে তৈমুর রক্ত
থাকতে পারে। কিন্তু তার হৃদয়ে আবেগ উচ্ছ্বাসের বালাই বলতে কিছুই নে
কিন্তু সে আবেগের অভিনয় করতে পারে। সময় মত উচ্ছ্বাসও দেখাতে পারে
তবে সেটাও কৃত্রিম। কার্যোদ্ধারের খাতিরে।

আজিমউদ্দিনের একেবারে কাছে এগিয়ে যায় কারতলব খাঁ। আজিম বসে
একটি আসনে। সামনা সামনি আর একটা আসন ছিল। সেটি সজোরে টেনে নি
আজিমের ঠিক সামনে বসে সে। হাঁটুতে হাঁটু ঠেকে যায়। আজিম স্তম্ভিত। কি
দেওয়ানের চোখের পাতা পড়ছে না—একই দৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকে বাং
সুবাদারের চোখের দিকে। সেই চাহনি আর সহ্য হলো না আজিমের। তার ম
অপরাধবোধ ক্রিয়া করতে শুরু করে। তার চোখের পলক পড়ে।

এতক্ষণ যেন এই অপেক্ষাতেই ছিল কারতলব খাঁ। সে বলে—আমি অনেক
করেছি। আর নয়। যদি ভেবে থাকেন এইভাবে শত্রুতা চালিয়ে যাবেন, আজ
অবসান ঘটাব। আমার কাছে ছোরা আছে। সেই ছোরা আমূল বসিয়ে
আপনার বুকের বাঁ দিকে। তারপর—। না, তারপর আমি আর বা
চাইনা। বাদশাহের কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। তিনি আমার পালক পিত

দেওয়ানী দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে আমাকেও সেই পদ দিয়েছেন। আপনাকে হত্যা করে আমিও বাঁচব না। এই যে ছোরা—আপনাকে শেষ করে, নিজেও শেষ হবো আজ। নিন, প্রস্তুত হন।

কারতলব খাঁ উঠে দাঁড়িয়ে নিমেষে কোমরের ছোট্ট খাপ থেকে ছোরা নিষ্কাষণ করে। আজিমের তৈমুর-রক্ত মনে হলো আবার মাথা চাড়া দিল। সে ভীত হয়ে পড়ল না। সেইভাবেই বসে থেকে বলে—আমি বুঝতে পারছি দেওয়ান আমার অন্যায় হয়েছে। আমি আর লোক জানাজানি হতে দিতে চাই না। আপনি সব ভুলে যান। আমরা দুজনা বাদশাহের প্রতিনিধি হয়ে মিলেমিশে কাজ করব এবার থেকে।

আজিমউদ্দিনের অবিচলতা কারতলবকে মুগ্ধ করে। সে জানল না, আজিম অবিচলিত থাকলেও আসলে সে ভয় পেয়েছে। মরণের ভয় নয়। তার ভয় আলমগীর এ খবর জানলে তাকে ছেড়ে দেবেন না। কারতলব খাঁ তাঁর নিজের লোক। তার কাজে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা সুবাদার হয়েও তার নেই।

কারতলব বলে—আমার পেছনে এভাবে আততায়ী লাগিয়ে ছিলেন বলে আমি অশিষ্ট আচরণ করেছি আজ।

—জানি, দেওয়ান সাহেব। ঠিক আছে। সব ভুলে যান।

সেইদিনই ফিরে গিয়ে কারতলব বাদশাহের কাছে সমস্ত ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে একটি পত্র প্রেরণ করে বিশেষ দূত মারফৎ। শেষে সে প্রার্থনা জানায় নিজের মত স্বাধীনভাবে যখন কাজ করার উপায় নেই তার, তখন বাদশাহ যেন অনুগ্রহ করে তাকে এই কাজ থেকে অব্যাহতি দেন। দেশের অন্য কোথাও তাকে যে কোন কাজে নিযুক্ত করুন। তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকবে।

বাদশাহের কাছ থেকে উত্তর এলো অচিরে। তিনি স্পষ্ট লিখেছেন, কারতলব খাঁ তার সমস্ত কাজের জন্য দায়বদ্ধ শুধু স্বয়ং বাদশাহের কাছে। পৃথিবীর আর কারও তার কাজে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। সুতরাং সে নিজের খুশী মত স্বাধীন ভাবে যেন কাজ চালিয়ে যায়। তিনি তার কাজে অত্যন্ত সন্তুষ্ট।

বাদশাহ আলমগীর নিজের হাতে আর একখানি পত্র লিখে পাঠালেন পৌত্র আজিমউদ্দিনকে। তিনি লিখলেন: কারতলব খাঁ হিন্দুস্থানের শাহেনশারে ব্যক্তিগত কর্মচারী। তার সম্পত্তির যদি সামান্যতম ক্ষতি হয় কিংবা তার দেহে যদি চুলের মতও আঁচড় লাগে তাহলে আমি নিজে তোমার ওপর প্রতিশোধ নেব বুঝলে। খোকা?

আজিম পিতামহের পত্র পেয়ে বিমর্ষ হলো। বুঝতে পারল বাড়তি টাকা রোজগারের পথ আর রইল না। অথচ সেই টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন। বাদশাহদর বয়স হয়েছে। যে কোন সময় অঘটন ঘটে যাবে। তখন ভায়েদের মধ্যে যে লড়াই বাঁধবে তাতে প্রচুর টাকার দরকার। হ্যাঁ শুধু টাকা। টাকার লোভ দেখিয়ে আমীর

ওমরাহদের বশে রাখা যায়। একমাত্র টাকাই সৈন্য সংগ্রহে সাহায্য করে। টাকা রসদ যোগায়। বাদশাহ এটা কি করলেন। তিনি কি চান না তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ মুয়াজিম তাঁর মৃত্যুর পরে হিন্দুস্থানের বাদশাহ হোন? এখন যখন তাঁর প্রিয় পুত্র আকবর আর জীবিত নেই? বৃদ্ধের মনোভাব বুঝতে পারা বড়ই কঠিন। চিরকাল নিজের চারদিকে ধোঁয়ার জাল বিস্তার করে রহস্যময় হয়ে রইলেন তিনি।

তবু এতসবের মধ্যেও মাঝে মাঝে আজিমউদ্দিন হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। চার বছর আগের সেই ঘটনার কথা তাকে বড় বেশী পীড়িত করে। সে তখন ঢাকার সুবাদারী গ্রহণের জন্য অগ্রসর হচ্ছিল। পথে আফগান বিদ্রোহী রহিম শাহ্-এর অত্যাচার কাহিনী তার কানে এলো। রহিম তখন বর্ধমান এবং আশেপাশের সমস্ত এলাকা অত্যাচারে জর্জরিত করছিল। প্রচুর ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করছিল। হত্যা করছিল নির্বিচারে। বর্ধমানের মহারাজাও তার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হলেন। আজিমউদ্দিন দেখলো রহিমকে পরাস্ত করা তার সব চাইতে বড় কাজ। রহিমকে হত্যা করতে পারলে বাংলায় সে সম্মান পাবে। তাই সব ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাকে পরাস্ত আর হত্যা করল। বর্ধমানে রাজার ছেলেকে পিতার রাজ্য ফিরিয়ে দিল সে। ফলে সত্যিই তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হল বাংলায়।

সেই সময় সে একদিন তার দুই পুত্র করিমউদ্দিন, আর ফারুকশিয়ারকে পাঠালো সুফী সাধক বায়েজিদের কাছে। দুজনেই তখন বলতে গেলে বালক। দূর থেকে সাধককে দেখে ফারুক তাড়াতাড়ি তার অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে বিনয়ের সঙ্গে আনত মস্তকে তাঁর সামনে গিয়ে হাজির হয়। আর করিম উদ্ধতের মত ব্যবহার করল। সুফী বায়েজিদ করিমের ওপর চটে গেলেন। তিনি ফারুকের হাত ধরে তাকে পাশে বসিয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করলেন—আজ আমি বলছি তুমি হিন্দুস্থানের অধীশ্বর হবে।

সাধককে সঙ্গে নিয়ে ফারুক পিতার কাছে এলো। আজিমউদ্দিন একথা সেকথার পর প্রার্থনা জানালেন সে যাতে ভবিষ্যতে কোনদিন বাদশাহ হতে পারে। সুফী বায়েজিদ প্রার্থনা শুনে মর্মাহত হলেন। তিনি বলেন—আমার জ্যা থেকে তীর ইতিমধ্যেই নিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে। তোমার কনিষ্ঠ পুত্রকে বলে দিয়েছে সে হিন্দুস্থানের শাহেনশাহ হবে। আর তো উপায় নেই শাহজাদা।

এই দৃশ্য জাগ্রত এবং স্বপ্নাবস্থায় দেখে প্রায়ই আজিমউদ্দিন হতাশগ্রস্থ হয়ে পড়ে। দেওয়ান কারতলব খাঁ-এর ঘটনাও যেন ইঙ্গিতবহ। তখ্‌ত্-তাউস অধিকারীর তালিকায় তার নাম কখনো উঠবে না। মুঘল বংশের সহস্র সহস্র সন্তান-সন্ততির মধ্যে সে একজন অজানা অচেনা বংশধর হয়েই থাকবে। তবু ফারুক যদি কখনো বাদশাহ হয়, যদি তার পিতা মুয়াজিম বাদশাহ হতে পারেন, তাহলে তার নামটাও কখনো সখনো উচ্চারিত হলেও হতে পারে ভবিষ্যতে—এইটুকুই সান্ত্বনা।

কারতলব খাঁ মনস্থির করে ফেলে সে আর সুবাদার আজিমউদ্দিনের সঙ্গে একই নগরী জাহাঙ্গীরাবাদে থাকবে না। বিশ্বাস নেই, কখন শাহাজাদার কী মতি হয়। হয়ত পথের কাঁটা সরাতে তাকে গায়েবী খুন করে বসবে। এই নগর কোনদিনই তার ভাল লাগে না। এখানে বসে সারা বাংলার রাজস্ব আদায়ের অনেক অসুবিধা। শহরটি দেশের ঠিক মধ্যবর্তী অঞ্চলে নয়। যাতায়াতে সুবিধা নেই। সেই দিক দিয়ে মুখসুদাবাদ আদর্শ স্থান। পাশ দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত। যোগাযোগ ব্যবস্থা সুন্দর। সেখানকার ফৌজদার সে। তার আলাদা সম্মান সেখানে।

বেগমসাহেবাকে ডেকে সে তার সিদ্ধান্তের কথা জানায়। শুনে বেগমসাহেবা খুশীই হলো। জিন্নৎ-এর মুখে বহুদিন পরে এক ঝলক হাসির রেখা ফুটে উঠল। কারতলব খাঁ বুঝলো, মনে মনে কেউ এখানে নিশ্চিন্তে ছিল না। বিশেষ করে জিন্নৎ-এর আনন্দের কারণ স্বামী সুজাউদ্দিন তার পুরোনো পাপ-সংস্পর্শগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, কিছুদিন অন্তত বশে থাকবে।

কিন্তু জিন্নৎ কতদিকে সামলাবে। তারা যখন মুখসুদাবাদে যাত্রার পরিকল্পনা করছিল ঠিক তখনই প্রাসাদ শীর্ষের এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে সায়াহ্নের রক্তিম সূর্যালোকে আর এক দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছিল অতি সঙ্গোপনে। সেখানে নায়ক হলো কৈশোর উত্তীর্ণোদ্যত এক তরুণ আর নায়িকা হচ্ছে জ্বলন্ত যৌবনবতী এক তরুণী। প্রথমজন জিন্নৎ-পুত্র মীর্জা আসাদউল্লা আর অপরজন নীতিনিষ্ঠ কারতলব খাঁয়ের সতর্ক প্রহরাধীন হারেমের আর এক বাঁদী—নাম হাসান-বিবি।

হাসান-বিবি বেশ কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করেছে তার প্রতি আসাদউল্লার লোলুপতা! বেশ মজা লাগত। ভীরু আসাদ এগোতে সাহস পাচ্ছিল না। বয়স কতই বা। তবু কিছু কিছু তরুণ যেমন প্রথম থেকেই মরিয়া, এ তেমন নয়। এদের নিয়ে খেলা করতে কত সুখ। আসলে খেলা করতে এবং নিজে খেলতে বরাবরের আনন্দ হাসান-বিবির। মনে আছে তার গাঁয়ের তোফাজ্জুলের কথা। কতই বা বয়স তখন। ওই বয়সেই তোফাজ্জুল কী দুর্দান্ত ছিল। সে-ই তাকে যৌবনের স্বাদ প্রথমে পেতে শিখিয়েছিল। তারপর সে হঠাৎ কোথায় চলে গেল। আর হাসান-বিবি উঠতি যৌবন নিয়ে ধিকিধিকি জ্বলতে থাকল। দেশে এলো দুর্ভিক্ষ। পেটে অন্ন নেই। সাধের যৌবন শুকিয়ে যেতে বসল। সে নগরীতে পালিয়ে এসে পাকে চক্রে পড়ল এই হারেমে। আজ সে আর স্বাধীন কেউ নয়। সে বাঁদী। শুধু নয়, সে ক্রীতদাসী। কপাল তাকে এপথে এনেছে। কিন্তু তাই বলে যৌবন চলে যায়নি। এখানেই সে সুযোগ পেয়েছে। মতিবিবির কংকাল এখনো পড়ে রয়েছে। আরও কত কংকাল পড়ে আছে পাতালের ওই গুপ্ত প্রকোষ্ঠে তার ঠিক নেই। এতটুকু অন্যমনস্ক হলে কারতলব খাঁয়ের হারেমের বাঁদীদের অন্য কোন শাস্তি নেই। মতিবিবি কার সোহাগে স্থানকাল ভুলেছিল সে জানে। শুধু মতিবিবি তো নয়, হাসান-বিবিও তার আদর খেয়েছে চূড়ান্তভাবে। তখন মনে হয়েছিল সে তো বাঁদী নয়, সে বাংলার শাহেনশাহ যদি কেউ

থাকে তার বেগম। কিন্তু বড় ক্ষণস্থায়ী সেই বাস্তবস্বপ্ন। অল্পেতেই ভেঙে যায়। আবার সে বাঁদী হয়ে যায়। আবার ছোটাছুটি বেগমসাহেবার মন রাখতে। জীবনটা বিস্বাদ মনে হয়।

আসাদের ভাবগতিক দেখে সে আজই টোপ ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে টোপ গিলে ফেলে আসাদউল্লা। ছোটবেলায় বর্ষার পরে সে দেখেছে গাঁয়ের খানাখন্দের মধ্যে জমে থাকা জলে বঁড়শীর টোপ ফেললে টাকি মাছ সঙ্গে সঙ্গে গিলে ফেলত। ঠিক তেমনি। আজ কিছুক্ষণ আগে তাকে একা পেয়ে. আলগোছে হাতের ইশারায় তাকে ওপরে চলে আসতে বলে, নিজেও যতটা কমনীয় ভঙ্গিতে উঠে এলে বাচ্চা ছেলের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া যায় সেইভাবে উঠে এসে এই ঘরে ঢুকেছে। একটু পরেই ছায়াপাত। সেইদিকে চেয়ে দেখে উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে তরুণ। হাসান-বিবি তখন ওখানকার শক্ত কাঠের শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে ওকে কাছে ডাকে। ও এগিয়ে আসে।

—বসবেন না ?

আসাদ বসে। তাকে আড়ষ্ট দেখায়।

হাসান-বিবি তার হাত দুখানা টেনে নিয়ে নিজের বুকে চেপে ধরে। কি রকম কেঁপে ওঠে আসাদ। হাসান-বিবি তাকে দুহাতে জাপটে ধরে বুকে টেনে নেয়। তাকে চুমু খায় কতবার।

—তুমি আমাকে খাবে না চুমু ?

আসাদ ক্ষেপে ওঠে। চুমুতে ভরিয়ে দেয়।

এবারে হাসান-বিবির মধ্যে আগুন ধরে। ছয় মাস আগে ছেলেটির বাবা তাকে কতভাবে আনন্দ দিয়েছিল। সেদিন সে ছিল নিশ্চেষ্ট। তার করার কিছুই ছিল না। আর আজ তাকেই সব করতে হবে। হ্যাঁ। সময় কড় কম। সে আসাদকে ছাড়িয়ে ছুটে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে আসে। তারপর বিবস্ত্র হয়ে বলে—আমাকে তোমার ভাল লাগছে ?

—খুব।

—তবে চুপচাপ আছো কেন ?

হাসান-বিবি দরজা বন্ধ করে দিলেও, অতিরিক্ত উত্তেজনায় পাশের ছোট জানালাটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। সেই জানলার দিকে পড়ন্ত রোদের মধ্যে এগিয়ে আসে আর এক মূর্তি সন্তর্পণে এক পা এক পা করে। দূর থেকে আসাদকে সে চোরের মত ওপরে উঠতে দেখেছিল। কারতলব খাঁয়ের সঙ্গে মুখসুদাবাদে চলে যাবার ব্যাপারে আলোচনা সেরে সে একটু আগেই বের হয়ে এসেছিল।

ছাদে আসাদকে না দেখতে পেয়ে তার মনে সন্দেহ জাগে। স্বভাবতই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের দিকে দৃষ্টি যায়। ওখানে কে থাকে সে জানে না। কারও থাকার কথা নয়। কারণ ওটি হারেমের অন্তর্ভুক্ত। বর্ষাকালে হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেলে তারা ওখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে মনে আছে। কিন্তু এখন দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আসাদউল্লা

ওখানেই আছে। কী করছে?

এগিয়ে যায় জানলার দিকে। প্রতিপদে দ্বিধা। যদি তেমন কিছু দেখে কী করবে? শেষে আসাদ এই বয়সেই বাপের মত হয়ে উঠলো? না না, অতটা কি হবে? ওতো সাহসী নয় সুজাউদ্দিনের মত। ও ভীতু। সবে যৌবন এসেছে, তাই একটু চাঞ্চল্য দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। সেটাই স্বাভাবিক। আসলে সে পুরুষ—নারী তো নয়। নারী অপেক্ষা করে, পুরুষ এগিয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে নোংরামি করবে?

জানালার সামনে গিয়ে ভেতরের দৃশ্য দেখে সে স্তম্ভিত হয়। তার কণ্ঠ কে যেন চেপে ধরে। সে লজ্জায় সরে আসে। তার ছেলে, আর ওই শয়তানী। ওকে তো সুজার সঙ্গেও একবার ঘনিষ্ঠ অবস্থায় প্রায় দেখে ফেলেছিল সে। সুজা খুব কৌশলে সেই অবস্থা কাটিয়ে দিলেও বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয়নি জিন্নৎ-এর। কিন্তু আজ যে তার নিজের ছেলে। কী করবে? কাকে দোষ দেবে?

জিন্নৎ ছাদের প্রান্তে বসে পড়ে দুহাত দিয়ে কপাল চেপে ধরে নিঃশব্দে কাঁদে। গলা দিয়ে স্বর বের করতে ভয়। যদি ওরা শুনে ফেলে? সে কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত দিয়ে বুক চেপে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামে।

সামনেই বেগমসাহেবা!

—একি। কি হয়েছে তোর?

—কিছু না।

—বললেই শুনব? তুই অসুস্থ। চল্ তোকে শুইয়ে দিয়ে হাকিম ডাকছি।

বেগমসাহেবা তার গায়ে হাত দিতেই সে হাত সরিয়ে দিয়ে চিৎকার করে ওঠে—হাকিম, হাকিম। হাকিম আমায় কী করবে? কেউ কিছু করতে পারবে না।

—কি হয়েছে?

জিন্নৎ-এর এইটাই সবচেয়ে যন্ত্রণা যে এতবড় অন্যায় দেখেও সে কিছু বলতে পারবে না। হাসান-বিবির মৃত্যু হোক তাতে কিছু নয়। কিন্তু তার নিজের পুত্র? তার যে বদনাম হবে। একেতো স্বামীর স্বভাব সবাই জানে, তার ওপর ছেলেটা সম্বন্ধে জানাজানি হয়ে গেলে কোন্ গর্বে সে বেঁচে থাকবে? না না, হাসান-বিবি বেঁচে গেল। তবে মুখসুদাবাদে সে যাবে না। তাকে এখানে ছেড়ে যাওয়া যাতে হয়, সেই ব্যবস্থা সে করবে।

মুখসুদাবাদে দ্রুত যাওয়ার জন্যে পরদিনই কারতলব খাঁ দেওয়ান-ই-আমে গিয়ে কানুনগো, আমিন, শিকদার প্রভৃতি রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তাদের স্পষ্ট বলে সাতদিনের মধ্যে তাদের সবাইকে নিয়ে সে রওনা হবে মুখসুদাবাদে। মুখসুদাবাদ হবে তাদের কর্মস্থান। কানুনগো দর্পনারায়ণ তার সহকারী কানুনগো জয়নারায়ণের মুখের দিকে চাইল। জয়নারায়ণ দর্পনারায়ণের চাহনিতে বিদ্রূপ ফুটে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নেয়। সবার মত সেও

জেনে ফেলেছে বাদশাহ আলমগীরের চিঠির মর্মার্থ। কারতলব খাঁ যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সেটা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং তার আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে চলা উচিত। সাধারণ দেওয়ালের একটা কান থাকে, আর রাজপ্রাসাদের দেওয়ালের থাকে সহস্র কান। কারতলব খাঁ কীভাবে ছুটে গিয়েছিল বাদশাজাদার কাছে, সেখানে কী ঘটনা ঘটেছিল এবং পরে ক্রুদ্ধ বাদশাহ কী লিখেছিলেন পৌত্রকে কারও অজানা নেই, প্রাসাদের দেওয়ালের কানের মারফৎ। জয়নারায়ণ জানে দর্পনারায়ণের মত হিসাবে দক্ষ মানুষ শুধু বাংলা কেন, সারা হিন্দুস্থানেও হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এই গুণের জন্যে বড় বেশী গর্ব যেন মানুষটার। নিজেকে সবজান্তা ভেবে বসে আছে। কোনদিন বেশী জানার মত্ততায় নিজের বিপদ ডেকে না আনে।

ওদিকে সুবাদার আজিমউদ্দিনের কাছে এসে পেঁছিলো বাদশাহের দ্বিতীয় পত্র— আরও কড়া এবং বলতে গেলে সম্মানহানিকর। বাদশাহ লিখেছেন আজিমউদ্দিন যেন তার দ্বিতীয় পুত্র ফারুকশিয়ারকে বাংলায় তার প্রতিনিধি হিসাবে সারবলন্দ খাঁয়ের কাছে রেখে দেরী না করে বিহারে গিয়ে তার রাজধানী স্থাপন করে। ফলে কারতলব খাঁ তাকে না বলে দলবল নিয়ে মুখসুদাবাদের দিকে রওনা হবার অল্পদিন পরেই সে-ও তাঁর প্রথম পুত্র করিমউদ্দিন আর অন্যান্য বেগম এবং কর্মচারীদের নিয়ে মুঙ্গেরের দিকে যাত্রা করে। কিন্তু মুঙ্গের জায়গাটা তার মনঃপুত না হওয়ায় পাটনা শহরকে তার রাজধানী হিসাবে নির্বাচিত করে। এর পাশেও রয়েছে গঙ্গা। বাদশাহের অনুমতি নিয়ে সে নগরীর উন্নতিসাধন করে এবং নিজের নামে নাম দেয় আজিমাবাদ।

মুখসুদাবাদের প্রথম প্রভাত ছিল কুয়াসাচ্ছন্ন। পূর্ব আকাশ উষা লগ্নে রক্তিম হয়ে না উঠে, গাঢ় সাদা ঘোমটায় অবগুণ্ঠিত হয়ে রইল। কিন্তু সময় থেমে থাকল না তার জন্যে। দূরের মসজিদ থেকে আজানের উদাত্ত আহ্বান ভেসে এলো। কারতলব খাঁ প্রতিদিনের মত প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করে নমাজের জন্য প্রস্তুত হলো। প্রথম দিন হলেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম কিছু ঘটতে দেবে না ঠিক করেছে। নমাজের পর কোরাণ নকল করতে বসবে। ঢাকা থেকে আসার পথে সে নিশ্চিন্ত মনে অনেক কিছু ভাববার সময় পেয়েছে। তখনই ঠিক করেছে শুধু একা সে নয়, আরও অনেক অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে দিয়ে সে প্রতিদিন কোরাণ নকল করার ব্যবস্থা করবে। আর সেই সব পুঁথি পাঠাবে মক্কা মদিনা ইত্যাদি তীর্থস্থানে। তাছাড়া প্রতিদিন কোরাণ পাঠের ব্যবস্থাও করতে হবে। আজই কাজ শুরু করতে হবে। ধর্মকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে না রাখলে কর্ম করবে কি করে? ধর্মের বনিয়াদ শক্ত হলেই না কর্ম।

বড় বড় ধার্মিক ব্যক্তিদের মাঝে মাঝে আমন্ত্রণ জানিয়ে সেবকের মত তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে ভালমন্দ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করবে সে।

আসলে নতুন জায়গায় স্বাধীনভাবে চলবার সুযোগ পেয়ে কারতলব খাঁয়ের মত হিসেবী মানুষও স্বপ্ন দেখছে। তবে এ-স্বপ্ন অন্যের স্বপ্নের মত ফানুস হয়ে আকাশে বিলীন হবে না কখনো। কারতলব খাঁয়ের স্বপ্ন অধিকাংশ সময়েই বাস্তব রূপ নেয়।

মীর্জা আসাদউল্লার ঘুম কখনো ভোরবেলা ভাঙে না। আজ ভাঙলো। হাসান-বিবির ঘটনার পর থেকে তার কেমন একলা একলা লাগে। সব বাঁদী এখানে এলো অথচ হাসান-বিবি এলো না। এখানে আসার দুদিন আগে থেকেই তাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। না যাক্ আরও একজন আছে, খুব সুন্দরী। হাসান-বিবির চেয়েও। কিন্তু তার চোখ বড় শান্ত। চোখ কথা বলে না, ভ্রূ কথা বলে না। কেমন যেন। আর একজনকেও সে দেখেছে। নামটা জানে না। তাকে মা সব সময় সঙ্গে সঙ্গে রাখে। আসাদের দিকে আসতে দেয় না। সে বেশ ডাগর ডাগর চোখে তাকায়। সেই চোখে ভাষা আছে। আসাদকে দেখলে ঠোঁটে আলতো হাসি ফুটে ওঠে। একদিন মা ছিল না ধারে কাছে। সেদিন আলতো হাসি আরও একটু ছড়িয়ে পড়ল মুখে। আর সঙ্গে সঙ্গে গালে টোল খেল। ওকে হাসান-বিবির মত পেলে বেশ হতো। কিন্তু মা কি দেবে?

ঘুম ভাঙতেই মনে হলো, এতো জাহাঙ্গীর নগর নয়, এ হলো মুখসুদাবাদ। সে তাড়াতাড়ি জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু কিছু দেখতে পেল না। ঘন কুয়াসা ধোঁয়ার মত রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে। ঘর থেকে বের হয় সে। সব নতুন নতুন লাগছে। এই নগরীর একটা অন্য ধরণের গন্ধ আছে বলে মনে হলো। নাকি এই প্রাসাদের? বাইরে ঘোড়া প্রস্তুত থাকবে তো? বেড়িয়ে আসবে।

কিন্তু ঘোড়া নেই। আসলে কোন কিছুরই গোছগাছ হয়নি। সে এগিয়ে যায় প্রাঙ্গণ পার হয়ে প্রধান ফটকের দিকে। একজন এসে সেলাম জানিয়ে বলে, সে সঙ্গে যাবে। কিন্তু আসাদ তাকে নিতে অস্বীকার করে। এই নতুন জায়গায় সে নিজের মত চলবে। সে বড় হয়েছে যথেষ্ট। তার বাবা যদি তার মাকে তোয়াক্কা না করে যেমন খুশী চলে, সে পারবে না কেন? তবে তার বাবার জন্যে মায়ের মনে কষ্ট আছে সে বোঝে। বাবার সম্বন্ধে দুর্নাম আছে। খুব ছোটবেলা থেকেই সে জানে সেকথা। তবু বাবার জন্যে একটা গর্ববোধ হয় তার। সবাই বাবাকে সমীহ করে। এমনকি দাদু অবধি—যে দাদুকে সবাই ভয় পায়। বাবা কিন্তু পায় না। বোন নাফিসা কিন্তু অন্যরকম। সে বাবাকে বরং ঘৃণাই করে। বলে, বাবা হলে কি হবে, আসলে অমানুষ। মাকে অবহেলা করে।

নাফিসার কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু অমন চেহারা একটা খুঁজে বের করুক তো। আর কি স্বাধীন। এই তো কাল দুপুরে এসে পৌঁছোনোর পরে সবাই ঘর দেখতে ব্যস্ত—সবাই যখন হারেমের বন্দোবস্ত দেখতে লাগল তখন বাবা কোথায় বেরিয়ে

গেল। মা আর দাদির মধ্যে চোখে চোখে কথা হলো। নাফিসা গম্ভীর হলো আর দাদু নমাজের সময় হয়েছে বলে চলে গেল। নাফিসার গাল টিপলে দুধ বেরোয় এদিকে বড়দের মত কথা বলে! তারপর বাবার আর দেখাই নেই। রাতেও ফিরল না। অদ্ভুত ব্যাপার।

কুয়াশার মধ্যে পথ চলতে ভালই লাগলো আসাদউল্লার। কেউ তাকে চেনে না। কদিন পরে পরিচিত হয়ে গেলে এভাবে আর চলতে পারবে না। সবাই সমীহ করে পথ ছেড়ে দেবে। কথায় কথায় কুর্নিশের ঠেলায় অস্থির হবে। তখন পায়ে হাঁটার কথা ভাবাই যাবে না। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে বুক ভরে কুয়াসা টেনে নিতে সুন্দর লাগছে। একটা ভিজে ভিজে ভাব। সে দেখে সামনে যেন কুয়াসার শেষ নেই। বোঝা গেল নদীর কাছে এসেছে। দাঁড়িয়ে পড়ে সে। তারপর একটু এগিয়ে ভিজে ঘাসের ওপর বসে পড়ে। এভাবে জীবনে সে কখনো একা একা আসেনি। প্রাসাদের বাগান ছাড়া রাস্তায় ঘাসের ওপর কখনো বসেনি।

কিছুক্ষণ পরে কুয়াশা একটু ফিকে হয়। সূর্যের ক্ষীণ রশ্মিও দেখা যায়। আর দেখা যায় প্রায় দিগন্তবিস্তৃত গঙ্গা নদী। নদীর মধ্যে আবছা নৌকো আর বজরাও দেখা যায় দু চারটে। কুলে অনেক জলযানের ভীড়। বেশ নতুন নতুন লাগে আসাদের কাছে। ঢাকায় নদীর এই রূপ নেই। সেখানেও অনেক নৌকো, বিশেষ করে গহনা নৌকোর গুরুত্ব সেখানে খুব বেশী। কিন্তু এত চওড়া নয় সেই নদী।

সূর্য আর একটু উঠলে কুয়াশা দ্রুত মিলিয়ে যেতে থাকে। সব পরিষ্কার হয়ে যায়। এখন আর এভাবে বসে থাকা উচিত হবে না। উঠে দাঁড়ায় সে। সেই সময় দেখতে পায় একটা সুসজ্জিত বজরা, সামনের দিকটা যার ময়ূরের মত, তীরে এসে ভেড়ে। আর সেই বজরা থেকে নামে ঘাগরা পরা এক সুন্দরী। আরে এ কি! সুন্দরীর হাত ধরে হাসতে হাসতে নামছে তার পিতা সুজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁ।

মীর্জা আসাদউল্লা পেছন ফিরে দ্রুত স্থান ত্যাগ করার আগেই পিতার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। সুজাউদ্দিন এক মুহূর্তের জন্যে অবাক হয়। পরক্ষণেই তার মুখ হাসিতে ভরে ওঠে। সে নর্তকীকে পেছনে ফেলে দ্রুত এগিয়ে এসে তার পিঠে থাবড়া মেরে বলে—আরে তুমি? এত সকালে ওঠো নাকি?

—আজই উঠলাম। নতুন জায়গা কিনা।

—ভালই করেছ। কী সাংঘাতিক কুয়াশা ছিল। আমার বজরা ধাক্কা খেতে খেতে বেঁচে গিয়েছে।

আসাদ জিজ্ঞাসা করতে পারে না, মহিলাটা কে। তার বাবারও সে ব্যাপারে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে পেছন ফিরে দেখে মহিলা আবার বজরায় চলে গেল। কিন্তু তার পিতা পেছনে একবারও তাকালো না। বাবার কাছে, পৃথিবীর কোন কিছুরই যেন গুরুত্ব নেই। তার যেন অতীতও নেই ভবিষ্যৎ ও নেই, শুধু বর্তমান নিয়ে তার আগ্রহ।

—এভাবে একা একা বেরিয়েছ, কেউ মানা করেনি ?

—না। কেউ জানে না। হ্যাঁ, একজন দেখেছিল। আমি শুনিনি।

—বাঃ। তবে সঙ্গে অস্ত্র না নিয়ে এভাবে এসো না একা একা। দেখো, আমার সঙ্গে অস্ত্র আছে।

আসাদ আর জিজ্ঞাসা করতে পারে না, মহিলাটি সত্যিই নর্তকী কিনা। তার জানতে ইচ্ছা হয়, সে তার বাবার পূর্ব পরিচিতা কিনা।

একটু পরে সুজা প্রশ্ন করে—কালকে আমার খোঁজ করেছিল নাকি ?

—জানি না।

—দেখলাম নতুন জায়গা। কেউ চিনবে না। হেঁটে আসব একটু। তারপরে নদীর ধারে এসে দেখি বজরা বাঁধা। নাচগান চলছে বজরায়।

—নাচ গান ? কারা শুনছিল ?

—না। নাচগান হচ্ছিল না ঠিক। আয়োজন ছিল। শুনলাম পয়সা দিলে শোনা যায়। উঠে পড়লাম। তবে বাজনাদারদের নামিয়ে দিলাম। আমার বাজনা ভাল লাগে না। নাচ দেখব, শুধু নর্তকী থাকলেই হলো।

—ওরা নেমে গেল ?

—নামবে না কেন ? পয়সা দিলে নেমে যায়।

আসাদউল্লার চোখের সামনে হাসান-বিবির মুখ ভেসে উঠলো। নাচেরও দরকার নেই, গানেরও দরকার নেই।

তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে হঠাৎ—হ্যাঁ, নাচগানের আবার দরকার কি ?

সুজা হঠাৎ পুত্রের কাঁধে হাত রেখে মাথাটা পুত্রের মুখের কাছাকাছি এনে বলে—কি বললে ?

আসাদের মুখ লাল হয়ে ওঠে। সে বলে—না কিছু না।

সুজা হেসে ওঠে একটু জোরে। বলে—তুমি দেখছি বেশ বড় হয়ে উঠেছ আসাদ। জানতাম না তো।

আসাদের মুখের হাসি ফুটি ফুটি করেও ফুটলো না। বলে—আমি একটু তাড়াতাড়ি বড় হতে চাই।

—বেশ। খুব ভাল। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ ? কেউ আমাদের পাত্তা দিচ্ছে না। শুধু পোষাকটা একটু দামী বলে, কেউ কেউ আর চোখে তাকাচ্ছে।

—পোষাক নয়, আপনাকে দেখছে।

—আমাকে কেন ?

—আপনার চেহারাটা দারুণ।

—তাই নাকি ?

—আপনি জানেন না ?

আবার হেসে ওঠে সুজা বেশ জোরে। বলে—হ্যাঁ জানি বৈকি। তোমার

চেহারাও খুব ভাল হবে। আরও একটু লম্বা হবে তুমি। ভাল চেহারার লাভ আছে, বুঝলে? খুব লাভ।

ওরা প্রাসাদের কাছে আসতে সুজা বলে,—চলো আমরা একসঙ্গে ঢুকি। বেশ মজা হবে।

কিন্তু একসঙ্গে ঢুকলেও, নিজের মা, বোন আর দাদির অসংখ্য প্রশ্নবানের সামনে পড়তে হলো আসাদকে সারাদিন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তারা জানতে চায় সুজাউদ্দিনের সঙ্গে কোথায় তার দেখা হলো। কিন্তু একবারও সত্যি কথা বলল না সে। সে বুঝে ফেলেছে পুরুষদের সব কথা মেয়েদের বলতে নেই। তাদের ভীষণ সন্দেহ বাতিক। তারা কেমন সাদামাটা, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা—জীবনে যেন কিছুই করার নেই তাদের দৈনন্দিন কাজ ছাড়া। তবে ব্যতিক্রম আছে বৈকি। হাসান-বিবি যেমন, বজরার ওই সুন্দরী নর্তকী যেমন। তারা পুরুষদের বোঝে। অন্য মেয়েরা কেমন যেন। নিজের যেটুকু প্রয়োজন ঠিক তেমনি হতে দিতে চায় পুরুষদের। মা আর নাফিসার সঙ্গে থেকে থেকে এই ধারণাই হয়েছে আসাদউল্লার। পিতাকে সে মনে মনে পছন্দ করতে সুরু করল। তুর্কীস্থানের যে প্রান্ত থেকে পিতা এসেছে সেখানকার মানুষজন বোধ হয় এই রকমই—উন্দাম উজ্জ্বল।

হিন্দুস্থানের বাদশাহ কে? কারতলব খাঁয়ের মনে এই প্রশ্ন দিনে কতবার উত্থিত হয় তার ইয়ত্তা নেই। প্রশ্নটির উত্তর খুব সহজ—বাদশাহ ঔরঙ্গজেব। বাদশাহ ঔরঙ্গজেবকে সে খুব কাছ থেকে অনেকবার দেখেছে। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার কিছু কিছু সুযোগ তার ভাগ্যে জুটেছে। বাদশাহ তাকে ডেকে তার পালক পিতার স্থানে প্রথমে দিয়েছিলেন। তারপর হায়দ্রাবাদের দেওয়ান করেছেন। শেষে এই বাংলায় পাঠিয়েছেন। সবই বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের কৃপায়। কিন্তু হিন্দুস্থানের বাদশাহ কে? এই প্রশ্নটা মনের মধ্যে উঠলেই তার চোখের সামনে ভাসে ঔরঙ্গজেব যে আসনে বসেন সে আসনটি। হয়ত ময়ূরসিংহাসনই ভেসে উঠত। কিন্তু বাদশাহকে তার দিল্লীতে দেখার সৌভাগ্য কখনো হয়নি। তিনি বহুদিন থেকেই দক্ষিণ ভারতে বিজাপুর গোলকুণ্ডা আমেদনগরের নবাবদের মোকাবিলা করে চলেছেন সেখানে শিবির স্থাপন করে।

হিন্দুস্থানের বাদশাহ কে? সঙ্গে সঙ্গে সেই মহামূল্যবান আসনটি ভেসে ওঠে সামনে। সেই আসনে যে ব্যক্তি বসে রয়েছেন তাঁর কোন নির্দিষ্ট রূপ নেই। তবে রয়েছেন একজন এবং নিঃসন্দেহে তিনি বাদশাহ—দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের প্রতিচ্ছবি সেটি নয়। হ্যাঁ, কারতলব খাঁ জানে, সে শুধু দিল্লীর তখত

তাউসের অতি দীন, অতি বিশ্বস্ত এক ভৃত্য। সেই তখ্ত তাউসে যিনিই আসীন থাকুন না কেন। কারণ তাতেই তার উচ্চাশার চরিতার্থতা। সে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করতে চায় না। সে বাদশাহের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা কল্পনাও করে না। সে অতি সামান্য মানুষ—তাকে অনেক ওপরে উঠতে হবে। অনেক ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে তাকে। অনেক অর্থও সঞ্চয় করতে হবে তার কন্যার বংশের মানুষদের জন্য। তাই বলে সেই অর্থ অনাচার পাপাচার থেকে কখনই সে নেবে না। সে শায়েস্তা খাঁ নয়, সে আজিমউদ্দিন নয়। সে মহম্মদ হাদি—সম্রাটের কৃপায় আজ যাকে সবাই বলে কারতলব খাঁ। সে ঈশ্বরের দীন সেবক হয়ে অনেক উঁচুতে উঠতে চায়। সুতরাং লোভ ক্রোধ ইন্দ্রিয়সুখ তার জন্য নয়। তবে হ্যাঁ, যে তার পথে সামান্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে, যে এতটুকু হুল ফোটানোর চেষ্টা করবে তাকে সে উন্মত্তের মত মেরে না ফেলে ধীরে সুস্থে পথ থেকে সরিয়ে দেবেই। কেউ তাকে বুঝতে পারবে না। এইভাবেই সে নিজেকে গড়ে তুলেছে। পাগলের মত প্রতিশোধ নিও না। যার ওপরে প্রতিশোধ নেবে সেও যাতে ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে। তবেই তো প্রতিশোধ নেবার সুখ। অসি দিয়ে মস্তক ছিন্ন করে কিংবা কামানের সামনে দাঁড় করিয়ে উড়িয়ে দিলে শাস্তিই হলো না। শাস্তি এমন হবে, যাতে মৃত্যু আসে অপরিসীম যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে অতি ধীরে।

মুখসুদাবাদের দেওয়ানখানা খুব কর্মব্যস্ত স্থান হয়ে উঠলো কিছুদিনের মধ্যে। বাংলায় যা আগে কখনো হয়নি, তাই হলো। জমিদারীর সৃষ্টি হলো। আর সেই জমিদারীর অধিকাংশই পেল হিন্দুরা। কারতলব খাঁ একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝেছিল। হিন্দুদের কাছ থেকে কর আদায় করা বেশ সহজ। তারা চুরি করে, ছল চাতুরী সবই করে। তবে চাপের মুখে শক্ত হয়ে থাকতে পারে না বেশীক্ষণ, অনেকদিনের মুসলমান রাজত্বে থেকে থেকে তাদের কলিজার জোর আর তত নেই। তবে তারা তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী। তাই কারতলব খাঁ আর একটি কাজ করল। এতদিন বড় বড় পদে বহাল ছিল ভিনদেশী উচ্চাকাঙ্ক্ষীরা। তারা কেউ এসেছে তুর্কীস্থান থেকে, কেউ পারস্য থেকে, কেউ বা আফগান। এদেশের ওপর তাদের এতটুকু মমতা নেই। এদেশে কখনো তারা থাকবে না। কিছুদিন কাজ করে যে কোন উপায়ে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে তারা চলে যাবে। আর এই টাকার জন্যে তারা ছল চাতুরী, বিশ্বাসঘাতকতা সব কিছু করে—এ অভিজ্ঞতা কারতলব খাঁয়ের খুব ভালই আছে। ধরা পড়ে গেলেও, তাদের দিয়ে অন্যায় স্বীকার করিয়ে নেওয়া দুরূহ ব্যাপার। তার চাইতে বুদ্ধিমান দিশি হিন্দুরা অনেক ভালো। কাজও তারা অনেক ভাল করবে। আর কোথাও কোন রকম অসংগতি দেখলে একটু চাপ কিংবা হুমকি দিলে সব কবুল করে ফেলবে। সুতরাং একে একে বিদেশী কর্মচারীরা বাংলা ছাড়তে শুরু করল আর তাদের স্থানে নিযুক্ত হতে লাগলো হিন্দুরা। জমিদারীর পত্তন শুরু হলো।

বাদশাহের কাছে অর্থ নিয়ে যাবার দিন ঘনিয়ে এলো। হিসাব করে দেখা গেল মুখসুদাবাদে এসে নিজের তদারকিতে সব কিছু রাখায় এবার অর্থের পরিমাণ অন্যান্য বছরের চেয়ে অনেক বেশী। সঙ্গে সঙ্গে কারতলব খাঁ মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। জাহাঙ্গীর নগর থেকে যতবার সে সিপাহীদের প্রহরায় গাড়িতে করে বাদশাহের কাছে রাজকোষের অর্থ প্রেরণ করেছে ততবার সে নিজে সেই গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে নগরীর শেষ প্রান্তে এসে সবাইকে বিদায় দিয়েছে। বাদশাহের প্রতি আনুগত্যের এটাকেও একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে সে ভাবে। কিন্তু এবারে? মুখসুদাবাদে এসে স্বাধীনভাবে কাজ করে এত বেশী অর্থ সে রাজকোষের জন্য সংগ্রহ করল, আর সে নিজে সঙ্গে যাবে না? নিজেকে সেখানে উপস্থিত করতে পারলে বাদশাহ খুশী না হয়ে পারবেন না। সঙ্গে করে সে নিয়ে যাবে বাংলার মসলিন, শীতল পাটি যার প্রান্তদেশ স্বর্ণখচিত, নিয়ে যাবে হস্তী, অশ্ব, এদেশী মহিষ, নেকড়ের চামড়া। তাছাড়া বাদশাহকে উপঢৌকন দেবে সে শ্রীহট্টের গঙ্গাজলী দিয়ে তৈরী মশারী, হাতির দাঁতের জিনিস, বিদেশ থেকে ফিরিঙ্গিদের আনা নানান বিচিত্র দ্রব্য সামগ্রী। বাদশাহ খুশি না হয়ে কি পারবেন? এই সব দ্রব্যসম্ভার সারা বছরে একটু একটু করে সে সংগ্রহ করে রেখেছে। এখন একটা ভাল দিন স্থির করার অপেক্ষা। যেতে হবে সেই দক্ষিণ ভারতে।

কিন্তু একটা অভাবিত বাধার সৃষ্টি হলো যাবার আগে। মুঘল রীতিতে আছে দেওয়ান যতই ক্ষমতাসম্পন্ন হোক না কেন রাজস্ব হিসাব নিকাশ সংক্রান্ত কাগজের ওপর কানুনগোর দস্তখত চাই। সুবে বাংলার মুখ্য কানুনগো হলো অতি দক্ষ দর্পনারায়ণ আর তার সহকারী হলো জয়নারায়ণ। কারতলব খাঁ দর্পনারায়ণকে বেশ আনন্দের সঙ্গেই বলে—এবারে ভাবছি নিজেই যাব বাদশাহের কাছে।

—বেশ ভালই হবে দেওয়ান সাহেব।

—আমি হিসাবগুলো আর একবার পরীক্ষা করে দেখলাম, সব নির্ভুল। হবেই বা না কেন। আপনার মত কানুনগো, আমার।

—আপনি মহানুভব।

কারতলব খাঁ একটু গম্ভীর হয়ে বলে—না। আমি যেটা বাস্তব সেটা স্বীকার করি। আপনি গুণী, আপনার কদর আমার কাছে তাই বেশী। যা হোক ভাবছি আসছে সপ্তাহে বুধবারে আমি রওনা হবো। আপনি দস্তখতটা দিয়ে দিন আজ।

দর্পনারায়ণ সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—আজ হবে না।

ভ্রূকুঞ্চিত হয় দেওয়ানের। সে প্রশ্ন করে—কেন? আজ নয় কেন?

দর্প একটু ঢোক গিলে বলে—আজ বৃহস্পতিবার। আজকের দিনে টাকা পয়সার ব্যাপারে আমি কিছু করি না।

কারতলবের সম্মানে আঘাত লাগে। তবু ভাবে, হয়ত ঠিক কথা বলছে

কানুনগো। বৃহস্পতিবারে ওদের আবার লক্ষ্মীপুজো হয়। সংস্কার থাকলেও থাকতে পারে।

—ঠিক আছে, কাল আসবেন আমার কাছে। সকালের দিকে আসবেন। আমি সব প্রস্তুত রাখব।

দর্পনারায়ণ বলে—দেখি।

কারতলব খাঁ চমকে ওঠে। দর্পের কথার ধরণে তাচ্ছিল্য আর অনাগ্রহ ফুটে ওঠে। সে আর কিছু বলে না।

সেই দিনই সন্ধ্যার দিকে মুখসুদাবাদে ধুলোর ঝড় ওঠে। বছরের এই সময়ে অল্প স্বল্প ঝড়ের সম্ভাবনা যে না থাকে তা নয়, তবে এমন অন্ধকার করে দেওয়া ধুলোর ঝড় কেউ দেখেছে বলে মনে হয় না। যাকে বলে আঁধি। পথ চলতে মানুষেরা আশ্রয়ের খোঁজে বাড়ি ঘর দোকান পাটের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আর সেই ঝড়ের মধ্যে সহকারী কানুনগো জয় নারায়ণের সদর দরজায় সজোরে করাঘাত হয়।

ভৃত্য গোবিন্দের কাজই হলো দরজার সামনে ছোট্ট কুঠরীতে বসে থাকা এবং অতিথি অভ্যাগত কেউ এলে সেই কুঠরীতে বসিয়ে রেখে ভেতরে খবর দেওয়া। তারপর আগন্তুককে বৈঠকখানায় নিয়ে যাওয়া।

ঝড়ের জন্যে এমনিতেই সদর দরজায় নানান রকমের শব্দ হচ্ছিল। আশেপাশের জানলাতে শব্দ হচ্ছিল। তাছাড়া খড়কুটো পাতার সঙ্গে অনেক কিছুই উড়ছিল। তাই দরজায় করাঘাত গোবিন্দ প্রথমে শুনতেই পায়নি। পরে শব্দটা বারবার হওয়ায় উঠে গিয়ে দরজা খুলতে স্বয়ং প্রধান কানুনগোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অপরাধ বোধে তার মুখখানা শুকিয়ে যায়।

—জয়নারায়ণ কোথায় ?

—ভেতরে আছেন এজ্ঞে। আপনি আসুন এজ্ঞে।

তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দর্পনারায়ণকে নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসিয়ে ছুটে ভেতরে গিয়ে জয়নারায়ণকে খবর দেয়।

জয়নারায়ণ রীতিমত চমকিত হয় গোবিন্দর কাছে খবরটা পেয়ে। সন্ধ্যার সময় তার আহ্নিকে বসার অভ্যাস। এই সময় আহ্নিকে না বসলে আর সকালে বেলের মোরব্বা না খেলে তার শরীর আর মন ম্যাজম্যাজ করে। তবু ব্যতিক্রম যে না হয় তেমন নয়। বেল যেমন বছরের সব সময় পাওয়া যায় না। তেমনি আজকের দিনের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হঠাৎ এসে পড়েন। কিংবা তাকেও কতসময় আটকে থাকতে হয় চেহেল সেতুনে কাজের খাতিরে। মটকার কাপড় পরে, কাঠের খড়ম পায়ে প্রস্তুত হচ্ছিল জয়নারায়ণ ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করার জন্য। গোবিন্দের কথা শুনে তাড়াতাড়ি মটকা খুলে ধুতি পরে, ফতুয়াটা গায়ে গলিয়ে চটি পায়ে দিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকে চিৎকার করে ওঠে—ওরে গোবিন্দ, তামাক নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। ওঃ এমন ঝড়—

দর্পনারায়ণ বলে—তামাক টামাকের দরকার নেই। বোসো। খুব জরুরী কথা আছে।

—আপনি নিজে এলেন। ডেকে পাঠালে পারতেন॥

—তোমার বাড়ি এলে আমার সম্মান যাবে না। তাছাড়া এটা আমাদের দুজনেরই স্বার্থের ব্যাপার।

এরপর দেওয়ান সাহেবের কথা বলে। বলে, এখনো দস্তখত্ দিইনি। সময় চেয়ে নিয়েছি।

জয়নারায়ণ ভীত হয়। কারতলব খাঁকে সে খুব ভালভাবে চিনতে পেরেছে। মানুষটার মত এমন দক্ষ ব্যক্তি বাদশাহ আলমগীরও বোধহয় নন। নইলে তাঁর এক চিঠিতে সুবাদার আজিমউদ্দিন অবধি বাংলা দেশ ছেড়ে পাটনায় গিয়ে বসতেন না। তাছাড়া কারতলব খাঁয়ের মাথার মত হৃদয়টাও শীতল। সেখানে আবেগ ভালবাসা প্রভৃতির কোন স্থান আছে বলে মনে হয় না। ওই হৃদয় কখনো কারও জন্যে উষ্ণ হয়েছে বলে মনে পড়ে না। তার অনুরোধকে এভাবে ঠেকিয়ে রেখে উচিত কাজ করেনি দর্পনারায়ণ।

সে দর্পনারায়ণকে বলে—আমার মনে হয় আপনি সই দিয়ে দিলে ভাল করতেন। কালকে দিয়ে দেবেন।

—বলছ কি জয়নারায়ণ। সুবাদারের কথা ভুলে গেলে? তিনি কিন্তু পাটনার উন্নতির জন্যে কিছু টাকা চেয়েছিলেন। ভুলে যেওনা তিনি সাক্ষাৎ বাদশাহের পৌত্র।

—একটু ঝুঁকি আছে ঠিকই। তবু মনে হয় দেওয়ান সাহেবকে বাদশাহ খুব পছন্দ করেন। আমি দক্ষিণ ভারত থেকে আসা মুসলমান কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি একথা।

—না। তোমার পরামর্শ গ্রহণ করা ঠিক হবে না। তাছাড়া দস্তখত্ আমি দিতে পারি, কিন্তু তার পরিবর্তে দু এক লাখ টাকা অন্তত দিক দেওয়ান সাহেব।

চমকে ওঠে জয়নারায়ণ। বলে—আপনি টাকা চাইবেন?

—না চাওয়ার কি আছে? বাদশাহের কাছে গিয়ে সবটা গৌরব তো নিজেই গায়ে মাখবে। আমাদের ভাগ দেবে না। এদিকে কিছু দিক অন্তত। বুঝলে, আমার মনে হয় দিয়ে দেবে। ফাঁদে পড়েছে তো।

জয়নারায়ণ নিস্পৃহ ভাবে বলে—যা ভাল বোঝেন করুন। আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়। কি আর বলব। তবে আমাকে এর মধ্যে জড়াবেন না।

ধুলোর ঝড় কমে আসছে। বাইরে আর শোঁ শোঁ আওয়াজ হচ্ছে না। দরজা জানলাতেও তেমন ঝাঁকি লাগছে না।

একটু হতাশ হয় দর্পনারায়ণ। ভেবেছিল তার সহকারীকে সঙ্গে পাবে। পেলো না।

—উঠি তাহলে।

—আচ্ছা। একটা কথা বলব ?

—বল।

—আপনার ছেলের কথা বলছি। শিবনারায়ণের কথা। বেশ ভাল কাজ শিখেছে। তাকে এসব থেকে দূরে রাখবেন।

—একথা বলছ কেন ?

—আমার মনে হলো। আমি আপনার হিতার্থী। অনেক শিখেছি আপনার কাছ থেকে তাই বলছি।

—বেশ। মনে থাকবে।

পরদিন দেওয়ানখানায় বসতে না বসতেই দেওয়ান সাহেবের ঘর থেকে ডাক আসে দর্পনারায়ণের। প্রস্তুত ছিল সে। সারারাত ভেবে ভেবে সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেছে। টাকা ছাড়া সই করবে না।

কারতলব খাঁ বলে—দস্তখতটা দিয়ে দিন।

—হ্যাঁ দেব। কিন্তু একটা কথা আছে।

দর্পনারায়ণ লক্ষ্য করলে দেখতে পেত দেওয়ানের মুখ কিরকম কঠিন হয়ে উঠল। কিন্তু তারপরই স্বাভাবিক কণ্ঠে দেওয়ান বলে—বলুন কী বলতে চান।

—সই করব। কিন্তু আমার দুই লাখ টাকা চাই।

কারতলব খাঁয়ের মাথা আরও ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সে শান্ত ভাবে বলে—অত টাকা ? একটু কম করুন।

—সেটা সম্ভব হচ্ছে না দেওয়ান সাহেব। কানুনগো হিসাবে আমার চাহিদা কি খুব বেশী ?

—ঠিক আছে।

—টাকা দেবেন তাহলে ?

—না। আপনার সই এর দরকার নেই। দেখি কী করি।

—আমার দস্তখত না দেখলে বাদশাহ বিশ্বাস করবেন না—আপনি দুই কোটি টাকা নিয়ে গেলেও না। বাদশাহের খাস দেওয়ান আমার দস্তখত না দেখলে আপনার রাজস্বের ব্যাপারে এত হিসাবনিকাশ, জমিদারীর এত নিখুঁত বিবরণ সব এক পাশে সরিয়ে রাখবেন। এতে বাদশাহ আপনার ওপর বিরক্ত হবেন।

—ঠিক আছে, আপনি আসুন।

দর্পনারায়ণ একটু দ্বিধাগ্রস্থ হয়। ব্যাপারখানা কি ? মুঘল আইন মোতাবেক তার স্বাক্ষর অপরিহার্য। তবে ? বাদশাহের ওপর কি এতটা প্রভাব ফেলেছে দেওয়ান কারতলব খাঁ। সে ধীরে ধীরে স্থানত্যাগ করে।

সেই রাতে জয়নারায়ণের ডাক পড়ে কারতলব খাঁয়ের খাস আবাসে। জয়নারায়ণ জানত দর্পনারায়ণের প্রস্তাব দেওয়ান প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু তাই বলে তাকে ডাকবে কেন ?

সে যেতে কারতলব খাঁ হিসাবের কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলে—আপনার একটা দস্তখত দরকার।

সে ভালভাবে দেখে বলে—এ তো কানুনগো সই করবে।

কারতলব খাঁ হেসে বলে—কানুনগো হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সহকারী করবে না?

জয়নারায়ণ একটু চুপ করে থেকে বলে—নিশ্চয়।

সিদ্ধান্ত মুহূর্তে নেয় সে। যদিও জানে, সুবাদার আজিমউদ্দিনের ক্রোধের শিকার হতে পারে সে। আজিমউদ্দিন এতদিন যথেচ্ছভাবে টাকা নিত। কারতলব খাঁ সেটা বন্ধ করেছে বলে তার গোঁসা। শেষ পর্যন্ত তাকে পাটনায় গিয়ে উঠতে হয়েছে। যে দেওয়ানের এতটা ক্ষমতা যার ফলে সুবাদারকে সরে যেতে হয়, সেই দেওয়ানের কথা মেনে চলাই আপাতত উচিত। বিপদের ঝুঁকি কম।

সে দস্তখত করে।

কারতলব খাঁ বলে—ভাল করলেন। মনে থাকবে।

নির্দিষ্ট দিনে কারতলব খাঁ দলবল নিয়ে দক্ষিণ ভারত অভিমুখে রওনা হলো। সঙ্গে সারা বছরের রাজস্ব আর উপঢৌকন। পথ বড় কম নয়। অনেক দেরী হবে ফিরতে। যাবার সময় ঢাকায় সুবাদার আজিমউদ্দিনের প্রতিনিধি তার পুত্র ফারুককে জানিয়ে গেল।

এ পথ দিয়ে এবার নিয়ে কম যাতায়াত করতে হলো না কারতলব খাঁয়ের। তবু বারবার যাবার সময় মনে হয় নতুন যাচ্ছে। সেই ছেলেবেলায়, যখন তার পালক পিতা দেওয়ান সফী ইস্পাহানী তাকে গ্রাম্য ভগ্ন কুড়ে ঘরের সামনে থেকে হাত ধরে হাতির পিঠে উঠিয়ে নিয়ে পাশে বসিয়েছিল, তখনও পথের দুদিকে এমন সমতল দিগন্তবিস্তৃত হরিৎ শস্যক্ষেত্র ছিল। তখনো দূরে কোথাও পাহাড়ের রেখা দেখতে পায় নি। অথচ সে জানে এই বাংলা ছেড়ে যাবার আগেই ছোটখাটো পাহাড়ের দেখা মিলবে। জমি এমন সমতল থাকবে না আর। পথও এমন নরম সাদা ধুলোয় আচ্ছন্ন থাকবে না। চলার পথে প্রকৃতি তার রূপ দফায় দফায় পাল্টাবে। সেদিন হাওদায় বসে একবার পেছনে ফিরে দেখেছিল সে। দেখেছিল অবগুণ্ঠিতা রমণী মলিন শাড়ি পরণে, হাতির দিকে চেয়ে কুড়ে ঘরের সামনে আছড়ে পড়ল এই রমণী কিছুক্ষণ আগে তাকে জড়িয়ে ধরে কুড়ে ঘরের মধ্যে ভাঙা গলায় কাঁদছিল। আর দেখল তারই পাশে সেই অতি শীর্ণ গৌরবর্ণ পুরুষটি মহিলার পতন যেন দেখতেই পেল না। সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল হাতির দিকে। তার গলার উপবীতটা দেহের তুলনায় অনেক মলিন দেখাচ্ছিল। তখন তারও গলার কাছে কী যেন ঠেলে উঠছিল। সে বুঝতে পারছিল না কিছু। তার পালক পিতা তাকে কিছু বলল, যার অর্থ সে বোঝেনি। যে ভাষায় পালক পিতা কথা বলেছিল, সেই ভাষা আগে কখনো

শোনেনি। তবু সে সান্ত্বনা পেল, কারণ পালক পিতা এক হাত তার মাথায় রাখল। সে প্রথম যখন হাতিতে উঠেছিল, তখন ভেবেছিল বুঝি নতুন কোন খেলা। কিন্তু সেই অবগুণ্ঠিতার অমন আছড়ে পড়া দেখে সে অনুভব করল, জীবনে কখনো এখানে ফিরে আসবে না। তখনই গলাটা বুঁজে এল, আর নতুন মানুষটি তার মাথায় হাত রাখলো।

কুঁড়ে ঘরের নারী ও পুরুষ যে তার বাবা মা সেকথা সে জানত। তাই বলে ডাকত। কিন্তু মা বাবা যে খুবই আপন জন এই বোধ তার ওই বয়সের মধ্যে কখনো হয়নি। অথচ হওয়া উচিত ছিল। কুঁড়ের পাশে আমগাছটার কথা এখনো মনে আছে। অন্য পাশে নিম গাছ, যেখানে সন্ধ্যাবেলায় জোনাকি জ্বলত অগুনতি। এমন আবছা আবছা কিছু স্মৃতি তার মনে হয়েছে অনেক আগে। তবে রাস্তার পাশে সেই হেলে-পড়া বট গাছটি এখনো তার মনশ্চক্ষে ভাসে মাঝে মাঝে। অমন বটগাছ আর কখনো তার নজরে পড়েনি। অমন অদ্ভুত ভাবে শুয়ে থাকা বটগাছ।

সঙ্গে হাতি আছে আজও, একটা নয়—অনেকগুলো। বাদশাহকে উপহার দেওয়া হবে। ঘোড়া আছে, মহিষ আছে আরও কত কী। কারতলব খাঁ কখনো হাতির পিঠে বসছে, কখনো ঘোড়া ছোটাচ্ছে কখনো বা বলীবর্দের গাড়ি চাপছে। পথ চলতে হবে অনেকদিন। চলার মধ্যে বৈচিত্র্য না আনলে একঘেঁয়ে লাগে। কিন্তু যে গাড়িটিতে বিপুল অর্ঘ্য রয়েছে সেটিকে রেখেছে ঠিক তার সামনে। চোখের আড়াল যাতে না হয়।

মেদিনীপুর অতিক্রম করার সময় কারতলব খাঁ ভাবে, এই চাকলাকে কেন যে উড়িষ্যার মধ্যে রাখা হয়েছে বোঝা দায়। মুখসুদাবাদ আর জাহাঙ্গীর নগর থেকে এটির সব কিছু দেখাশোনা করা, কত সহজ। যদি কখনো সে বাংলার সুবাদার হয় এটিকে বাংলার ভেতরে নিয়ে আসবে। আর সুবাদার যে সে হবে এই দৃঢ়বিশ্বাস তার আছে।

উড়িষ্যা পার হয়ে যায়। কতবার যে ছোট বড় নদী খেয়ায় পার হতে হলো, তার ইয়ত্তা নেই। এ এক বড় ঝঞ্ঝাট। এর ওপর আবার আছে পাহাড় পর্বতের চড়াই উতরাই। ওসব জায়গায় বলদের গাড়ি নিয়ে বড় অসুবিধায় পড়তে হয়। তবু সবাই চলছে এভাবে চিরকাল।

অবশেষে একদিন দেখা গেল দুই মুঘল ঘোড়সওয়ারকে। বাদশাহের অগ্রগামী চর। তাদের কাছ থেকে বাদশাহ ঠিক কোন দিকে রয়েছেন জেনে নিয়েই সেই দিকে ফিরে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানায় কারতলব খাঁ তারপর সবাইকে নির্দেশ দেয় আরও কাছাকাছি গিয়ে শিবির স্থাপন করে। একদিনের বিশ্রাম নিয়ে ছিমছাম হয়ে নিতে। বাদশাহের সামনে নিজেদের উপস্থাপিত করতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে।

বেগমসাহেবা আসতে চেয়েছিল সঙ্গে। সে আনেনি। ধকল সহ্য করতে পারত

কিনা সন্দেহ। অথচ বেগমসাহেবা সেই কথাই বলেছিল তার সম্বন্ধে। বলেছিল, এই বয়সে কারতলব ধকল সইতে পারবে না। বয়সটা কম হয়নি। অতদূরে একা না যাওয়াই ভাল। সুস্থ অবস্থায় দেওয়ান সাহেবের খাতির খুব। কিন্তু মরণাপন্ন অসুস্থ হয়ে পড়লে ভয়ে কিংবা টাকার লোভে প্রাণ দিয়ে কেউ সেবা করবে না।

বেগমসাহেবা বলেছিল—বাতিল হয়ে গেলেও তোমার সেবা করতে পারব।

—তার মানে? বাতিল কেন? আমাকে কি অন্য কারও প্রতি আসক্ত হতে দেখেছ? শুনেছ কখনো?

বেগমসাহেবা অপ্রস্তুতে পড়েছিল। মুখ ফস্‌কে যেকথা বেরিয়ে পড়েছিল তাকে ঢাকা দিতে এত বেশী আজে বাজে বকতে শুরু করল যে কারতলব খাঁয়ের মজা লেগেছিল।

দুদিন পরে বাদশাহ ঔরঙ্গজেব তাকে ডাকলেন। বিপুল অর্থ আর উপহার সামগ্রী নিয়ে সে বাদশাহ সমীপে উপস্থিত হলো। তাকে দেখে বৃদ্ধ সম্রাটের মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠলো। যা খুবই দুর্লভ। যারা সেখানে ছিল সবার মনে ঈর্ষার সূঁচ ফুটলো। তারা জানে, কারতলব খাঁ বাদশাহের প্রিয় পাত্র। কিন্তু তাই বলে এতই প্রিয় যে তার দর্শনে বাদশাহের মুখ হাসি হাসি হবে? কই তাঁর ছেলেরা কাছে এলে তো অমন হয় না। তাঁর পৌত্র পৌত্রী দৌহিত্র দৌহিত্রী অনেকেই তো তাঁর কাছে আসে, এমন নিশ্চিন্তের হাসি তো কখনো হাসতে দেখা যায় না। অথচ যাকে নিয়ে এত ফিস্‌ফিসানি সে কিন্তু জানে তার ওপর বাদশাহের বিশেষ কোন টান নেই। পৃথিবীর এবং পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া গুটি কয়েক মানুষের প্রতি বাদশাহের ইস্পাত কঠিন হৃদয় কিছুটা উষ্ণতা দেখিয়েছে। সে হলো বিরল দৃষ্টান্ত। কারতলব খাঁ খুবই সাধারণ একজন মানুষ। সুতরাং ওসব কিছু নয়। অসলে বাদশাহ তাকে পছন্দ করেন তার কাজের জন্য। প্রথমত সুদূরে বাংলায় কোন অশান্তি নেই আপাতত। দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো টাকা—শুধু টাকা। বাদশাহের এখন অনেক অর্থের প্রয়োজন। এই দক্ষিণ ভারতে এসে নিজের জেদের বশে যে ভাবে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন আজ বৃদ্ধ না হলে হয়ত তিনি এর থেকে মুক্ত হতে পারতেন কোন না কোন ভাবে। কিন্তু এই বয়সে এখানকার যুদ্ধবিগ্রহ তাঁর শরীর আর মনের ওপর ভীষণভাবে চেপে বসেছে। কবে সেই প্রথম যৌবনে এখানে এসে সফলতা দেখিয়েছিলেন, এখন আর ব্যর্থতাকে সহ্য করতে পারেন না। এখানে থাকা মানেই জলের মত অর্থের অপচয় এবং সেই অর্থ যে যোগাবে তাকে প্রিয়পাত্র না ভেবে উপায় আছে? বলতে গেলে বাংলাই এখন হিন্দুস্থানের শাহানশাহের অর্থভাণ্ডার।

বাদশাহ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে এসে কারতলব খাঁয়ের আনা বিবিধ সামগ্রী দেখলেন। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। কিন্তু অন্য কেউ লক্ষ্য করুক আর না করুক কারতলব খাঁ ঠিক দেখেছে, এত কিছুর মধ্যেও বাদশাহের দৃষ্টি সেই বলীবর্দের

গাড়ির মধ্যকার বিশাল লৌহনির্মিত সিন্দুকের ওপর বারবার গিয়ে পড়ছিল। আরও বেশ কিছু দিনের রসদ রয়েছে ওতে। ওটিতে রয়েছে মুঘল বাদশাহের প্রাণ-ভোমরা।

ভেতরে এসে আসন গ্রহণ করলেন বাদশাহ। নিয়মমাফিক কারতলব খাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। অর্থাৎ তার আনা সবকিছু তিনি গ্রহণ করলেন। তারপর তিনি স্বহস্তে তাকে সম্মানজনক পোষাক দিলেন, নাকাড়া দিলেন। শেষে ঘোষণা করলেন, এবার থেকে কারতলব খাঁকে শুধু বাংলা নয় উড়িষ্যারও দেওয়ান নিযুক্ত করা হলো। তাছাড়া সে আজিমউদ্দিনের সহকারী নাজিম হয়ে বাংলা আর উড়িষ্যার শাসনকার্যও তদারকি করবে।

মনে যাই থাক, উপস্থিত আমীর ওমরাহ এবং উচ্চপদস্থ যোদ্ধবেশধারীরা সহর্ষে কলরব করে উঠলো। বাদশাহ বৃদ্ধ হলে কি হবে। তিনি জানেন ওরা কেউই খুশী হয়নি। ওদের মধ্যে অনেকেই এই পদগুলোর আকাঙ্ক্ষায় বহুদিন ধরে স্বপ্ন দেখে এসেছে। এতগুলো পদ একই ব্যক্তিকে সমর্পণ করায় কেউ যদি বলে যে সে খুশী হয়েছে তাহলে অন্তরের হাহাকারের টুঁটি চেপে ধরেই তাকে বলতে হবে। কারতলব খাঁকে এড়িয়ে ভাঙা বুক নিয়ে বাদশাহের দিকে যখন তারা হাসি হাসি মুখে তাকিয়েছিল, তখন বাদশাহ কারতলব খাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার আসল নামটি যেন কি?

অতি বিনয়ে কারতলব সামনে ঝুঁকে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে—আমার নাম মহম্মদ হাদি জাঁহাপনা।

—হুঁ। তারও আগে নিশ্চয় কোন নাম ছিল। সেই রকমই শুনেছিলাম।

পর্বতের শীর্ষদেশ থেকে যেন তাকে নীচে নিক্ষেপ করা হলো। কারতলব খাঁয়ের কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো। যা সে নিজে ভুলতে না পারলেও সবাইকে ভুলিয়ে দিতে চায়, তাকে বাদশাহ এই পরম লগ্নে এভাবে খুঁচিয়ে দিলেন? কেন? তিনি কি মনে করিয়ে দিতে চান যে যতই সে উঁচুতে উঠুক আসল মুসলমান সে নয়। খাঁটি মুসলমান হলেও আসল মুসলমান নয়।

বাদশাহের এই প্রশ্নের কী উত্তর দেবে সে? এর চাইতে তাকে কোনরকম সম্মান না দেখিয়ে সাধারণভাবে শান্তিতে ফিরে যেতে দিলে বড় ভাল হতো। সে বুঝতে পারছিল, উপস্থিত সবাই তার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করছে তার হাবভাব। তাদের মুখে কৌতুক। কারও কারও মুখে বিদ্রুপের হাসিও ভেসে উঠেছে এতক্ষণে। কী বলবে সে? কী উত্তর দেবে? তাকে নীরব থাকতে দেখে তিনি অধৈর্য হয়ে উঠেছেন হয়তো।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে বলতে চাইছিল, নামটা সঠিক তার মনে নেই। দু'অক্ষরে ছোট্ট নাম, কোন মানে হয় না সেই নামের। অন্তত তার যা মনে আছে। কিংবা মানে হয়ত হয় সেই দেশের ভাষায়। সত্যিই ঠিক ভাবে মনে করতে পারে না নামটা। কেউ তাকে পরে আর সেই নামে ডাকেনি বলে মন থেকে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে

গিয়েছে।

সেই কথাই বাদশাহকে বলার জন্যে মুখ খুলতে গিয়ে দেখে বাদশাহ হাত উঁচিয়ে তাকে কিছু বলতে নিষেধ করছেন।

তিনি বলেন—তোমার অতীত নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই। তোমার বর্তমান আর ভবিষ্যৎ হলো মুঘল সাম্রাজ্যের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তোমার "কারতলব খাঁ" নামটা এবার থেকে এক পাশে সরিয়ে রেখো। তোমার নতুন নাম আজ থেকে হলো নবাব মুর্শিদকুলী মুতিমিন্-অল্-মুল্ক্ অলা্ আদ্দৌলা জাফর খাঁ নাসিরি নাসির জং। সংক্ষেপে তোমার পরিচিতি মুর্শিদকুলী খাঁ বা জাফর খাঁ।

কারতলবের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। আর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মুখ হাঁড়ির কালীর মত হয়ে গেল। তারা মনে করল, বাদশাহ ইচ্ছা করে রসিকতা করছেন। অথচ সবাই জানে তাঁর ভেতরে রস বলতে কিছু নেই।

কারতলব খাঁ নিজেকে মুর্শিদকুলী খাঁ হিসাবে ভাবতে চেষ্টা করে। এবার থেকে সেই নামেই পরিচিত হবে। অনেকে হয়ত জাফর খাঁ বলেও ডাকবে। কিন্তু তার সেই শিশুকালের দু অক্ষরের ছোট্ট নামটা যেন কি? এত বছর পরে সবটুকু একাগ্রতা দিয়েও সেই নাম আর সে মনে করতে পারবে না। সেই নাম হারিয়ে গিয়েছে। সেই গ্রামও হারিয়ে গিয়েছে। আর মলিন কমদামী শাড়ি পরিহিতা রমণী আর গৌরবর্ণ অতিশীর্ণ পুরুষটি নিশ্চিতভাবে পৃথিবী থেকেই এতদিনে মুছে গিয়েছে। তার মত হিসাবে দক্ষ ব্যক্তিও বয়সের হিসাব কষে তাদের দুজনকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।

বাদশাহের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের শিবিরে ফেরে মুর্শিদকুলী খাঁ। নমাজের সময় হয়েছে। বাংলা থেকে আসার পথে সে কোরাণ নকল করতে পারেনি বিশেষ। ইচ্ছে আছে এখানে যেকদিন থাকবে একটু বেশী করে নকল করবে। আর বাদশাহ যেদিন তাকে বিদায় দেবেন, নিজের হাতে তাঁকে একখানি কোরাণ সে দেবে, যা বহুযত্নে দিনের পর দিন নকল করেছে। পাতলা হাতির দাঁতে তৈরী কারুকার্য খচিত মলাট তার। যাবার আগে সেইটি হবে বাদশাহের কাছে শেষ চমক। তিনি আর ভুলতে পারবেন না তাকে। শত চেষ্টাতেও পারবেন না, জীবনের বাকী কয়টি দিনে। কোরাণটি জড়িয়ে এনেছে সে নয়নসুখ কাপড় দিয়ে।

বাদশাহের কাছে আগমন সম্পূর্ণ সফল হলো মুর্শিদকুলী খাঁয়ের। শুধু খেতাব নয় সে প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ফিরল। পাটনায় আজিমউদ্দিন কদিন পরে যখন এসব শুনবে, তখন তার ভেতরটা তিক্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু দূর থেকে কোন ষড়যন্ত্র করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। গুপ্তঘাতক পাঠিয়েও বিশেষ সুবিধা করতে পারবে বলে মনে হয় না। তবু কোন কিছুকে ছোট করে দেখে না মুর্শিদকুলী। সে জানে, তাকে ব্যতিব্যস্ত করা কিংবা বিপদে ফেলার চেষ্টা করতে পারে 'আজিম'। সুতরাং

সাবধানে থাকতে হবে।

ফেরার দিনে বাদশাহের হাতে যখন সে কোরাণ তুলে দিল এবং বাদশাহ প্রথমে নয়ন সুখ কাপড়টি আস্তে আস্তে খুলে ফেললেন, যখন হাতির দাঁতের সুদৃশ্য মলাট বের হলো এবং শেষ পর্যন্ত অতি যত্নে লেখা কোরাণের অক্ষরগুলো ভেসে উঠলো, তখন শুধু বাদশাহ নন সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ঔরঙ্গজেবের মুখ দিয়ে অস্ফুট উচ্চারিত হলো—তুমি এক অসাধারণ ব্যক্তি। আমি জানতাম সেকথা। প্রথম দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। তুমি একা যত দিক কৃতিত্বের সঙ্গে সামলাও আমি হলেও পারতাম না।

মুর্শিদকুলী খাঁ জানে বাদশাহের সঙ্গে তার জীবনে আর দেখা হবে না। বাদশাহ শীর্ণ হয়ে পড়েছেন, সামনে ঝুঁকে পড়েছেন,—বাঁচারও একটা সীমা আছে মানুষের। এবারে কে বসবে ওই মসনদে? মুর্শিদ একটুও ভাবার চেষ্টা করে না। সে জানে, কাউকে ওই আসনে বসতে সে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবে না। বিরোধিতাও করবে না কাউকে। যে বসবে তার কাছে বাংলার রসদের স্রোত অব্যাহতভাবে পেঁছে যাবে। উপঢৌকনও যাবে। সে রাজনীতিক নয়, সে তখ্ত তাউসের বিশ্বস্ত কর্মচারী মাত্র। সে নিমকহারাম নয়। তার উচ্চাভিলাষ মুর্খের উচ্চাভিলাষের মত আকাশ ছোঁয়া নয়।

ফেরার পথে সেই একই নদী পাহাড় পর্বত একই খেয়া ঘাট, অরণ্য ঝোপ জঙ্গল—এমনকি নদীতে যারা মাছ ধরেছে, জমিতে যারা চাষ করছে তাদেরও মনে হলো একই মানুষ, যাদের যাবার পথে দেখেছিল। যাত্রা পথে লোকালয়ের ভেতর দিয়ে যাবার সময় হাটে বাটে তেমনি কৌতূহলী মানুষ, যারা জানতে চায় অথচ কাছে আসতে চায় না। ঢেঁকীশালে রমণীরা স্বন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। হাতি দেখে আতঙ্কিত হয় পথি-পার্শ্বের কদলীবৃক্ষের মালিকেরা। তবে ফেরার পথে হাতির সংখ্যা অতি নগণ্য। মাত্র দুটি। যাবার পথে ছিল হস্তীযূথ। অনেকের ক্ষতি হয়েছিল। হাতিরা নিজেরা যতটা না উদ্যোগী ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল তাদের মাহুতরা।

মেদিনীপুর এলো। রূপনারায়ণ পার হয়েই মুর্শিদকুলী খাঁ দুজন অশ্বারোহীকে পাঠালো মুখসুদাবাদের পথে—তারা ওখানে গিয়ে ঘোষণা করবে মুখসুদাবাদের নাম এবার থেকে হবে মুর্শিদাবাদ—মুর্শিদকুলী খাঁয়ের নামে নাম। অশ্বারোহী ছুটলো লিখিত আদেশ কোমরে গুঁজে। মুর্শিদকুলী খাঁর মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। দামামা বাজিয়ে গ্রামে গঞ্জে সব জায়গাতেই ঘোষণা করা হবে। নগরীতে আগে হবে। বেগমসাহেবার কানে গিয়ে পেঁছোলে প্রথমে বুঝতেই পারবে না মুর্শিদাবাদ কেন হলো। তখন ঘোষণার মর্মার্থ শুনে সবটা বুঝবে। ঘোষণায় লিখে দেওয়া আছে যে বাংলার দেওয়ান সাহেব কারতলব খাঁ এখন শুধু বাংলার নয় তার সঙ্গে উড়িষ্যারও দেওয়ান এবং সেই সঙ্গে এই দুই সুবার সহকারী সুবাদার। বাদশাহ ঔরঙ্গজেব তাঁকে সম্মানজনক খিলাতের সঙ্গে সঙ্গে নতুন উপাধি দিয়েছেন।

মুর্শিদকুলী খাঁ। সেই নামেই এই নগরীর নামকরণ আজ থেকে হলো মুর্শিদাবাদ। ড্রিম ড্রিম···দ্রাম দ্রাম। অতি বাস্তব মুর্শিদকুলী খাঁও যেন স্বপ্নের ঘোরে ভেরীর বাদ্য শুনে ফেলে আচমকা। তারপর লজ্জিত হয়ে হাতির হাওদার ওপর সোজা হয়ে বসে। ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি?

পাহাড় পর্বত পেরিয়ে বাংলার এই সবুজ সমতলের শোভা বেশ লাগে মুর্শিদকুলী খাঁর কাছে। যেন অনেক পরিশ্রমের পরে বিশ্রাম—অনেক রৌদ্রের পর, বৃষ্টি। দেখলে বোঝা মুশকিল বাণিজ্যের ব্যাপারে এই দেশ রত্নগর্ভা। ফিরিঙ্গিরা কি সাধে এখানে এসে ভীড় করেছে? কেন তারা যায়নি দিল্লীতে? কেন যায় নি রাজস্থানে? ও সব জায়গায় বাণিজ্যের রস নেই।

মুর্শিদাবাদে মুর্শিদকুলী খাঁ কবে পৌঁছাবে? আরও অন্তত তিন দিন লাগবে কম করে। ফেরার পর নিরালায় বেগমসাহেবার সঙ্গে দেখা হলে গায়ে হাত বুলিয়ে বলবে রোগা হয়ে গিয়েছে সে। অথচ তার ভেতরে কতটা শক্তি টগ্‌বগ্‌ করছে বেগমসাহেবা খোঁজ রাখে না। যদি সে পরপর তিনদিন কখনো চুপচাপ বসে থাকত তাহলে তার সেই আরব দেশী পাট্‌কেলে রঙের ঘোড়াটার মত বাত ধরে যেত সর্বাঙ্গে। তার নমাজ, তার দীর্ঘ রোজা, তার ব্যস্ততা তাকে সক্ষম সচল রেখেছে।

একটি প্রকাণ্ড প্রান্তর অতিক্রম করে ছোট্ট এক গ্রামে প্রবেশের পথে মুর্শিদকুলী খাঁ চমকে ওঠে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পথের ধারের একটি হেলানো বটগাছের দিকে। এই গাছকে সে দেখেছে বহু বহু বছর আগে একেবারে শৈশবে। হ্যাঁ, সেই গাছ। এমন গাছ পথের ধারে দুটি থাকা কি সম্ভব? বোধহয় না। হয়ত গাছটির শাখা প্রশাখার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু কাণ্ডের ওই শোয়ানো ভঙ্গী পৃথিবীর দুটি গাছের হতে পারে না। বুকের ভেতর ধুক ধুক করে ওঠে মুর্শিদের। অথচ এমন কখনো হয় না তার। শুধু একবার এমন হয়েছিল। তখন তার নতুন যৌবন। পিতা সুফী ইস্পাহানী পারস্য থেকে ফিরে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন বাদশাহের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে। সেদিন বাদশাহ কোন অট্টালিকায় ছিলেন না। কঙ্করময় এক পার্বত্য অঞ্চলে শিবির স্থাপন করেছিলেন। সেদিন ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। অথচ বাদশাহের শিবিরে প্রবেশের সময় সে ঘেমে উঠেছিল। জানত, এই প্রথম সাক্ষাৎ আসল সাক্ষাৎ। বাদশাহের নাকি অসাধারণ মানুষ চেনার ক্ষমতা। তাই ঘামের সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভেতর ধুক্‌ ধুক্‌ করছিল। সেই ধুকধুকানি কমাবার জন্যে একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে। ইস্পাহানীও তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে উঠেছিলেন 'কি হলো?" তাকিয়ে বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন তার মানসিক অবস্থা। অপেক্ষা করেছিলেন। সেদিন বমি বমি ভাবও ছিল। ভাবলে নিজেরই সংকোচ লাগে বাদশাহের সঙ্গে দেখা করে ফেরার পথে সত্যিই বমি করে ফেলেছিল। একটা বড় পাথরের আড়ালে।

আজ তো প্রথম সাক্ষাৎকার নয়। আজ কোন বাদশাহের সমীপে উপস্থিত হতে

যাচ্ছে না সে। তবু ওই বটগাছ দেখার পর থেকে এমন হচ্ছে। সেই পুরুষ সেই রমণীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সে জানে তারা নেই। যদি এই গ্রামই সেই গ্রাম হয়, তবু তারা নেই। থাকতে পারে না। তবু যেন এক বিরাট পরীক্ষা দিতে এসেছে সে। হাতি থেকে নেমে পড়ে। দেওয়ান সাহেবকে এই অখ্যাত জায়গায় নামতে দেখে দলবল থেমে পড়ে। তারা একটু বিস্মিত হয়। কারণ গত রাতে তারা মাত্র দেড় ক্রোশ দূরে তাঁবু খাটিয়েছিল। তারা অপেক্ষা করে। মুর্শিদকুলী ভাবে, গাছটিকে দেখে যখন খট্‌কা লেগেছে সবটা দেখতে হবে। তবে লাভ হবে না। কার পরিচয় সে জিজ্ঞাসা করবে গ্রামের মধ্যে? কী নাম ছিল সেই শীর্ণ গৌরবর্ণ পুরুষটির? তবু সেই কুঁড়ে ঘর যদি দেখতে পাওয়া যায়। বিমর্ষ হাসি হাসে মুর্শিদকুলী খাঁ। কত অট্টালিকা এতদিনে জীর্ণ হয়ে যায়, আর সামান্য একটা কুঁড়ে ঘরকে খুঁজে বের করা পাগলামি বৈকি। কিন্তু একপাশে সেই আমগাছ আর অন্য পাশে নিমগাছ? তেমন দুটো গাছ তো থাকতে পারে। হ্যাঁ পারে। কিন্তু তাতে কি? থাকলেই বা কি লাভ হবে তার?

কিন্তু মন মানে না। সবাইকে একটু অপেক্ষা করতে বলে সে একাই এগোয়। কিন্তু দেহরক্ষী ছাড়তে চায় না। সে বলে—আপনাকে একা যেতে দেব না।

মুর্শিদকুলী খাঁ একটু দাঁড়ায়। বলে—সঙ্গে সঙ্গে না এসে দূরে দূরে থেকো। নইলে গ্রামের লোকেরা ভয় পাবে।

---ওরা জেনে গিয়েছে, কে এসেছে।

মুর্শিদকুলী খাঁর ঠাণ্ডা মেজাজও গরম হয়ে ওঠে। বলে-কি করে জানল?

—কাল রাতে আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানে এদিককার দুজন মানুষ গিয়েছিল। শুনে এসেছে।

—তুমি কি করে জানলে?

—ওরা যখন গল্প করছিল তখন শুনেছি।

মুর্শিদকুলী খাঁ বুঝলো, তার কথা গ্রামবাসীদের না জানাই অস্বভাবিক হতো। রাস্তাঘাটে কত গ্রামের লোক যাতায়াত করে। উঁচু দরের মানুষ সেই পথ দিয়ে গেলে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। দেহরক্ষীকে নিয়েই সে গ্রামের ভেতরে ঢোকে।

স্তব্ধ গ্রাম। লোক জন দেখা যায় না। বোধ হয় ভয় পেয়েছে। দুপুর হতে অনেক বাকী। এখন কর্মব্যস্ত থাকে সবাই।

সে একটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। চারদিকে মাটির দেওয়াল। একটা কাঠের পাতলা দরজা আছে। তাই দিয়ে আঙিনায় ঢুকতে হয়। বাইরে মাটির দেওয়ালে আলপনা আঁকা—লতাপাতা আর ফুলের মধ্যে পাখি বসে আছে। বোঝা যায় বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। সাধারণত কোন বাড়িতেই প্রাচীর থাকে না—অনেকে নানান্ রকম গাছ লাগিয়ে বাড়ির ভেতরটা একটু আড়াল করে রাখার চেষ্টা করে। বাকী মানুষের ভেতর বাইরে সব এক।

এই বাড়িটায় মানুষকে পেলে বেশ হতো। কিন্তু অন্দরে ঢোকা যায় না। পথে ঘাটে কেউ নেই। একজন বৃদ্ধের কাশি শোনা গেল ভেতর থেকে।

দেহরক্ষী চেঁচিয়ে ডাকে। অনেকক্ষণ সারা শব্দ নেই। তার পরে বৃদ্ধ বেরিয়ে এলো। সে জানত কে এসেছে। বাইরে না এসে উপায় নেই।

সে সামনে ঝুঁকে পড়ে দুহাত জোড় করে নমস্কার জানায়। মুর্শিদকুলী খাঁর আফশোষ হয়। বৃদ্ধের যা বয়স, এ গ্রাম যদি সেই গ্রাম হতো তাহলে এ হয়ত সেই উপবীতধারী পুরুষের কথা জানতে পারত। কিন্তু কি করে? তার নাম তো জানা নেই। মুর্শিদকুলী খাঁ বুঝতে পারে দেহরক্ষী দেওয়ান সাহেবের হাবভাবে রীতিমত অবাক হয়েছে।

বৃদ্ধ বিনীতভাবে বলে—আমাকে আপনার কী আদেশ দেওয়ান সাহেব।

আশ্চর্য! জেনে ফেলেছে।

মুর্শিদ বলে—আপনার ছেলেরা কেউ নেই?

একটু দ্বিধাভরে বৃদ্ধ বলে—তিন ছেলে বাইরে কাজে গিয়েছে। এক ছেলে আছে। তাকে আমিই লুকিয়ে থাকতে বলেছিলাম। কী জানি, কি হয়।

—ভয় নেই। আচ্ছা, এ গ্রামে কোন বাড়িতে আম আর নিম দুটো গাছই আছে?

—অনেক বাড়িতে আছে। আমার বাড়িতেও আছে।

—অনেক দিনের?

—না, নিমগাছটা নতুন লাগিয়েছি।

—আমি বলছি অন্তত যাট পঁয়ষট্টি বছরের পুরোনো হবে গাছ দুটো।

বৃদ্ধের দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটে ওঠে। সে বলে—হ্যাঁ, ভূপতিদের বাড়ির গাছদুটো অনেক দিনের।

—আপনার ছেলেকে একটু ডেকে দিন, বাড়িটা দেখিয়ে দেবে।

বৃদ্ধের কাছে সবটাই স্বপ্নের মত মনে হয়। তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুবে বাংলার দেওয়ান সাহেব—যাঁর নাম শুনলে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। অথচ তাঁকে ডেকে ভেতরে নিয়ে বসাবার স্পর্ধা তার নেই। তাছাড়া ভেতরে বসালে ঘরের কোন্ কোন্ সামগ্রী ফেলে দিতে হবে কে জানে। গিন্নি হয়ত সবই ফেলে ধুয়ে একাকার করবে। বড় অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল বৃদ্ধের। সেই সময় দেওয়ান সাহেব হুকুম শুনে নিষ্কৃতি পায়।

গলায় খাঁকারি দিয়ে ডাকে—ভবানন্দ, ও ভবানন্দ শিগ্গির আয়।

কালো বেঁটে মত এক যুবক ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে।

বৃদ্ধ বলে—দেওয়ান সাহেবকে ভূপতিদের বাড়িটা দেখিয়ে দিবি। ওঁর কোন অসুবিধা না হয়। সব সময় সঙ্গে সঙ্গে থাকবি। জল পিপাসা পেলে গাছের ডাব পেড়ে দিবি।

বৃদ্ধের প্রতিটি কথায় ভবানন্দ মাথাটাকে একবার ডাইনে সবটা হেলিয়ে দেয়

একবার বাঁয়ে সবটা হেলায়। তার ধারণা যতটা হেলানো যাবে ততই দেওয়ান সাহেবকে যত্ন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে।

ভবানন্দকে দেখে গাঁয়ের অন্যান্য বাড়ি ঘর থেকে একজন দুজন করে মানুষ বের হয়ে পড়ে। সবাই নিজেদের অন্দরের দিকে তাকিয়ে বুক উঁচু করে চলতে থাকে। দেওয়ান সাহেবের সঙ্গে কয়জন যেতে পারে? অন্দরবাসিনীদের মনও স্বামী গর্বে ভরে ওঠে।

একটি বাড়ির সামনে এসে ভবানন্দ দাঁড়ায়। মুর্শিদকুলী একটু হতাশ হয়। বাড়িটির চারদিকে বাঁশের বাখারি আর রাংচিতার বেড়া। তাঁর স্মৃতিতে এ ধরণের কোন বেড়া ছিল না। কোন আরু ছিল না বাড়িটায়। সে হাতির পিঠে চেপে দূরে থেকে কুটিরের সামনে রমণীকে আছড়ে পড়তে দেখেছিল স্বামীর পায়ের কাছে।

ভবানন্দ ছুটে গিয়ে একজনকে ডেকে আনে। লোকটি তারাহুড়োয় একটা ফতুয়া গায়ে গলাতে গলাতে এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে মুর্শিদকুলী খাঁর সামনে।

মুর্শিদকুলী প্রশ্ন করে—আপনার বাড়িতে পুরোণো আম আর নিম গাছ আছে?

লোকটি ফারসি ভাষায় জবাব দেয়—আছে।

—আপনি ফারসী জানেন দেখছি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি আর আমার ভাই কিশোর দুজনেই ফারসী ভাল করে শিখেছি।

—আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে ভেতরে গিয়ে গাছ দুটো দেখতে পারি?

—আপত্তি? আমার পরম সৌভাগ্য। একটু সময় দেবেন হুজুর?

—হ্যাঁ। অপেক্ষা করছি।

ভূপতি ছুটে ভেতরে গিয়ে নিজের স্ত্রী এবং ভ্রাতৃবধূকে বলে রান্নাঘরের ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে থাকতে। বলা যায় না যদি কোন রকমে তাদের দেখতে পেয়ে যায়। তাদের দুজনার স্ত্রীই রূপসী।

বাইরে এসে বলে—এবারে আসতে আজ্ঞা হোক দেওয়ান সাহেবের।

মুর্শিদকুলী খাঁ ভেতরে যায়। তাকিয়ে দেখে সেই জীর্ণ কুটির নেই। তবে একটা কুটির আছে আর তার দুপাশে দুই গাছ, অনেক বড়। তবু চেনা যায়। বিশেষ করে আম গাছের ওই শ্বেতবর্ণের বল্কল। আমগাছের বাকল সাধারণত অমন হয় না। মনে আছে কাঁচা আম পেড়ে সেই পুরুষ ছুরি দিয়ে কেটে কেটে তাকে দিত। একটুও টক লাগতো না।

—এই আম কি কাঁচাবেলায় টক লাগে না?

—না হুজুর। এটা কাঁচা মিঠে আম। আপনি এত ভাল আম গাছ চেনেন।

বাংলা আর উড়িষ্যার দেওয়ান বাহাদুর, দুই সুবার সহ-সুবাদার গভীর শ্বাস গ্রহণ করে। সে বলে—আপনাদের তো মোটামুটি ভালই চলে দেখছি।

—আপনার আর ঈশ্বরের কৃপায় মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হয় না। ফারসী ভাষা জানি বলে দলিল-দস্তাবেজ লিখে কিছু হয়। তাছাড়া যজমানিও আছে?

—সেটা কি?

ভূপতি 'যজমানের' ফারসী শব্দ জানে না। আভাসে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বুঝিয়ে দেয়।

—বুঝেছি। অবস্থা তাহলে বরাবরই ভাল?

ইতিমধ্যে ভূপতির ভাই কিশোর এসে দাঁড়ায়। সে হাঁপাচ্ছিল। কার কাছে খবর পেয়েছে দেওয়ান সাহেব তার বাড়িতে গিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রী স্বর্ণলতার কথা মনে পড়েছে। সর্বনাশ হয়ে গেল বুঝি। এসে সব দেখে শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

ভূপতি বলে—আজ্ঞে, আমরা খেতে পেতাম না। আমার বাবা সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু পয়সা ছিল না। আমরা জন্মানোর অনেক আগে আমাদের দাদাকে তিনি একজন খানদানী মুসলমানের কাছে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। সেই পয়সা তাঁর কাজে লাগে। কিন্তু সারাজীবন ম্রিয়মান ছিলেন। সবার শ্রদ্ধা হারিয়ে বসেছিলেন।

মুর্শিদকুলী খাঁর যেন শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। নিম গাছের পাতা ঝিরঝিরে হাওয়ায় নাচছিল। ওই হাওয়ায় ছেলেবেলায় সে প্রশ্বাস নিয়েছে। এই মাটির ওপর খেলা করেছে।

কোনরকমে বলে—আপনারা দুই ভাই যথাসম্ভব শিগ্গির আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

ওরা যেন হতচকিত হয়ে পড়ে। কোন অপরাধ করেনি তো? হঠাৎ দেখা করতে বলেন কেন দেওয়ান সাহেব?

—কোথায় দেখা করব হুজুর?

—মুখ্সুদাবাদ, যার নাম এখন মুর্শিদাবাদ।

—আমাদের কোন অপরাধ হয়নি তো হুজুর?

—কোন অপরাধ হয়নি। আপনারা ওখানে ভাল কাজ পাবেন। পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আপনাদের মত অনেক হিন্দু পরিবার ওখানে আছে। গিয়ে সোজা আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আপনাদের নাম বললেই আমি বুঝতে পারব।

মুর্শিদকুলী খাঁ আবার গাছ দুটোর দিকে তাকায়। আগের কুড়ে ঘরের অস্তিত্ব নেই। সেই পুরুষ আর রমণীও নেই। তবে তাদের দুই পুত্রসন্তান আছে।

দেহরক্ষী কিছুতেই তার মালিকের এই অদ্ভুত আচরণের মর্মোদ্ধার করতে পারল না। গ্রামবাসীদের কেউই পারল না। তারা শুধু দেখল তাদেরই ঘনিষ্ঠ দুইজন হঠাৎ যেন রাতারাতি নবাব হয়ে গেল।

বাইরে তখন প্রবল ঝড় বৃষ্টি। কদিন ধরে বৃষ্টির বিরাম নেই। বয়স্ক ব্যক্তিরা বলাবলি করছে, তাদের খুব শৈশবে এমন বৃষ্টি একবার হয়েছিল। সেবারও গঙ্গা নদী পদ্মার মত ফুলে ফুলে উঠেছিল। সর্বক্ষণ নদী বক্ষ থেকে আওয়াজ আসছিল ড্রং-ড্রং-ডডং। সেই সঙ্গে শোঁ শোঁ আওয়াজ। পদ্মার মত গঙ্গার পাড় ভেঙে পড়েছিল সেবার। এবারও ভেঙেছে উত্তরের দিকে। আরও কত ভাঙবে কে জানে।

রাত বেশী না হলেও রাস্তাঘাটে জনমানিষ্যি নেই। কী করে থাকবে? অট্টালিকা ছাড়া কোন বাড়িই নিরাপদ নয়। গাঁয়ের অনেক বাড়ি ধসে গিয়েছে। বড় বড় গাছ উপড়ে পড়েছে অনেক বাড়ির ওপর। চাপা পড়ে মরে যাওয়ার খবরও পাওয়া গিয়েছে। কে ওসবে গুরুত্ব দেয়? ঝড় থামলে, দিনের বেলা রোদ উঠলে সবাই ছুটবে ওসব দেখতে। তখন মৃতদেহ আর ধ্বংসলীলা দেখে সহানুভূতি জাগাবে মনে। অন্যের বুক ফাটা কান্না দেখে চোখে জলও আসবে। সেই সঙ্গে মনে হবে ভগবানের অশেষ কৃপা আঘাতটা তাদের ওপর দিয়ে যায়নি। কেউ ভাববে ত্রিসন্ধ্যা করার ফল নিশ্চয়। কেউ ভাববে, ফি বছর জোড়া-পাঁঠা বলি দেবার ফল কি আর নেই? কেউ ভাববে ধর্মীয় সব অনুশাসন সে অক্ষরে অক্ষরে পালনের চেষ্টা করে, সুতরাং আল্লার রহমত তার ওপর বিশেষ ভাবেই রইবে এ তো জানা কথা।

সেই ঝড় জলের রাতে এক তরুণ নগরীর রাস্তায় রাস্তায় আশ্রয়ের খোঁজে ঘুরে বেড়ায় কাক-ভেজা হয়ে। সে হাঁটা পথে এসেছে পুঁটিয়া থেকে। সেখানকার রাজা দর্পনারায়ণ ঠাকুর তাকে পাঠিয়েছে দেওয়ান সাহেবের কাছে। দর্পনারায়ণ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশীয় জমিদার। এই তরুণটিকে পাঠাবার উদ্দেশ্য তার হয়ে এখানে কাজ করবে আর সেই সঙ্গে মুর্শিদকুলী খাঁ যদি তাকে অন্য কোন কাজে লাগায়। তরুণটি তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী এবং তার ভবিষ্যৎ যে উজ্বল একথা পুঁটিয়ার দর্পনারায়ণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। সে তরুণটিকে বলে দিয়েছে, আর এক দর্পনারায়ণ রয়েছে মুর্শিদাবাদে—কানুনগো সে। খুব প্রভাবশালী।

তরুণটি দুদিন আগে গঙ্গা পার হয়েছে। তখন ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। নদীও উত্তাল হয়নি। দূরে গ্রামের একজনের অতিথি হয়ে ছিল। ভেবেছিল বৃষ্টির মধ্যে গিয়ে দেওয়ান সাহেবকে দর্পনারায়ণের পত্র না দিয়ে দুদিন সবুর করে রোদ উঠলে দিলেই হবে। কিন্তু রোদ আর উঠলো না। বরং দুর্যোগ বেড়ে গেল—গঙ্গা উত্তাল হয়ে উঠলো। এখন তো রেগে গোঁ গোঁ করছে। তাই মরিয়া হয়ে চলে এসে এখন বিপদে পড়েছে।

তরুণটির নাম রঘুনন্দন। সেও বারেন্দ্র বংশীয় ব্রাহ্মণ। সে ভাবে, তার ভাগ্যান্বেষণে আসার ওপর ঈশ্বরের অভিশাপ নেই তো? নাকি, ঈশ্বর তার ধৈর্য

আর কষ্ট-সহিষ্ণুতার পরীক্ষা নিচ্ছেন ? দাঁতে দাঁতে ঠক্‌ঠক্‌ করে লেগে যাচ্ছে। তারই মধ্যে হেসে ফেলে রঘুনন্দন। ভগবান তাকে তৈরী করেও শেষে চিনতে ভুল করলেন নাকি ? এ বান্দা ননীর পুতুল নয় গো ঈশ্বর! তুমি কি দেখছ কতটা শক্ত হয়েছি ?

টিম্‌টিম্‌ করে আলো জ্বলছিল একটা ঘরের ভেতরে। দেখলে মনে হয় সরাইখানা। সজোরে ধাক্কা দিতে থাকে রঘুনন্দন। কিছুক্ষণ পরে একজন দরজা খুলতেই সে ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ে। লোকটার হাতের বাতি হাওয়া লেগে দপ্‌ করে নিভে যায়। ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার।

—কে ? কে তুমি। মগের মুলুক নাকি। এভাবে ঢুকলে যে ?

—রাগ করবেন না ভাই। আর একটু বাইরে থাকলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতাম। আমি আশ্রয় খুঁজছি। মনে হলো এটা সরাইখানা—

—তাই বলে আলো নিভিয়ে দেবে ? তুমি দস্যু কিনা ঠিক আছে ?

—দস্যু হলে এতক্ষণে গলা টিপে ধরতাম। এই রাতের মত একটু জায়গা দিন দয়া করে। এটা সরাইখানা নয় তাহলে ?

—হ্যাঁ, সরাইখানা। দুর্যোগ বলে বন্ধ রেখেছি।

—একটু থাকার জায়গা, একটু খাওয়ার ব্যবস্থা হবে না ?

—হবে। কড়ি ফেললেই হবে।

—ফেলব কড়ি। কী হবে ?

—আমি যা খাবো তাই হবে। গরম ভাত আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল। সব চেয়ে যা সস্তা।

—তোফা। সস্তাই ভালো। তা ভাই, আপনি কোন্‌ জাত ?

—কেন ? সরাইখানায় খাবেন আবার জাত ধম্মো তুলছেন কেন ?

—না, আমি সৎ ব্রাহ্মণ কিনা। অন্তত জল চলে এমন জাত না হলে মনটা খুঁতখুঁত করবে।

—তোমার চেহারাই ভাল করে দেখতে পেলাম না এ পর্যন্ত। দাঁড়াও আলো জ্বালি।

—কিন্তু জাতটা বললেন না তো ?

—হাঁটু অবধি পৈতে—সামবেদ। গায়ত্রী জপ করে দেব ?

—না না থাক্‌। পেন্নাম হই। পা টা কোথায় আপনার ?

—দরকার নেই।

রঘুনন্দন যখন সরাইখানার মালিকের দেওয়া একটা শুকনো গামছা পরে খালি গায়ে রেড়ির তেলের প্রদীপের আলোয় পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে ঝোল ভাত খাচ্ছিল তখন, ঠিক সেই সময়, মুর্শিদকুলী খাঁর প্রাসাদের এক প্রকোষ্ঠে আর এক দৃশ্য দেখা গেল।

জিন্নৎউন্নেসার ঘুম আসছিল না। এপাশ ওপাশ করছিল। পুত্র আসাদ এবং কন্যা নাফিসা নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে এতক্ষণ হয়ত নিদ্রিত। পুত্রের কাছে রহিম নামে এক খোজাকে রেখেছে দেখ্‌ভাল করার জন্যে। হাসান-বিবির সঙ্গে যে কাণ্ড করেছিল, এই মুর্শিদাবাদে এসে সেই গালে টোল খাওয়া বাঁদীটার সঙ্গেও সেই কাণ্ড বাধিয়ে বসল। ছি ছি এবারে দেখল নাফিসা। দেখে এসে কেঁদে কেটে অস্থির। বাঁদীটাকে বাঁচানো গেল না, বাঁচাবার ইচ্ছেও হয়নি আর। সব মরুক, উচ্ছন্নে যাক্। তাই মুর্শীদকুলীর কানে তোলা হলো কথাটা। সঙ্গে সঙ্গে দৌহিত্রকে ডাকল মুর্শিদ। আর তখনই প্রমাণ হলো, কী কাপুরুষ তার নিজের গর্ভের সন্তান। সুজার রক্ত থেকে শুধু চরিত্রহীনতাটুকুই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। তার বলিষ্ঠতা পায়নি। স্রেফ বাঁদীটার ওপর দোষ চাপিয়ে দিল। বলল, দিনের পর দিন নাকি তাকে লোভ দেখাত মেয়েটা। ছি ছি। এই হলো তার পুত্র সন্তান। তখন থেকেই খোজা রহিমকে বলা হলো, নজর রাখার জন্যে। পিতার মুখখানার দিকে চাইতে পারছিল না জিন্নৎ। থমথমে, বুঝি ঝড়ের পূর্বলক্ষণ। কিন্তু তা নয়। কিছু বলল না দৌহিত্রকে। শুধু বলল, সাদি দিতে হবে আসাদের। আসাদ কোথায় লজ্জা পাবে, তা নয় সাদির কথা শুনে মুখে হাসি ফুটলো।

বাইরে তুমুল বৃষ্টি। ঝড়ের বেগ যথেষ্ট। জিন্নৎউন্নিসা এপাশ ওপাশ করছে। ভাবছে, তার নিজেরও তো একটা চাহিদা আছে। এ একাকীত্ব আর কতদিন সইবে? যৌবন যেতে এখনো অনেক বছর বাকী। অল্প বয়সে মা হয়েছে বলে বুড়ি হয়ে যায়নি। সুজার স্বভাবের কথা যেদিন প্রথম জানতে পারল সেদিন ছাদে উঠে গিয়েছিল, লাফিয়ে পড়বে বলে। কেন যে নাফিসা সেদিন কাঁদতে কাঁদতে ওপরে উঠে আসছিল। নাফিসা তখন দুই বছরের শিশু। সেদিন নিজেকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল তার জীবনে। সেই সময়ে বাঁদীরা কেউ কাছে পিঠে ছিল না। নাফিসা শুধু ছিল তার কাছে। খবরটা শোনার পর থেকে তার ভেতরটা অস্থির হয়ে উঠেছিল। কী করবে বুঝতে পারছিল না। তারপর হঠাৎ মনে হলো, কে যেন কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে বলছে—অত কষ্ট পাচ্ছিস কেন? সোজা পথ আছে। ছাদে উঠে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়। সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে সে শয্যা ছেড়ে উঠে পড়েছিল। নাফিসা যে তার বাহুর ওপর মাথা রেখে শুয়ে ছিল একটুও মনে ছিল না। কারও কথাই মনে ছিল না। শুধু মনে হলো কে যেন খুব মিষ্টি স্বরে ডাকছে—আয়, আয়।

নাফিসা সেদিন মরতে দেয়নি। দেয়নি বলেই জ্বালার নিবৃত্তি হয়নি। এই জ্বালা কি শুধু মনের? না, সেকথা বললে মিথ্যে বলা হবে। দেহেরও জ্বালা রয়েছে যথেষ্ট। দিনের পর দিন বিনিদ্র রজনী কেটে যায়। সুজা তখন নিশ্চয় অন্য কোন রমণীর দেহ নিষ্পেষিত করেছে। সুজা আর কিছু চায় না,—সৌন্দর্য নয়, শালীনতা বোধ নয়, রুচি নয়—শুধু যৌবন, জংলী যৌবন।

উঃ, আর কতদিন। পিতা আবার আজই বলেছে, সুজাকে উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার করে পাঠাবে। কিন্তু যাকে এতবড় একটা সম্মানজনক পদ দেওয়া হলো, সে বেপাত্তা। কোথায় পড়ে থাকে কে জানে। মাঝে মাঝে যখন এসে উদয় হয় তখন মুখে এত মিষ্টি হাসি মাখিয়ে রাখে যেন সরল শিশু। পিতার মত ধুরন্ধর মানুষও ধোঁকায় পড়ে যায়। আসলে দিল্‌টা তো ওর ছোট নয়। বিরাট বড়। তাই সামনে এসে দাঁড়ালে কিছু বলা যায় না। নারী হওয়া যে কী জ্বালা। ও উড়িষ্যায় গেলে ওর সঙ্গে যেতেই হবে। তখন ও হবে নিজেই নিজের কর্তা আরও লাগাম-ছাড়া হয়ে উঠবে। পরিণতি যে কী হবে জানা নেই।

কে যেন ঘরে ঢুকল? কে? কোন বাঁদী? না কারও ভেতরে আসার হুকুম নেই। তবে কি নাফিসা? বাতিটা ইচ্ছে করে নিভিয়ে দিয়েছে। আজকাল আর বাতি জ্বালিয়ে রাখতে ভাল লাগেনা। কে এলো? দরজাটা বন্ধ করে দিল মনে হচ্ছে?

সভয়ে বলে ওঠে—কে?

মানুষটি ছুটে এসে শয্যায় শুয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে—ভয় পেয়েছ?

জিন্নৎ অসার হয়ে যায়। মানুষটাকে যে কী ভালবাসত। তার হাতের স্পর্শে ছিল বেহেস্তের সুখ। আজও কি খারাপ লাগে? কিন্তু যখন মনে হয় ওই হাত দুটি দিয়ে কত নারীকে সোহাগ করেছে, কত কি করেছে তখন গায়ের মধ্যে ঘিন্‌ঘিন করে ওঠে। মানুষটার স্বাদ কত নারী যে গ্রহণ করেছে কে জানে।

জিন্নৎ সুজার হাত দুটো সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার ভেতরটা বড় দুর্বল। বাইরে দুর্যোগ, একা একা ছট্‌ফট্‌ করছিল। খালি খালি লাগছিল। মনে মনে তো এই চেয়েছিল।

তবু বলে—সরে যাও।

—না।

—আমার ভাল লাগছে না।

—না লাগুক।

—সব তাতেই গায়ের জোর নাকি?

—নিশ্চয়।

মহা মুশকিল তো। মানুষটা যা তা।

—আজ বুঝি বাইরে যেতে পারলে না। ওদের সব কপাট বন্ধ বুঝি?

—কাদের?

—যাদের কাছে যাও।

সুজা জিন্নৎকে আরও জড়িয়ে ধরে। ধীরে ধীরে একসময় জিন্নৎ-এর প্রতিরোধ ক্ষমতা নিঃশেষিত হয়। সে জানে কালকে রাতে সুজাকে কখনো কাছে পাবে না। তবু আজ যে পাচ্ছে এটাই বা মন্দ কি? সুজা জানে একথা। তার যে প্রবল

আকর্ষণ ক্ষমতা এ বিষয়ে সে সচেতন। এমন সুপুরুষকে অস্বীকার করবে কে? এমন সম্মোহন ক্ষমতা যার, এমন বলিষ্ঠতা যার, নারী তার ক্রীতদাসী।

অনেক পরে যখন বহু রাত্রির অনিদ্রার পর জিন্নৎ-এর সত্যিই ঘুম এসে যাচ্ছে তখন সুজা জিজ্ঞাসা করে—তুমি আসল খবরটা বললে না তো?

ঘুম চোখে জিন্নৎ বলে—কোন্ খবর?

—আমরা যে উড়িষ্যায় যাচ্ছি।

—তুমি শোনোনি?

—হঁ্যা, কিন্তু তুমি তো বলবে? তোমার মুখে শোনার স্বাদ আলাদা।

—তাই নাকি? কবে থেকে?

—যদি বলি চিরকাল? তাহলে ঠাট্টা করবে?

—দেওয়ান সাহেব বলেছেন আসাদ আর নাফিসাকে যেতে দেবে না।

—বাঃ, উত্তম প্রস্তাব।

—আমি কি নিয়ে থাকব?

—কেন? আমাকে নিয়ে।

জিন্নৎ ম্লান হেসে বলে—বাইরে বৃষ্টি, ঘর অন্ধকার, এই রাত্রে কথাটা শুনে মনে হচ্ছে বুঝি সত্যি কথা বললে, সকাল হতেই সূর্যের আলোয় ভুল ভেঙে যাবে।

সুজা চুপ করে থাকে।

জিন্নৎ বলে—বুঝতে পেরেছি?

সুজা তবু নিরুত্তর। জিন্নৎ দেখে সুজা ঘুমিয়ে পড়েছে কয়েক পলকের মধ্যেই। অদ্ভুত মানুষ।

সেও পাশ ফিরে শোয়।

ভূপতি রায় নিযুক্ত হলো পেশকার খালসা আর তার ভাই কিশোরকে করা হলো দেওয়ানের ব্যক্তিগত কর্মচারী। এত উঁচু পদে এভাবে দুই নবাগতকে কেন নিযুক্ত করা হলো কেউ বুঝতে পারলো না। এমনকি ভূপতি ভ্রাতৃদ্বয়ও কম অবাক হলো না। তারা কৃতজ্ঞতা জানাবারও অবকাশ পেলো না দেওয়ান সাহেবকে।

কিশোরের স্ত্রীর বয়স কম এখনো, তার গা ছমছম্ করে এতো সুখ সইলে হয়। সে ভাবতে চেষ্টা করে পাল্কী করে বাপের বাড়ি থেকে কদিন আগে সে এসেছিল। তাও দুতিন বছর হয়ে গেল। সুবাদার বা দেওয়ানের কোন সিপাহী তখন তাকে দেখেছে বলে মনে হয় না। তবু প্রতিদিন বেলা শেষে তার স্বামী যখন বাড়ি ফেরে তখন সে আশান্বিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে স্বামীর মুখের দিকে, এই বুঝি কোন বিপদের

কথা শুনতে পাবে। কিন্তু কিশোরের মুখ যেমন হাসিখুশী থাকে তাতে আতঙ্কের কোন চিহ্নই দেখা যায় না। দিনে দিনে তার গায়ে গহনা উঠছে। তার জা এর গায়েও উঠছে। তারা জামদানী শাড়ি কিনতে পারে যা জীবনে কখনো পরবে বলে কল্পনা করেনি। আর সবচেয়ে অদ্ভুত কথা, দেওয়ান সাহেবকে দুই ভাই এতটুকু কৃতজ্ঞতা জানাবার চেষ্টা করলে, সামান্য হেসে বলে,—তোমাদের অত সঙ্কুচিত হয়ে থাকার দরকার নেই। তোমাদের যোগ্যতা আছে, তাই এই কাজ পেয়েছ। ভেবো না আমি তোমাদের কৃপা করেছি। তোমরা খুব কাজের। আমার দরকার তোমাদের।

দেওয়ান সাহেব এভাবে কারও সঙ্গে হেসে কথা বলে না। ওরা দুই ভাই শুধু নয়, দেওয়ানখানার সবাই অবাক হয়। দুই ভাইকে তারা একটু ঈর্ষার চোখে দেখে। কিন্তু শুধু ওই ঈর্ষাই, তার বেশী কিছু নয়। তারা জানে, এটা দিল্লী নয়, আগ্রা নয় এমনকি দাক্ষিণাত্যও নয়। এখানে প্রশাসনের হাল ধরা আছে বজ্রমুষ্টিতে। এতটুকু বেতাল কিছু দেখানোর অর্থ হলো নিজের বিপদ ডেকে আনা।

সেদিন ভূপতি রায় তার হিসাবের খাতা নিয়ে গিয়ে নমস্কার জানিয়ে সামনে দাঁড়াতে মুর্শিদকুলী খাঁ বলে—কদিন খুব দুর্যোগ গেল।

—হ্যাঁ, দেওয়ান সাহেব।

—তোমাদের কোন ক্ষতি হয়নি তো?

—একটা নারকেল গাছ ছিল, ঘরের পাশে পড়েছে। ঘরের ওপর পড়লে কি হতো বলা মুশকিল।

—যাক্, বেঁচে গিয়েছ। গাছটা কেটে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করবে।

ভূপতি অবাক হয়। এত সামান্য বিষয় নিয়ে কথা বলে দেওয়ান সাহেব।

সেই সময় একজন এসে খবর দেয় এক যুবক সাক্ষাৎপ্রার্থী। এভাবে দেখা করা দেওয়ান সাহেবের অপছন্দ। তার সামনে বড় বড় জমিদাররাও সহজে আসতে পারে না। সে চায় না নিজেকে সস্তা করে ফেলতে। জমিদাররা সবাই প্রায় হিন্দু, শুধু বীরভূমের জমিদার ছাড়া। সে একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, সে থাকেও বহুদূরে। তাছাড়া জঙ্গলাকীর্ণ ভাব জমিদারীর আয় খুব সীমিত। তাই তাকে মুর্শিদাবাদে আসা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়েছে। বাকী সব জমিদারকেই আসতে হয়, খাজনা দেবার জন্যে, অন্য সমস্ত দ্রব্য সম্ভার এনে দেওয়ান সাহেবকে তুষ্ট করার জন্যে। কিন্তু যতবড় জমিদারই হোক না কেন, তারা যদি হিন্দু হয়, তাহলে মুর্শিদাবাদের পথে ঘাটে পাল্‌কী চেপে আড়ম্বর দেখানো চলবে না। ডুলি চাপতে হবে। পাল্‌কীতে উঠলে শাস্তি পেতে হবে। তারা যেন কখনো ভুলে না যায়, তারা ধনী হতে পারে কিন্তু আসল শাসকের জাত হলো মুসলমান। এই প্রভেদ না রাখলে তারা মাথায় চাপবে। তাদের বুদ্ধি আছে যথেষ্ট। তাই দাপটে না রাখলে সামলানো যাবে না।

সাক্ষাৎ প্রার্থী যুবক হিন্দু শুনে মুর্শিদকুলী খাঁ সংবাদদাতাকে প্রশ্ন করে—কোথা থেকে এসেছে?

—পুঁটিয়ার দর্পনারায়ণ পাঠিয়েছেন। সঙ্গে দর্পনারায়ণের পত্র আছে।

দর্পনারায়ণ মানুষটি খাঁটি। হিন্দুদের মধ্যে বেশ সম্মানজনক ব্যক্তি। মুর্শিদকুলী খাঁ লোকটিকে পছন্দ করে। সে বলে—নিয়ে এসো।

ভূপতি রায় বুঝলো, দর্পনারায়ণ ব্যক্তিটি তার মতই সৌভাগ্যবান। নইলে দেশের অনেক কেউকেটা ব্যক্তিও এত সহজে দর্শন পায় না।

একটু পরে যে যুবকটি প্রবেশ করে তাকে দেখে ভূপতি রীতিমত আকৃষ্ট হয়। এমন কিছু বলবান নয়, বরং কিছুটা শীর্ণই বলা যায়। কিন্তু চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি, তাব ভঙ্গি অনায়াস ও চট্‌পটে। যুবক এগিয়ে এসে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে পুঁটিয়ার রাজার পত্রটি দেওয়ান সাহেবের হাতে দেয়। দেওয়ান সাহেব সেটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে।

শেষে বলে—তুমি দর্পনারায়ণের তরফে এখানে থাকবে দেখছি। তাঁর উকিল হবে তুমি। এ বিষয়ে জানাশোনা আছে নিশ্চয়।

—আজ্ঞে, রাজাসাহেব যতটুকু শিখিয়েছেন মনোযোগ দিয়ে শিখেছি।

—হুঁ, আর কি করবে?

—আমি এখানে কিছুই চিনি না। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে কাজে লাগালে আমি কৃতার্থ হবো।

মুর্শিদকুলী খাঁ একবার ভূপতি রায়ের দিকে তাকায়। তারপর বলে—তুমি আগামীকাল এই সময়ে এঁর সঙ্গে দেখা করবে। যদি কিছু করা সম্ভব হয় ইনি তোমাকে জানিয়ে দেবেন।

যুবক বিদায় নিতে মুর্শিদকুলী ভূপতি রায়কে প্রশ্ন করে—কেমন দেখলে?

—অত্যন্ত বুদ্ধিমান। শুধু বুদ্ধি নয়, চোখের চাহনি দেখে মনে হয় প্রতিভা আছে।

—তুমি মানুষ চিনতে পার ভূপতি।

ভূপতি রায় মনে মনে বলে, আপনার কাছে আমি শিশু। মানুষ যদি চিনতে পারতাম তাহলে এতদিনে এত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেও আপনার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারলাম না? আমাদের দুই ভাই এর ওপর কেন এত সদয় হলেন তাও রহস্যময় হয়ে রইল।

মুর্শিদকুলী খাঁ বলে—ওকে কোথায় দেওয়া যায়।

প্রশ্নটা ভূপতিকে করলেও আসলে নিজেই চিন্তা করতে থাকে। ছেলেটা সুন্দর ফারসি বলে! যে কোন জায়গাতেই এ নাম করবে বলে মনে হয়।

—আচ্ছা কানুনগো দর্পনারায়ণের সঙ্গে দিলে কেমন হয়। জয়নারায়ণ তো রয়েছে এ-ও থাকুক। পুঁটিয়ার রাজার পত্রে পড়লাম জমিসংক্রান্ত ব্যাপারে ছেলেটি অত্যন্ত পাকা। আমি সারা বাংলার জমি কয়টি চাকলায় ভাগ করব ভাবছি। সেই কাজে এ দর্পনারায়ণকে সাহায্য করতে পারে। কি বল?

—এর চেয়ে ভাল সিদ্ধান্ত আর হয় না। ছেলেটি অনেক উঠবে।

মুর্শিদকুলী খাঁ ভাবে, হ্যাঁ উঠবে ঠিকই, কিন্তু একটা সীমায় এসে ঠেকে যাবে। আর উঠবে না। সে মুসলমান নয়, এইখানেই তার ঘাটতি। সে ভাবে দর্পনারায়ণের সঙ্গে থাকুক এ। দর্পনারায়ণের গলদ এ দেখতে পারবে। তবে লোকটার কোন গলদই নেই। তবু কোন না কোন দিনে, একটা ছুতো খুঁজে বের করতেই হবে। সে বাদশাহের কাছে যাবার সময় তার নিজের তৈরী হিসাবে দর্পনারায়ণ দস্তখত দেয়নি, একথা ভুলে যাবে না সে। চরম প্রতিশোধ নিতে হবে। তবে ধীরে সুস্থে কেউ যাতে না বোঝে, লোকটা দেওয়ান সাহেবের ক্রোধাগ্নিতে ঝলসে পুড়ে শেষ হয়ে গেল।

—আমি দর্পনারায়ণকে ডেকে পাঠিয়ে এর কথা বলছি কাল তোমার কাছে ছেলেটি এলে কানুনগোর কাছে নিয়ে যেও।

—যে আজ্ঞে।

ভূপতি রায়ের কাছ থেকে 'যে আজ্ঞে' 'জো হুজুর' এসব শুনতে খুব উপাদেয় লাগে না মুর্শিদকুলী খাঁর। ভূপতি বেশ গৌরবর্ণ। কিশোর শ্যাম বর্ণের। ভূপতির সঙ্গে সেই গৌরবর্ণের ময়লা উপধীতধারী ব্যক্তিটির সাহায্য কল্পনা করে নিয়েছে সে। নিশ্চয় এমন দেখতে ছিল। তবে ভূপতি অতটা শীর্ণ নয়। গ্রামে থাকার সময় তবু শীর্ণ ছিল কিছুটা, কিন্তু শহরে এসে নিশ্চিন্তের জীবনে গায়ে গতরে লেগেছে। আচ্ছা, ভূপতির সঙ্গে তার চেহারার কোন সাদৃশ্য নেই তো? ভাবতেই বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের মুখখানা ভেসে ওঠে। তিনি মহম্মদ হাদির আরও আগের নাম জানতে চেয়েছিলেন। তারও রঙ গৌরবর্ণ—মিল থাকা অস্বাভাবিক কখনই নয়। কিন্তু তার মুখ ভূপতির মত শ্মশ্রুবিহীন নয়। কেউ চিনতে পারবে না এ বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত। অনেক সময় গলার স্বরে অদ্ভুত মিল দেখা যায়। সে বাদশাহের পুত্র আর পৌত্রদের কণ্ঠস্বরে এমন সাদৃশ্য দেখে অনেক সময় চমকে উঠেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সেটিও কেউ বুঝতে পারবে না। কারণ সে শিক্ষা পেয়েছে পারস্য দেশে। সেখানকার উচ্চারণরীতি কণ্ঠস্বরের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে।

—গ্রামে যাও কখনো?

—আপনার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে একবার গিয়েছিলাম।

—গ্রামের লোকে কি বলে?

—তারা বলে আপনি আল্লার আদেশ পেয়ে আমাদের নিয়ে এসেছেন। আল্লা চিহ্ন হিসাবে বলেছিলেন দুটো প্রাচীন আম আর নিম গাছের কথা।

—তোমরা বিশ্বাস কর?

—আপনি যদি অসন্তুষ্ট না হন, তাহলে বিশ্বাস করতে ভাল লাগবে।

—তোমাদের যা খুশী বিশ্বাস কর, আমার তাতে কি?

পরদিন থেকে রঘুনন্দন দর্পনারায়ণের অধীনে নিযুক্ত হলো।

মধ্যাহ্ন কাল। সেদিনের মত মুর্শিদকুলী খাঁয়ের কোরাণ নকল শেষ হয়েছে। সে ভাবে, প্রতিদিন কোরাণ পাঠের জন্য আরও কিছু ধর্মপ্রাণ মানুষকে নিযুক্ত করলে কেমন হয়? অন্তত দুই সহস্র পাঠক যদি রাখা যায় তাহলে মন তৃপ্তি পাবে। কোরাণের বাণী মানুষের যাতায়াতের পথে এভাবে উচ্চারিত হলে, কত মানুষের উপকার হবে, কত মানুষ প্রেরণা পাবে। সে আরও ভাবে এবার থেকে মহানবীর জন্ম মৃত্যু নিয়ে যে বারোটা দিন, অর্থাৎ রবি-উল-আওলার পয়লা থেকে বারো তারিখ পর্যন্ত মাহীকার থেকে লালবাচা আদি গঙ্গার ধার দিয়ে আলোকিত করে রাখবে আর এই আলোগুলোকে এমন ভাবে সাজাতে হবে, যাতে দেখতে লাগবে কোরাণের বানীর মত, কোথাও বা মসজিদের মত বা বৃক্ষের মত। কোরাণ নকল করতে করতেই এইসব কল্পনা তার মনের মধ্যে এলো। সে ভাবে, এই কদিন বহু মানুষকে খেতে দেওয়া হবে। তারা সবাই ভরপেট খাবে। শুধু তারা কেন? পশুই বা বাদ যাবে কেন? পশু-পাখিও খাবে। এমন কি রাতের পোকারাও বাদ যাবে না। সবাই সেই একই সৃষ্টি কর্তার সৃষ্টি। সবাই এই পৃথিবীর কিছু না কিছু উপকারে আসে। তারা কেউই শয়তান নয়।

কাগজ কলম গুছিয়ে রাখতে না রাখতেই বেগম সাহেবা সামনে এসে উপস্থিত হয়। এই সময় কোন কোন দিন বেগমের কাছে সে ঠাণ্ডা পানীয় চেয়ে নেয়। জীবনে কোন বিলাসিতাই তার নেই। ধর্মের অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার চেষ্টা করে। খাদ্যে নেই বিলাসিতা। নৃত্য গীতের ধারে কাছে যায় না। যৌবনের প্রথম উন্মাদনাতেও সে তার বেগম ছাড়া অন্য কোন রমণীকে হৃদয়েশ্বরী করেনি। অথচ কতই না সুযোগ ছিল। পোষাক পরিচ্ছদ অতি সাধারণ। শুধু একটি বিষয়ে তার একটু আগ্রহ রয়েছে। গরমের সময়ে পানীয় হিসাবে বরফ মেশানো সরবৎ—যে ধরণের সরবতই হোক না কেন। আর এই বরফ সংগ্রহের ভার রয়েছে তারই অতি বিশ্বস্ত পাচক খিজির খাঁ এর ওপর। সে ফি বছর শীতের সময় চলে যায় রাজমহলের পাহাড়ে পর্বতে। সেখান থেকে সারা বছরের বরফ সংগ্রহ করে এনে জমিয়ে রাখে। আর একটি প্রিয় খাদ্য তার আম। বরফের মধ্যে রেখে দেওয়া ঠাণ্ডা আম। খিজির খাঁ যার সহকারী সেই সাহাবুদ্দিন মহম্মদ এদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে।

বেগম সাহেবা কাছে এসে দাঁড়াতে সে বলে—না আজ আর কিছু নয়। আজ আমার মাথায় অনেক চিন্তা।

বেগমসাহেবাকে সে তার পরিকল্পনার কথা একটু একটু করে বলে। উৎসাহ দেয় বেগম। চিরকাল উৎসাহ দিয়ে এসেছে। কখনো নিজের ইচ্ছা জোর করে স্বামীর

ওপর চাপায় নি। খুব ভালভাবে সে জানে, তাতে স্বামীদের সরে যাবার সম্ভাবনা কমে যায়। জিন্নৎ তার গর্ভের মেয়ে হয়েও একথা বুঝলো না। উড়িষ্যায় গিয়েও তাই সেই একই কথা লেখে। বলে, সুজাউদ্দিন নাকি এক পরমাসুন্দরী মেয়েকে সাদি করবে ঠিক করে ফেলেছে।

কথা শেষ করে মুর্শিদকুলী খাঁ বলে—একটু যেন অন্যমনস্ক দেখছি তোমাকে ?

—না না। অন্যমনস্ক ঠিক নয়। একটা খবর দেব বলে এসেছিলাম।

—কি খবর ?

—আজিম পাটনা ছেড়ে আগ্রার দিকে রওনা হয়ে গিয়েছেন। ছেলে ফারুককে এখানকার প্রতিনিধি নিযুক্ত করে গিয়েছেন।

—হুঃ, ফারুককে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা বা খান-ই-জাহান করা, ওসব বাদশাহের এক্তিয়ার। আমি ওসব মানি না। শাহজাদার আর এদিকে থাকার উপায় নেই বুঝলে বেগমসাহেবা ?

—কেন ?

—বাদশাহ আর কদিন ? তাই তাঁর ছেলেরা মুয়াজিম, মৈজুদ্দিন, আজম, কামবক্স সব গিয়ে কাছাকাছি হাজির হয়েছেন। বাদশাহ চোখ বুজলেই মসনদ নিয়ে লড়াই শুরু হবে। পিতাদের মদত দিতে বাদশাহের পৌত্ররাও এগিয়ে যাচ্ছেন। আজিম-উস্-সান কি এদিকে থাকতে পারেন ?

—এতে তোমার কি যায় আসে ?

—কিছু না। আমার আরও সুবিধা। বাদশাহের আগেই হুকুম ছিল শাহজাদা ফারুকশিয়ার যেন আমার পরামর্শ মত চলেন। এখন আমি নিজের ইচ্ছে মত চলতে পারব।

—তুমি স্বাধীন হবে ?

—তৌবা তৌবা। একথা মনেও স্থান দিওনা বেগম। আমি চিরকাল হিন্দুস্থানের বাদশাহের বিশ্বস্ত হয়ে থাকতে চাই। আমি রাজনীতিক নই। আমি একজন কর্মচারী মাত্র। আমার কাজ হলো এই দেশ থেকে যত বেশী সম্ভব অর্থ সংগ্রহ করা আর সেই অর্থ বাদশাহের কাছে প্রেরণ করা।

—তোমার নিজের জন্যে কিছু ভাব না ?

—আমার নিজের জন্যে ? একটুও না। ভাবি একজনের জন্যে।

—কে ? জিন্নৎ ?

—না, ওতো আমার পুত্র সন্তান নয়। তবু ওর জন্যে ভাবতাম। কিন্তু ভেবে লাভ নেই। ওর জন্যে কিছু করা মানে সুজাউদ্দিনের জন্যে করা। সুজা যে এমন অমানুষ বুঝতে পারিনি। জীবনে আমার এইটি সবচাইতে বড় ভুল। বলা যেতে পারে, একমাত্র ভুল।

—তবে কার জন্য তোমার এত ভাবনা ? আমার জন্যে নয় তো ?

মুর্শিদকুলী খাঁর মুখে হাসি ফোটে। বলে—এককালে যে তোমার জন্যে ভাবনা ছিল না একথা বলতে পারবে না। কিন্তু এখন আর ভেবে লাভ নেই। আমি ভাবি আসাদউল্লার জন্যে। বেগম মুচকি হেসে বলে—জানি, ওর ওপর তোমার টান বেশী। তাই ওকে কাছে রেখেছ।

—কেন? নাফিসাকে রাখিনি?

—রেখেছ। সেটা টানের জন্যে নয়। অন্য মতলবে।

মুর্শিদকুলী খাঁ কৌতূহলান্বিত হয়ে ওঠে। বলে—কোন্ মতলবে?

—সাদি দেবে মেয়েটার। নিশ্চয় কোন ভাল ছেলে নজরে পড়েছে। তাকে ভাল পদে বসাতে চাও।

—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সত্যিই তোমার বুদ্ধির ধার বেড়েছে। আমার কিছু বলার নেই।

—ছেলেটি কে?

—এখন নয় সময়ে বলব। আসাদের একটা উপাধিও ঠিক করে রেখেছি। আমার জায়গায় ওকেই তো বসতে হবে।

—উপাধিটা কি শুনি।

—সরফরাজ খাঁ আলা-উ-দ্দৌলা হায়দরে জং।

—সরফরাজ। বেশ মিষ্টি নাম।

—মিষ্টি? তা মিষ্টি বৈকি। মিষ্টির কথা ওঠায় আমার আমের কথা মনে পড়ল। পাকা আম উঠতে আর দেরি নেই। ঝড় জল শিলা বৃষ্টিতে কি রকম ক্ষয় ক্ষতি হলো এবারে, সেই খবরও জানালো না এখনো সাহাবুদ্দিন। রাজমহলে বসে বসে মজা করছে বোধ হয়।

বেগম বুঝলো সাহাবুদ্দিনের কপাল পুড়লো। একবার কারও সম্বন্ধে এতটুকু খারাপ ধারণা যদি হয় মুর্শিদকুলী খাঁয়ের তাহলে তাকে সরে যেতে হবেই। সাহাবুদ্দিন লোকটা খারাপ নয় বলে শুনেছে বেগম, খিজির খাঁয়ের কাছে। রাজমহলে যখন খিজির যায় সে তখন সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করে। বরফ সংগ্রহ করা এবং সেই বরফ মুর্শিদাবাদে পৌঁছে দেবার খরচ খরচা যেমন আশেপাশের জমিদারদের বহন করতে হয়, তেমনি মালদহ, কোতোয়ালী, হুসেন পুর—সব জায়গার সেরা আমের গাছগুলি রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় ব্যয়ও সংশ্লিষ্ট জমিদারদের। কিন্তু প্রতিটি আমবাগানে, এমনকি আলাদা আলাদা ভাবে কোন কোন বিশেষ আমগাছের কাছে প্রহরার ব্যবস্থা সাহাবুদ্দিনকে করতে হয়। তাছাড়া কত আম হয়েছে, ঝড় জলে কত নষ্ট হলো, কত আম পাকার সম্ভাবনা, এবং শেষ পর্যন্ত কত আম পাকলো ও মুর্শিদাবাদে পাঠানো হলো সব কিছুর খতিয়ান রাখার দায়িত্ব ওই সাহাবুদ্দিনের। খিজির খাঁ বেগমসাহেবাকে বলেছে, লোকটা ভালমানুষ আর নড়তে চড়তে বড় দেরি করে। আগের কামাল সাহেব খুব চট্‌পটে ছিল। সাপের কামড়ে না মরলে কোন

ভাবনাই থাকত না।

বেগমসাহেবা বলে—তুমি পাকা আম ছাড়া মুখেই তুলতে চাও না। খিজির খাঁ কাঁচা আম পুড়িয়ে বরফ দিয়ে যে সরবত বানায় সত্যিই কিন্তু উপাদেয়। খেয়ে দেখো না একদিন। আজও আছে। অমর?

—না থাক্। আমি বরং সেই লোকটার মুখে শাহজাদা আজিমউদ্দিনের কথা শুনি আগে।

—খাবে কখন?

—খেলেই হবে। আমি তো মুঘল বংশের বাদশাহ নই যে এলাহি কাণ্ড করতে হবে খাওয়ার ব্যাপারে।

—মুঘল বাদশাহ? তুমি কি বাদশাহ ঔরঙ্গজেবকে এই পর্যায়ে ফেল?

মুর্শিদকুলী খাঁ সামান্য হেসে বলে—না। তিনি সত্যিই সংযমী। তবে আমার মতো কি?

—ভুলে যেওনা ওঁর জন্ম শাহানশাহ্ বংশে।

মুর্শিদকুলী খাঁর মনে হলো বেগম যেন তাকে চাবুকে দিল। সে আর কোন কথা বলল না।

বেগম একটু অপ্রস্তুত হলো। কিন্তু সে যে অপ্রস্তুত হয়েছে একথা বুঝতে দিল না স্বামীকে। বয়স হয়েছে বলে সাত পাঁচ ভেবে সব সময় বলতে পারে না। দু একটা এমন মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে যায়।

মনের বসন্ত বছরের কোন বিশেষ মাসের তোয়াক্কা না রেখেই আসে। নাফিসার মনে সেই বসন্তের আগমন বার্তা পেঁছাল অতর্কিতে। সেদিন ছিল প্রচণ্ড গরম। কদিন থেকেই গরম চলছে। মুর্শিদকুলী খাঁর বরফের ভাণ্ডারে ঘন ঘন হাত পড়ছে। নাজির মহম্মদ বিরক্ত হচ্ছে খিজির খাঁর ওপর। খিজির খাঁর অস্বস্তি হচ্ছে। কারণ কোন কারণে বরফ অমিল হলে মুর্শিদকুলী খাঁ ছেড়ে কথা বলবেন না? তিনি হচ্ছেন তেমনি মানুষ যিনি কাজের কদর দেন। কাজের লোককে প্রচুর সুযোগ সুবিধা দেন। কিন্তু কোন অসুবিধা হলে শাস্তি অবধারিত কোন ক্ষমা নেই। কোন অজুহাতে কর্ণপাত করবেন না। অথচ দেওয়ান সাহেবের দুই নাতি নাতনির চাহিদা যেন বেড়েই চলেছে। সেদিনও দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে নাফিসা ছটফট করছিল। কী করবে ভেবে না পেয়ে খিজির খাঁকে ডেকে পাঠালো।

খিজির তখন ছিল না। নাজির মহম্মদ সব সময় এমনিতেই থাকে না। ছিল তাদের অধীনস্থ বাহার আলি। তার ওপর খিজিরের হুকুম ছিল যে কোন অবস্থার

হোক নাতি নাতনির হুকুম মানতে হবে। সে ছুটে গিয়ে হারেমের বাইরে দাঁড়ায়। আসাদের পরিচারক খোজা রহিম, সেখানে ছিল। সে বাধা দেয়। কিন্তু যে খিজিরকে ডাকতে গিয়েছিল, সে নাফিসার আদেশের কথা রহিমকে জানিয়ে দেয়। রহিম তখন নাফিসাকে গিয়ে বলে যে বাহার আলি বাইরে অপেক্ষা করছে।

নাফিসা চটে উঠে বলে—বাহারকে আমি ডাকিনি। খিজির খাঁকে ডাকো। কিংবা নাজির মহম্মদ যেন আসে।

রহিম সেকথা বাহার আলিকে বলতে, বাহার বলে যে খিজির খাঁ কাঠের গুঁড়ো আর তরমুজের ব্যবস্থা করতে বাইরে গিয়েছে। নাজির মহম্মদ এ সময়ে কখনো থাকে না।

নাফিসা চটে গিয়ে লাফালাফি শুরু করে দেয়। খোজা রহিম হতবাক। সে ভয় পেয়ে যায়: ছুটে গিয়ে বাহারকে বলে—শিগ্গির খিজিরকে খুঁজে আনো। নইলে আমাদের সবার গর্দান যাবে।

বাহার আলী শান্তভাবে বলে—গর্দান গেলেও উপায় নেই। খিজিরকে এখন পাওয়া অসম্ভব। বরফ গলছে বেশী করে। কাঠের গুঁড়ো খুব দরকার। তাছাড়া দেওয়ান সাহেব নিজের মুখে তরমুজের কথা বলেছেন আজকে।

—দাঁড়াও। আবার অবস্থা বুঝে আসি। তুমি বরং তোমার গর্দান আর গলায় তেল মালিশ কর ততক্ষণ।

রহিম খিজিরের কথা বলতে গিয়ে দেখে নাফিসা বেগম একেবারে শান্ত। আগের সেই রুদ্ররূপ কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। বরং মুখে একটু হাল্কা হাসি ভেসে উঠেছে। রহিম বিস্মিত। হায় আল্লা, এত বছর বেগম আর বিবিদের নিয়ে নাড়াচাড়া করেও তাদের মনের হদিশ পেলাম না। খোজা হলে কি হবে, খোদাতায়লা পুরুষ করেই তো পাঠিয়েছিলেন। খোদার ওপর খোদগিরি করে মানুষ আর কতটুকু পাল্টাতে পেরেছে তাদের। মাঝখান থেকে জীবনটা বরবাদ করে দিয়েছে। হাঁপানীর রুগী যেমন বুকভরে বিশ্বাস নিতে পারে না। তারাও তেমনি পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ অনেকটাই গ্রহণ করতে পারে না। মাঝ পথে থেমে যায়। তাদের কাছে জগতটা অসম্পূর্ণ বিকৃত।

নাফিসা জানলা দিয়ে নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে কিছু দেখছিল। রহিম অতি বিনীতভাবে কাছে গিয়ে তাকে বলে—খিজির খাঁকে—

—ঠিক আছে। তুমি এখন যাও।

কত কী মিষ্টিভাবে কথাগুলো উচ্চারণ করল নাফিসা। রহিম জানে, সে পরিপূর্ণ পুরুষ হলে এই মিষ্টত্ব তার হৃদয় ক্ষীণ করে তরঙ্গ তুলতো। এমন হতে দেখেছে কত। কিন্তু তার হৃদয় স্থির—কোন আলোড়ন নেই তাতে। সে চলে আসছিল। বাহার আলির গর্দান বেঁচে গেল এ যাত্রা। সে ভাবে, আসাদউল্লার সঙ্গে থাকা পোষায়। তার মা তাকে দেখাশোনা করার জন্যেই রহিমকে রেখেছে। সেও দেখাশোনা করছে।

আসাদ যখন ভীষণ অস্থির হয়ে ওঠে, তখন রহিম হারেমের বাঁদীদের মধ্যে কমবয়সী কারও সঙ্গে কথা বলে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে আসাদের সঙ্গে ভেট করিয়ে দেয়। তাকে নোকরি করে খেতে হবে। সে শুনেছে আসাদ নাকি দেওয়ান সাহেবের পদে বসবে একদিন। চটিয়ে লাভ নেই। এর ফলে আসাদ তৃপ্ত অথচ কাক চিলও জানতে পারছে না। হারেমের বাঁদীদের মধ্যে রহিমের কদর বেড়ে গিয়েছে। বাঁদীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে গোপনে গোপনে। ফলে তার বেশ কিছু বাড়তি লাভ হচ্ছে। আসাদ পুরুষ বলেই তার সঙ্গে থাকার অসুবিধা নেই, তার মন জানা যায়। কিন্তু বেগমদের মন বোঝা সত্যিই মুশকিল।

নাফিসার ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগের মুহূর্তে সে আবার ডাকে—রহিম, শোনো।

খেয়েছে। আবার কোন্ ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে চাপবে কে জানে। মেয়েদের এইটাই তার সহ্য হয় না। প্রতি মুহূর্তে মন বদলায়। এই রাগ, এই অনুরাগ,—এই হাসি, এই কান্না।

সে ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

নীচের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে নাফিসা রহিমকে জিজ্ঞাসা করে—ওই যে ঘোড়ায় চড়ে আমাদের সদর দরজা দিয়ে মানুষটা চলে যাচ্ছে, কে ও?

রহিম মুহূর্তেই চিনতে পারে। বলে—মানুষ হতে যাবেন কেন? ও'র বয়স তো খুব কম।

নাফিসা মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ায়। নাক ফুলিয়ে বলে—মানুষ নয় মানে? তবে কি জন্তু?

রহিম নাক কান মলে বলে—না না। কচি বয়স তাই বলছিলাম। বেশী বয়সের লোকদের মানুষ বলে তো।

—কে বলল তোমাকে একথা?

—আমার তাই ধারণা ছিল। মাফ্ করে দেবেন। আমার অন্যায় হয়ে গিয়েছে।

—ঠিক আছে। কি নাম ও'র।

—খুব উঁচু বংশের। সৈয়দ রেজা খাঁ ও'র নাম।

নাফিসা নামটা বার কয়েক আউড়ে নেয়। বলে—যাও।

রহিম বাইরে এসে হাঁফ ছাড়ে। বাঁদীগুলো কোথায় যে উধাও হয়েছে কে তা জানে। যত সব হুজ্জোত।

নাফিসা আবার ডাকে—শোন, শোন।

রহিম মনে মনে বলে, এবারে ঠেলা সামলাও। সে কাছে আসতে নাফিসা জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা, ও কেন আসে এখানে?

—আমি কি করে বলব। আমি সামান্য খোজা। তবে আপনি হুকুম করলে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি।

—থাক দরকার নেই। তুমি যাও।

রহিম ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হতেই নাফিসা গুণগুণ করে গান গাইতে শুরু করে। নাচের ভঙ্গিমায় সারা ঘরটা একবার ঘুরে নেয়। ভাই আসাদের আচার আচরণে এতদিন বিরক্ত হতো। একবার সেই দৃশ্য দেখার পরে ঘৃণাও যে একটু না হয়েছে তা নয়। কিন্তু এখন সে আসাদউল্লার ওইসব কার্যকলাপের মধ্যে একটা সংগতি খুঁজে পায়। আচ্ছা, আসাদ তো বাইরে যায়। ও বলতে পারে সৈয়দ রেজা সম্বন্ধে।

সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখে রহিমকে পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু না, সে চলে গিয়েছে। তা হোক, তার নিজের পরিচারিকা গুলবিবি পর্দার ওপাশে নিশ্চয় অপেক্ষা করছে। সে গুলবিবিকে অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকে। গুল এতক্ষণ পাতলা পর্দার ওধার থেকে ঘরের ভেতরে লক্ষ্য রাখছিল, আর ভাবছিল খোজা রহিম এতবার এ-ঘরে যাতায়াত করছে কেন? এ ঘরের মালিকানির ভার তো তার ওপর। রহিম তাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে না তো? রহিম কি এতটা খারাপ হবে? একথা ঠিক রেবেকা যেদিন চুপিচুপি এসে তাকে আসাদউল্লার সঙ্গে মিলনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিল, সেদিন সে ভীষণ রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল এবং সেদিন থেকে আসাদের আসঙ্গ লিপসার জন্যে মনে মনে সে অস্থির হয়ে ওঠে। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। পিতা সুজাউদ্দিনের মত না হলেও আসাদ বেশ সুপুরুষ। তার ওপর এতবড় ঘরের ছেলে। এ এক কল্পনাতীত সৌভাগ্য বলতে হবে। রেবেকা ভোগ করল, আর সে পারবে না? সেদিন থেকে রহিমের পেছনে লেগে থেকে, তাকে অর্থ দিয়ে বশীভূত করে তবে সে সুযোগ পেয়েছে। আর সুযোগ পেয়েছে বলে নিজেকে ধন্য বলে মনে করে। একদিন নয় পর পর তিনদিন। তারপর থেকে, রেবেকা থেকে শুরু করে সব বাঁদীরা তার পেছনে লাগলো। রহিম ভয় পেয়ে গেল। জানাজানি হয়ে গেলে, সবার জান যাবে। তারপর থেকে গুলবিবি বুভুক্ষু। আজ কি কিছু জানাজানি হয়ে গিয়েছে? রহিম বারবার এসে কি কথা বলছে নাফিসার সঙ্গে? সে কি ভেবেছে নিজে ভালমানুষ সেজে থেকে গুলবিবিকে ফাঁসিয়ে দেবে?

হঠাৎ সর্বাঙ্গ ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে থাকে তার। আর সেই সময় নাফিসার ডাক শুনে তার চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে যায়। পা দুটো অবশ হয়। সে আপ্রাণ চেষ্টা করে উঠে দাঁড়াতে, পারে না। সে উত্তর দিতে চায় গলা দিয়ে আওয়াজ বেরু হয় না।

নাফিসা বেগম এগিয়ে আসে। গুলবিবি ভাবলেশ হীন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে।

—কি হয়েছে? ঘুমোচ্ছিলে?

গুলবিবি কোনরকমে মাথা নাড়ে।

—তবে? নেশা করেছিস?

গুলবিবি আবার মাথা নাড়ে?

—কথা বলছিস না কেন? আমার ডাক শুনেও বেয়াদপের মত বসে থাকিস, এত বড় আস্পর্ধা তোর?

এতক্ষণে গুলবিবির শরীরের শিরা উপশিরায় আবার যেন রক্ত চলাচল শুরু করে। সে কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে চলে—হঠাৎ মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

—মাথা ঘুরে গিয়েছিল? কেন? তুই কি খেতে পাস না? বল্, খেতে পাস না?

—আপনার অনুগ্রহে খাওয়ার কোন অভাব নেই।

—তবে?

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এখন ঠিক হয়ে গিয়েছে।

নাফিসা বেগমের হঠাৎ তার দাদির একটা কথা মনে পড়ে গেল। সে বড় বড় চোখে গুলবিবির দিকে চেয়ে বলে—তুই, কি করেছিস। ঠিক করে বল্। কার সঙ্গে মিশেছিস?

গুলবিবির হৃদকম্পন শুরু হয়। সে ভাবে, যদি সত্যিই তাই হয়? তবে তো নির্ঘাত মৃত্যু। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হবে কেন? এই আট দশদিনের মধ্যেই না না—অসম্ভব।

সে বলে—কারও সঙ্গে মিশব। আমি হারেমের বাঁদী। পুরুষের মধ্যে দেখা হয় শুধু খোজা রহিমের সঙ্গে।

—তার কথা বাদ দে। যত পারিস মেশ তার সঙ্গে। এক কাজ কর। রহিমকে বল্ আসাদকে গিয়ে বলতে যে আমি তাকে ডাকছি।

গুলবিবির বুকে কাঁপন ধরে। আসাদউদ্দীন এই কক্ষে আসবে। তখন সে পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে চেয়ে দেখতে পারে। সে বাইরে যায়। রহিম থাকে আসাদউদ্দীনের ঘরের কাছে। সে সেখানে গিয়ে রহিমের দেখা পায় না। ভাবে নিশ্চয় আসবে ভেতরে ডেকেছে। সে অপেক্ষা করে। কিন্তু রহিম বাইরে আসে না।

গুলবিবি আরও একটু অপেক্ষা করে ফিরে গিয়ে নাফিসা বেগমকে বলে—রহিমকে পাওয়া গেল না। বোধ হয় বাইরে পাঠানো হয়েছে।

নাফিসা ক্ষেপে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠে—তাই বলে ফিরে এলি? তোর হাত পা নেই?

—আমি? আমি যাব?

—তুই আমার বাঁদী কিনা?

গুলবিবি সম্মতি সূচক মাথা নাড়ে।

—তবে? তুই আমার বাঁদি, তুই যাবি আমার ভাই-এর কাছে বলতে বা আমি তাকে ডাকছি। এতে দ্বিধার কি আছে?

গুলবিবি মুখে রক্তোশ্বাস দেখা যায়। সে বলে আমি তাহলে যাই।

—তাড়াতাড়ি আসে যেন।

গুলবিবি আসাদ-এর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। পা জড়িয়ে আসে। পর্দা ওঠালে এখান থেকে আসাদের শয়নকক্ষ নজরে পড়ে না। একটু ঘুরে যেতে হয়। একটা বড় থাম আছে মাঝখানে। সেই থাম সাদা সবুজ আর গোলাপী রঙে কারুকার্য করা। ফুলদানীতে ফুল ফুটে আছে। চারদিকে আরও পর্দা,—মৃদু হাওয়ায় দোল খাচ্ছে সবগুলি। একটা আলাদা জগৎ—পৃথিবীর বাইরে কোন জগৎ যেন। অথচ দেওয়ান সাহেবের ঘর সে দেখেছে, কত সাধারণ। এতটুকুও জাঁকজমক নেই। অন্দরের নাতিনকে তিনি কিছু বলেন না।

গুলবিবির বুকে কাঁপন ধরে। দুরু দুরু বুকে, পা টিপে টিপে সে এগিয়ে যায়। আসাদউদ্দিনের শয্যা কোনদিকে সে ভালমতই জানে। সেখানে হয়ত এখন নেই। তার বাঁদিকে ছোট ঘরখানাতে থাকতে পারে। কিংবা যদি শয্যায় অন্য কোন নারীকে নিয়ে থাকে ? না না, তাহলে দরজার সামনে খোজা রহিম থাকবে। সেটাই নিয়ম।

—কে ?

গুলবিবি চমকে ওঠে। ঠিক পাশেই একটা জানলার ধারে আসাদ দাঁড়িয়ে ছিল। দেখতে পায়নি সে।

—গুল তুমি ?

গুল মাথা নীচু করে বলতে যায়—আপনাকে—

—আরে রাখো—

আসাদ গুলবিবিকে কোলপাঁজা করে নিয়ে শয্যার ওপরে ধপ করে ফেলে।

গুলবিবির চোখে আতঙ্ক ফুটে ওঠে। সে বলে—আপনার বোন এখুনি আপনাকে যেতে বলেছেন। একটু দেরি হলেই লোক পাঠাবেন।

—রেখে দাও ওসব। আমি বলে ছটফট করছিলাম। জান দুদিন হলো রহিম কাউকে আনতে পারেনি।

গুলবিবির অবরোধ আসাদের সামান্য চেষ্টাতেই আগ্রহে পরিণত হয়। গুলবিবির মনে হয়, মৃত্যু তো একদিন না একদিন আসেই মানুষের। তার বয়স আর কত ? বড় জোর উনিশ বছর। হাবেলের পরিচারিকাদের মধ্যে সে সবচেয়ে ছোট। জীবনে তার সাধ-আহ্লাদ কিছুই নেই। এইখানে থেকে থেকে বয়স বাড়তে থাকবে। কয়েক বছর পরে কেউ আর তার মুখের দিকে তাকাবে না। সব শেষ হয়ে যাবে জীবনের। শুধু বাঁদীগিরি করা চলবে আরও কিছুদিন। তারা যেন মানুষ নয়। তবু নারী বলে তারা বেঁচে গিয়েছে। পুরুষ হলে খোজা হয়ে থাকতে হতো। সেটা ভাল কি মন্দ সে জানে না। রহিমকে তো জিজ্ঞাসা করতে পারে না। তবে রহিম ক্ষণিকের এই আনন্দটুকুও পায় না।

ইহজগত বলে যেন কিছু থাকে না গুলবিবির। তারপর ধীরে ধীরে তার চেতনা হয়। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। আসাদউল্লার হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে বলে—আপনি এক্ষুনি যান আপনার বোনের কাছে। নইলে আমি বোধ হয়

বাঁচব না।

—ব্যস্ত হয়ো না। চল, আমি যাচ্ছি। কিন্তু একটা কথা। কাল আসতে হবে।

—রহিমকে দিয়ে আদেশ পাঠাবেন।

—ঠিক আছে।

আরশির সামনে দাঁড়িয়ে গুলবিবি নিজেকে গুছিয়ে নেয়। মাথায় অবিন্যস্ত কেশদামে হাত বোলায়। বেশবাস ঠিক করে নেয়। তারপর মুখখানা আরসীর একেবারে কাছে নিয়ে গিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। গালের ওপর লাল দাগ। এ দাগ উঠবার না। এ দাগ আসাদউল্লার দাঁতের দাগ। তার মাথা ঘুরতে থাকে।

আসাদ চমকে পেছনে ফিরে বলে—কি হলো?

গুলবিবি কাঁদতে কাঁদতে আঙুল দিয়ে আসাদকে তার মুখের ওপরের দাগ দেখায়।

আসাদ হেসে বলে—ও কিছু নয়।

—সবাই জানবে।

—তাই নাকি? ভালই তো।

ধিক্কারিত দৃষ্টিতে গুলবিবি চেয়ে থাকে পুরুষটির দিকে। এর শয্যাসঙ্গিনীর অভাব হবে না কখনো। কে বাঁচল কে মরল তাতে এর কিছু এসে যায় না। এরা দেহের ক্ষুধা মেটায়। সেও মেটাতে চেয়েছিল। কিন্তু সে নাফিসা বেগম নয়। সে সামান্য বাঁদী। তাই আজ তার মৃত্যু হবে অবধারিত। মনটিকে বিসর্জন দিয়ে শুধু দেহকে প্রাধান্য দিলে সাধারণ মানুষের শাস্তিই হয়। সেই শাস্তি তাকে পেতে হবে।

সহসা তার একটা বুদ্ধি আসে মাথায়। তার কাছে খানিকটা চুণ আছে। গালে চুণ লাগিয়ে দেবে। জিজ্ঞাসা করলে বলবে, বোলতা কামড়েছে। সেই ভাল।

সে আসাদের পেছনে পেছনে নাফিসা বেগমের কক্ষে প্রবেশ করে। ভাইকে দেখে নাফিসা ছুটে আসে। তার দিকে লক্ষ্য করার অবকাশ পায় না। সেই অবসরে সে ছুটে চলে যায় কক্ষ পেরিয়ে তার ছোট্ট জায়গাটিতে। সেখানে সুচের পেটিকা থেকে সুচ বের করে বাঁ হাতের অনামিকা দিয়ে আগে গালের সেই জায়গাটা অনুভব করে নেয়। তারপর নির্মমভাবে দুবার সুচ বিঁধিয়ে দেয়। চুণের পাত্রটিতে হাত দিয়ে দেখে চুণ শুকিয়ে শক্ত হয়ে গিয়েছে। ছুটে একটু জল নিয়ে এসে ঢেলে দেয়। অনেকক্ষণ ধরে ঘষতে ঘষতে চুণ বেশ নরম হয়। তখন গালে লাগিয়ে দেয়। তবু সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। বসে বসে হাঁপাতে থাকে। তার ইচ্ছে ছিল নাফিসা তার ভাই-এর সঙ্গে কি কথা বলে সেটা শোনার। হলো না। অনেক পরে একবার উঁকি দিয়ে দেখে আসাদ চলে গিয়েছে। নাফিসা তার দুহাত দুদিকে পাখীর ডানার মত মেলে ধরে সারা ঘর নেচে বেড়াচ্ছে। এ নাচ সবাই নাচতে পারে। সে-ও পারে। এ নাচ শিখতে হয় না। আজ আসাদ যদি আদর করতে গিয়ে তার গালে দাগ না

ফেলত তাহলে সে-ও নাচতে পারত। তবে মহলে নাচগান নিষেধ। নাচের ভঙ্গিতে হাঁটতে গিয়ে গুনগুন গান গাইতে গিয়ে অনেক বাঁদী বহিষ্কৃত হয়েছে।

ঢাকাতেও দেখেছে, মুর্শিদাবাদে এসেও লক্ষ্য করেছে মুর্শিদকুলী খাঁ, যে ফিরিঙ্গিরা ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে জলযানের ওপর খুব বেশী নির্ভরশীল। জলযান ছাড়া তারা নিজেদের অসহায় বোধ করে। এটা স্বাভাবিক, কারণ তারা সাত সাগর পার হয়ে এদেশে এসেছে, তবু এর কার্যকারিতা মুর্শিদকুলী খাঁ বুঝতে পারে। তাছাড়া ফিরিঙ্গিরা ছোটখাটো মারামারিতে এগুলিকে নিপুণভাবে ব্যবহার করে। বড় যুদ্ধেও যে খুব ভালভাবে কাজে লাগানো যায় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অথচ এদেশে নৌকো জাহাজ নির্মাণের সব রকম ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত কেউ উদ্যমী হয়নি। এখানে মাবরগণ সারিগান গেয়ে দাঁড় টানছে হালকা চালে, ঢাকায় দেখেছে সুন্দর সুন্দর গহনা নৌকোয় কত যাত্রী যাতায়াত করছে। তবু যেন তেমন খেয়াল নেই কারও। অথচ বীরভূমের দামরা আর ময়সারাতে কারখানায় লোহা তৈরী হয়। সেই লোহা কৃষ্ণনগরে, মুল্লারপুর পরগণায় নিয়ে গিয়ে নৌকো প্রস্তুত হয়। কৃষ্ণনগরের মাধুকর নৌকো তো বেশ নামকরা। ওদিকে ঢাকায় তো দেখেই এসেছে সূত্রধররা নৌকো তৈরী করে। অথচ বছরের অনেক সময় এদের কাজ থাকে না। যে সব গাছের কাঠে নৌকো হয় সে সব কাঠ ওখানেই পাওয়া যায়। কাঁঠাল, পিয়াল, শাল, গাম্ভারী, আর তমালের কাঠ খুঁজতে অন্য কোথাও ছুটতে হবে না। সূত্রধরদের সুনাম ফিরিঙ্গিদের দেশে পৌঁছেচে। তবু যেন সব কেমন।

মুর্শিদকুলী খাঁ নিজেও এক-আধবার একটু উদ্যোগী যে হয়নি তা নয়। কিন্তু রাজস্ব আদায় করা এবং সেই অর্থ বাদশাহের কাছে পাঠানোই তার প্রধান কাজ। এই সব দিকে লক্ষ্য করতে গেলে আসল কাজই হবে না। আর হবে না বলেই সে সৈন্যসামন্তের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে। চট্টগ্রাম থেকে তৈরী করে আনা রণতরীও দুচারটে বসিয়ে দিয়েছে। ওসব রাখা মানেই খরচা বেশী। তার এক সেনাধ্যক্ষ মীর বাঙালী এ বিষয়ে আভাসে যে বলেনি তা নয়। তার ইচ্ছা নয় সব কিছু কমিয়ে দেওয়া। কখন কোথা থেকে আক্রমণ আসে ঠিক নেই। সে মিথ্যা বলে না, তবে মন থেকে সায় পায় না মুর্শিদকুলী খাঁ।

ভূপতিও একদিন দেওয়ানখানায় এসে বলে—ফিরিঙ্গিরা বড় বড় জাহাজ এনেছে। ঝামেলা বাধালেই মুশকিল।

মুর্শিদকুলী খাঁ ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে—কেন?

ভূপতি দেওয়ান সাহেবকে শোনাবার জন্যে কথাটা বলেনি। দেওয়ান সাহেব তাকে অনুগ্রহ করেন বলেই দু-চারটে কথা বলে ফেলে। সে কোনরকমে বলে—আমাদের অমন জাহাজ নেই।

—তুমি আবার যুদ্ধবিদ্যা কবে আয়ত্ত করলে?

ভূপতি সংকোচে মাটিতে মিশে যায়। সে আর কথা বলে না।

মুর্শিদকুলী বলে—ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আসল কাজ কর।

—যে আজ্ঞে হুজুর।

—আচ্ছা ভূপতি লোকে আমাকে কি বলে ডাকে?

ভূপতি হঠাৎ এ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে কি বলবে বুঝতে পারে না। তারপর বলে—তারা দেওয়ান সাহেব বলে।

—না না সেকথা নয়। কোন্ নামে আমাকে ডাকে?

—আজ্ঞে নগরীর নাম যা দিয়েছেন, সেই নামেই ডাকে।

—হুঁ। আমার কিন্তু ইচ্ছে লোকে আমাকে জাফর খাঁ নামে চিনুক। ওটাও তো আমার নামের অঙ্গ।

—অনেকে বলে হুজুর।

—বলে? কে বলতো?

—আমার ভাই কিশোর। অন্য কাউকে আপনার সম্বন্ধে বলতে গেলে ওই নামে পরিচয় দেয়। বলে, ওই নামটা তার ভাল লাগে।

—আমারও। আচ্ছা তোমাদের কাকে কে যেন এসে কিনে নিয়ে গিয়েছিল?

—আমাদের বড় দাদা হুজুর। বাবা এত গরীব ছিল, খেতে পেত না। তবে আমরা জানি না। আমি জন্মাবার কয়েক বছর আগে। আমরা তো বাবার বুড়ো বয়সের সন্তান।

—হুঁ, তোমার সেই দাদার নাম কি ছিল?

মাথা নেড়ে ভূপতি বলে—জানি না হুজুর। কেউ আমাদের কখনো বলেনি। আমরা ছোট ছিলাম তো। মা কিন্তু কাঁদতো।

মুর্শিদকুলী খাঁ চুপ করে যায়। মাঝে মাঝে তার এসব একটু জানতে ইচ্ছে করে। বিশেষ করে সে দেখছে, তারই সহোদর দুই ভাই তার অধীনে কাজ করছে দিনের পর দিন, অথচ তাকে চেনে না। এইভাবেই চলতে হবে। নইলে উপায় নেই। এদের ওপর তার স্নেহ রয়েছে, অচেনা হয়ে রয়েছে বলে। নইলে স্বার্থের সংঘাত শুরু হয়ে যেত। মুঘল পরিবারে যেমন হয়। ভাই হয়ে ভাই-এর বুকে ছুরি বসাতে হতো। তার চেয়ে এটা ঢের ভাল।

রঘুনন্দন এসে প্রবেশ করে। দর্পনারায়ণের অধীনে কাজ করে খুব অল্পদিনের মধ্যে সে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে। মুর্শিদকুলী খাঁ মনে মনে স্বীকার না করে পারে না যে এই তরুণ অসাধারণ। দর্পনারায়ণের পরে এ-হবে মুখ্য কানুনগো।

দর্পনারায়ণকে সরাতেই হবে এবং পৃথিবী থেকে। তবে ধীরে, খুব ধীরে। এখান হয়ত তার মনে নেই যে একদিন সে হিসাবে দস্তখত দিতে দুই লক্ষ টাকা চেয়েছিল। মুর্শিদকুলী খাঁ খুবই ভাল ব্যবহার করে তাকে অতীত ভুলিয়ে দিতে পেরেছে মনে হয়।

রঘুনন্দন নমস্কার করে। এই সময় তাকে মাঝে মাঝে ডাকা হয়। তাকে নির্দেশ দেওয়া আছে কোনরকম ভুলত্রুটি তার নজরে পড়লে সে দ্বিধা না করে এসে যেন বলে। রঘুনন্দন ধারণা করেছে যে আসলে দর্পনারায়ণের ভুলত্রুটির কথা বোঝাতে চায় মুর্শিদকুলী। কত ভুলচুক হয়, কাজ করতে এসব সাধারণ ব্যাপার। কারণ অত বড় দপ্তরখানায় কত লোক কাজ করে। সবাই সমান পারদর্শী নয়। আর পারদর্শী হলেও মানুষ মাত্রেই ভুল হতে পারে। কিন্তু সেই ভুল ধরা পড়লে সংশোধন করা হয় সঙ্গে সঙ্গে। বিশেষ করে দর্পনারায়ণ কোনরকম খুঁত রাখা সহ্য করতে পারে না। সেই-জন্যই দর্পনারায়ণকে রঘুনন্দনের এত ভাল লাগে। সে জানে না, মুর্শিদকুলী খাঁর অভিপ্রায় কি।

মুর্শিদ বলে—যদি কখনো দেখো, কোন ভুলভ্রান্তি ইচ্ছাকৃত, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে এসে বলবে।

অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী বলেই রঘুনন্দন মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানায়। নইলে অন্য কেউ হলে বলে ফেলত—ইচ্ছাকৃত ভুলভ্রান্তি হবার প্রশ্নই ওঠে না। দর্পনারায়ণ সেই ব্যাপারে খুব সতর্ক।

মুর্শিদকুলী খাঁ বুঝতে পারে, অন্তত রঘুনন্দনের কাছে এইভাবে বলে ফেলাটা ঠিক হয়নি। সে কথা ঘোরাতে বলে—তোমার ভাই এর নাম যেন কি ?

—আজ্ঞে রামজীবন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, রামজীবন। তাকে একটা জমিদারী দেবার অভিলাষ তোমার তাই না ?

রঘুনন্দন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কী করে বুঝে ফেললেন ইনি ? মানুষের মনের ভেতরে প্রবেশ করার কলাকৌশল এঁর ভালই জানা আছে। অনেক সাধু-ফকিরের এই ক্ষমতা থাকে এমন শুনেছে।

আসলে মুর্শিদকুলী খাঁ যাদের নিয়ে কাজ কারবার করে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে টুকরো কথাবার্তার মধ্যে তাদের মনোভাব বুঝে নেয়। দেখে নেয়, এদের উচ্চাশার পরিধি কতটা। দেখে নেয়, এদের দুর্বলতম স্থানটি কোথায়। সে আগে থেকেই জেনে ফেলেছিল, রঘুনন্দনের তার ভাই-এর ওপর প্রবল স্নেহ। আর সেই স্নেহকে বাস্তবায়িত করতে সে পারে ভাই-এর নামে কিছু জমিজমার ব্যবস্থা করতে। কারণ এখন সেই দপ্তরখানার সঙ্গে সে যুক্ত। কিন্তু মুর্শিদকে ফাঁকি দিয়ে কিংবা অন্য কোন কৌশলে ভাইকে ধনী করে তোলার মত নীচতা তার মধ্যে নেই। তাই সোজা কথাটা সোজা ভাবেই তাকে বলে ফেলে মুর্শিদকুলী।

রঘুনন্দন শান্ত স্বরে বলে—রামজীবন সুখে শান্তিতে থাকুক, ওর নাম ডাক হোক, এটাই আমার কামনা।

—তোমার কামনা অপূর্ণ থাকবে না। তুমি শুধু মন দিয়ে কাজ করে যাও।

রঘুনন্দন মনে মনে ভাবে, সে ব্রাহ্মণ-সন্তান। অন্যায় বিশেষ কিছু করেনি জীবনে। ভগবানের কাছে তার প্রার্থনা ফলবতী হবার সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে। বয়ঃকনিষ্ঠ হলে মনে মনে মুর্শিদকুলী খাঁকে সে আশীর্বাদ করতে পারত। আশীর্বাদ অবিশ্যি ব্রাহ্মণ হলে সবাইকেই করা যায়। তবু মুর্শিদ বিধর্মী। ওপরে যিনি বসে আছেন, যিনি যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী, সেই বিধাতাকে নিয়ে যত টানা-হেঁচড়া চলুক না কেন পৃথিবীতে, তিনি একই। সেই বিধাতার কাছে রঘুনন্দন কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানায় তার মালিক বাংলা উড়িষ্যার দেওয়ান এবং নাজিম সুবাদার যেন দীর্ঘায়ু হন।

ভূপতি রায় সবই শুনলো। রঘুনন্দনের ওপর দেওয়ানের এই সন্তুষ্টি তাকে আনন্দ দেয়। খাঁটি এবং গোঁড়া মুসলমান হলেও, গুণীর কদর বোঝে দেওয়ান সাহেব। তার অনেক কাজকর্মে হিন্দুরা মনঃক্ষুণ্ণ হলেও, একথা সে শুনেছে, আজিম-উস্-সানের আমলে এবং তারও আগে বাদশাহী দপ্তরখানায় সৈন্য বিভাগে, রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে হিন্দুদের কোন স্থানই ছিল না। দিশি মুসলমানরাও ছিল নিজ দেশে পরবাসী। সমস্ত বড় বড় পদে থাকত বিদেশ থেকে আগত হোমড়া-চোমড়া মুসলমানেরা। কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁ চিত্রটাই পাল্টে দিয়েছে। এখন হিন্দুরা জমিদার হতে সুরু করেছে। যদি আজ ইনি পরিপূর্ণ সুবাদার হতে পারতেন, তাহলে সব জমিদার এতদিনে হিন্দু হয়ে যেত। দেওয়ানখানাতে কোন বিদেশী বোধহয় থাকত না।

ভূপতি রায় জানে না, শুধু সেজন্যে নয়, হিন্দুদের ওপর নির্ভর করার আরও একটি গূঢ় কারণ রয়েছে। আর থাকলেই বা কি, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ তো পাচ্ছে তারা। রঘনন্দনের হাসি-হাসি মুখের দিকে চেয়ে তাই আনন্দ হয়। সে-ও তো দেওয়ান সাহেবের কৃপায় আজ ধনী, তার ভাই ধনী। তার স্ত্রী, বিশেষ করে বৌমার রূপ এখন ফেটে পড়ে। গাঁয়ের ওই বাড়িতে থাকলে কি এমন হতো? শকটে করে লোকজন নিয়ে বৌরা কি ওভাবে গঙ্গাস্নানে যেতে পারত? পৃথিবীতে বাস করেও মনে হয় স্বর্গে বাস করছে তারাই। আর এই সবের মূলে ওই গৌরবর্ণ শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত ব্যক্তিটি। রঘুনন্দন নিশ্চয় উঠবে—অনেক উঠবে। তাই তার ভাই রামজীবনও উঠবে।

কাজীর বিচার। হ্যাঁ কাজীর বিচার। এই বিচার নিরপেক্ষ হবে। নিষ্ঠুর হতে হলে আদৌ এসে যায় না। আর বিচার হবে ধর্মানুগ। এর মধ্যে কোন ফাঁক থাকা মুর্শিদকুলী খাঁর অপছন্দ। দেশে একটা গুজব খুব চালু আছে। মুর্শিদকুলী খাঁর একমাত্র পুত্র, ইসলাম ধর্মের পক্ষে যাকে ব্যভিচার বলে, তেমন কিছু করে ফেলেছিল। ফলে তার বিচার হয়, আর সেই বিচারের কাজী ছিল স্বয়ং মুর্শিদকুলী খাঁ। সপ্তাহে দুদিন সে বিচারে বসে। সেদিন নিয়মিত যে কাজী, তার ছুটি। বিচারে প্রমাণিত হলো দেওয়ান সাহেবের একমাত্র বংশধর অপরাধী। এতটুকুও দ্বিধা না করে মুর্শিদকুলী খাঁ তার মৃত্যুদণ্ড দিল এবং সেই দণ্ড সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী হলো। কথাটা বাংলা এবং উড়িষ্যার নিভৃত কোন গ্রামের অরণ্যের কাঠুরিয়াকে প্রশ্ন করলে সেও বলে দিতে পারবে। সারা দেশ তাই অপরাধ করার ব্যাপারে তটস্থ। পাপী তার পাপ কাজ করার আগে বেশ কয়েকবার ভেবে নেয়। তবে স্বভাব-পাপীদের কথা আলাদা।

কিন্তু মুর্শিদাবাদে যারা বাস করে এবং এর আগে ঢাকায় যারা অধিবাসী তারা কখনো দেওয়ান সাহেবের কোন পুত্রের কথা শোনেনি। তারা জানে তাঁর একমাত্র কন্যা, যে সুজার বেগম। কিন্তু দেশের জনসংখ্যার তুলনায় তারা নগণ্য। দেশের সবার মনের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে অন্যায় করলে মুর্শিদকুলী খাঁ নিজের একমাত্র বংশধর-কেও রেয়াৎ করে না।

তবে সত্যিই বিচার এখানে বড় কঠোর। কাজীও নির্বাচন করা হয় খুব বেছে বেছে। কাজী হলো সম্পূর্ণ স্বাধীন। তার ওপর দেওয়ান, সুবাদার তো বটেই, বাদশাহেরও প্রভাব বিস্তারের কোন ক্ষমতা থাকে না। বাদশাহ সোজাসুজি তাকে নিযুক্ত করেন।

চুণাখালীর জমিদারের ঘটনার কথা এখনো মাঝে মাঝে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে মুর্শিদাবাদের মানুষের মনে। আর সেই সঙ্গে মনে হয় কাজীমখেদ সরফ্ এর কথা। চুণাখালির জমিদার বৃন্দাবনের কাছে এক মুসলমান ভিখারী কিছু সাহায্য চায়। তার কথাবার্তা বা হাবভাবে যে কোন কারণেই হোক বৃন্দাবন বিরক্ত হয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়। সে তখন বৃন্দাবনকে জব্দ করার জন্য একটা ফন্দী আঁটে। বৃন্দাবনের বাড়ির রাস্তার মাঝখানে ইঁট দিয়ে পর পর সাজিয়ে সবাইকে বলে সেটা হলো মসজিদ। আর বৃন্দাবন যখনই পালকী করে সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে সে চেঁচিয়ে আজান দিতে শুরু করে। শেষে বৃন্দাবনের ধৈর্য থাকে না। একদিন সে ওই ইঁটগুলোর কয়েকটা ভেঙে ফেলে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে সেই ভিখারী গিয়ে কাজী মহমদ সরফ্-এর কাছে অভিযোগ করে। বিচারের কোনরকম জটিলতা নেই। ইসলাম ধর্মের ওপর এতবড় আঘাত সহ্য করার অর্থ হলো নিজেকে বেইমান প্রমাণ করা। বৃন্দাবনের হলো মৃত্যুদণ্ড।

মুর্শিদকুলী খাঁ তখন সবে কোরাণ নকল করা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছে। সেই সময় একজন দৌড়ে এসে খবর দেয় চুণাখালির বৃন্দাবনের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। খবরটা শুনে মুর্শিদকুলী রীতিমত বিচলিত হয়। সে মধ্যাহ্নের খানা না খেয়েই ঘোড়ায় চেপে ছোটে কাজী মহম্মদ সরফ্ এর কাছে। বৃন্দাবন অত্যন্ত ভাল মানুষ একথা সে জানে। তাছাড়া বৃন্দাবন টাকা পয়সা মিটিয়ে দেবার ব্যাপারে কখনো এতটুকুও গাফিলতি করে না। মানুষটা তার পরিচিত।

কাজী সাহেব দেওয়ান সাহেবকে দেখে বলে ওঠে—দেওয়ান সাহেব যে। এই অসময়ে। খানাপিনা হয়েছে তো?

—শুনলাম, বৃন্দাবনকে আপনি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন?

—হ্যাঁ খবরটা এর মধ্যেই রটে গিয়েছে দেখছি। বেশ খুশীর কথা। হ্যাঁ, মৃত্যুদণ্ড শুধু দিইনি, ওকে আমি নিজে দণ্ড দেব।

—আপনি নিজে? আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন?

—কথাটা আর একবার বলুন শুনি। ভুলে যাবেন না বাদশাহ আলমগীরের মত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি অনেক দেখেশুনে আমাকে এইখানে পাঠিয়েছেন। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন ইসলাম ধর্মের অমর্যাদা হচ্ছে এখানে। বাদশাহের দূরদৃষ্টি আছে, কি বলেন দেওয়ান সাহেব? আপনিও শুনি খুব ধর্মাত্মা ব্যক্তি।

মুর্শিদকুলী খাঁ নম্রভাবে বলে—একটা কথা বলব?

—হ্যাঁ বলুন, একটা কেন, হাজারটা বলুন। আজিমউদ্দীনের অনুপস্থিতিতে আপনি এখানকার মালিক। আজিম পাটনায় বসে আছেন—এদিকে আসতেও পারবেন না। আপনি খুব খুশী তাই না?

মুর্শিদের মনে হলো কাজীর চোখের মধ্যে তার প্রতি একটা ঘৃণার ভাব ফুটে উঠছে। তবু সেই দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে সে কাজীকে বলে—মৃত্যুদণ্ড ছাড়া বৃন্দাবনকে অন্য কোন দণ্ড দেওয়া যায় না?

কাজী বিদ্রূপের সঙ্গে বলে উঠে—লোকে শুনি আপনাকে বলে আদালত—গম্ভার। এই কি তার নমুনা? আপনি ওর হয়ে ওকালতি করতে এসেছেন? হ্যাঁ ওর মৃত্যুদণ্ড কিছুটা সময় পেছিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

—কতটা সময়?

—ওর উকিলকে বধ করতে যতটা সময় দরকার। তারপরই ওকে মরতে হবে।

মুর্শিদকুলী খাঁ ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করে। সে অশ্বারূঢ় হয়েও ভাবতে থাকে। বৃন্দাবনকে সে পছন্দ করত। অথচ ওই উন্মাদের জন্যে তাকে রক্ষা করা গেল না। হঠাৎ তার মনে হলো, আজিমউসমানও বৃন্দাবনকে খাতির করত। কোন সময়ে

কোন উপকার বোধহয় পেয়েছিল। সে ফিরে গিয়ে আহার গ্রহণের আগেই একটা পত্র লিখে এক দ্রুতগামী বার্তাবাহককে পাটনায় প্রেরণের বন্দোবস্ত করে।

কিন্তু আহার সমাপ্ত হবার আগেই তার কাছে খবর পেঁছে যায় কাজী নিজে হাতে তীর নিক্ষেপ করে বৃন্দাবনকে হত্যা করেছে, হত্যা ছাড়া কি? একে মৃত্যুদণ্ড বলা যায় না।

আজিম-উদ্দিনের কাছে অশ্বারোহী পাঠালো বটে মুর্শিদ কিন্তু চিঠির বয়ান পাল্‌টে দিল। লিখল যে, চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারল না।

পরে শুনেছিল মুর্শিদকুলী খাঁ যে বৃন্দাবনের হত্যা কাণ্ডে আজিম ক্রুদ্ধ হয়ে বাদশাহকে লিখেছিল, কাজী মহম্মদ সরফ্‌ ক্ষেপে গিয়েছে। বিনা অপরাধে সে স্বহস্তে বৃন্দাবনকে খুন করেছে।

ঔরঙ্গজেবের উত্তর সংক্ষিপ্ত ঃ—কাজী আল্লার হয়ে কাজ করেছেন।

বাদশাহের মন্তব্যই চূড়ান্ত।

কিন্তু যে বাদশাহ কাজীর কলিজার জোর, সেই বাদশাহ অতি স্বাভাবিক ভাবে পরিণত বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ঔরঙ্গাবাদে। বয়স একানব্বই। খবর শুনেই মহম্মদ সরফ্‌ পদত্যাগ পত্র পেশ করল মুর্শিদকুলী খাঁর কাছে। মুর্শিদের সনির্বন্ধ অনুরোধ তাকে টলাতে পারল না। সে মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করে চলে গেল। আর মুর্শিদকুলী খাঁ কল্পনা করতে লাগলো হিন্দুস্থানের তখ্‌ত্‌-তাউসে কে বসবে। কারও মুখ তার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠছে না। ওঠা সম্ভবও নয়। প্রতি বাদশাহের মৃত্যুর পর ঘন ঘন পট পরিবর্তন হয়। তাকে কিছুদিন চুপচাপ অপেক্ষা করতে হবে। তারপর যেই একটা স্থিতি আসবে, বোঝা যাবে মসনদে কে আসীন হবেন, সঙ্গে সঙ্গে বাংলা থেকে রাজস্ব আর উপঢৌকন রওনা হবে—যেখানে বাদশাহ থাকবেন। এবারে বোধহয় আর দক্ষিণ ভারত নয়—দিল্লী কিংবা আগ্রা।

ওদিকে মৃত বাদশাহের শবদেহ যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তাঁর ঈপ্সিত সমাধিস্থলে ঔরঙ্গাবাদের সমীপবর্তী ফকির জয়নাল আবেদীনের সমাধির পাশে। তখন তাঁর তিনপুত্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গিয়েছে।

মুর্শিদকুলী খাঁ জানত ফকির জয়নাল আবেদীনের প্রতি বাদশাহের কী গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বাদশাহ বরাবরই বলতেন, মৃত্যু তাঁর যেখানেই হোক, দেহখানা যেন তাঁর আশ্রয় পায় ফকিরের সমাধির পাশে। তাতেই তিনি শান্তি পাবেন। আর তাঁর ভগিনী জাহানারার মত তিনিও চাইতেন না যে সমাধির ওপর কোন প্রাসাদ উঠুক,

কোন স্তম্ভ উঠুক। অতি সাধারণ মুসলমানের কবরের মত তাঁর সমাধিস্থল যেন অনাবৃতেই থেকে যায়।

হালচাল দেখার জন্য মুর্শিদকুলী খাঁ চর পাঠায় বেশ কয়েকজনকে। সঠিক খবর জানতে হলে এছাড়া কোন পথ নেই। চালে এতটুকু ভুল হলে তার দেওয়ানীর সাধ জন্মের মত মিটে যাবে। সে এত বেশী গম্ভীর হয়ে থাকে যে কর্মচারীবৃন্দের তো কথাই নেই, বেগমসাহেবা অবধি স্বামীকে ঘাঁটাতে ভরসা পায় না।

শীত চলে গিয়েছে বলতে গেলে। সকালের দিকে সামান্য একটু ঠাণ্ডা ভাব থাকে। ভরা ফাল্গুন। গাছে গাছে কোকিল ডাকছে, এখানে ওখানে ফুলের সমারোহ। কিন্তু এই ফুল এই কোকিল প্রথম জীবনেও মুর্শিদকুলী খাঁর মনে দোলা দিতে পারেনি—এখন এই প্রবীণ বয়সে ওসব তার চোখেই পড়ে না কত বছর ধরে। তার ওপর বাদশাহের মৃত্যু তাকে জটিল হিসাবের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কী হতে পারে। কী হলে কী করবে সে। সে জানে বাদশাহ মনে মনে বুঝতেন, মুঘল রাজত্বের স্বর্ণযুগ অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন চলছে অবক্ষয়ের যুগ। তাই তিনি চাইতেন না তাঁর মৃত্যুর পর মসনদ নিয়ে পুত্রেরা লড়াই করে মুঘল যুগের পতন ত্বরান্বিত করুক। সেজন্যে তিনি জীবিত তিনপুত্রের মধ্যে গোটা হিন্দুস্তান মৌখিকভাবে তিনভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ মুয়াজিমকে দিয়েছিলেন কাবুল, লাহোর আর মুলতান, দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ আজিমকে দিয়েছিলেন হিন্দুস্থানের মধ্য ভাগ এবং কনিষ্ঠ কামবক্সকে দিয়েছিলেন দক্ষিণ ভারত।

কিন্তু ওসব কথার কথা। রক্তে যা আছে, বাপ-ঠাকুরদা যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন তার কি ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় আছে?

কিন্তু ওসব ভেবে কোন লাভ নেই মুর্শিদকুলী খাঁর। তার একমাত্র চিন্তা এক কোটির ওপর যে অর্থ পাঠিয়েছে বাদশাহকে সেই অর্থ এখন পথের মাঝখানে। সেটি আগ্রায় যাবে এবারে—বাদশাহের সেইরকমই হুকুম ছিল। কিন্তু সেই অর্থ যদি ঠিক তিন পুত্রের মধ্যে সঠিক জনের কাছে না পেঁছোয় তা হলে ঝামেলা হবে। এজন্যে একটা অস্বস্তি আছে মনে মনে।

সেই সময় একজন চর এসে খবর দিল বাদশাহের জীবিত পুত্রদের মধ্যে যিনি প্রিয় সেই মহম্মদ আজিম বাদশাহী শিবির দখল করে নিয়েছেন। সেই সঙ্গে সেখানকার ধনসম্পদ নিয়েছেন। তিনি মসনদে বসে নিজেকে হিন্দুস্থানের শাহানশাহ বলে ঘোষণা করে বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের সব কর্মচারীকে বহাল রেখে দিয়েছেন। আর ওদিকের ব্যবস্থা পাকা করে দিল্লীর দিকে অভিযান শুরু করেছেন।

মুর্শিদকুলী খাঁ একটু আশান্বিত হয়। তার প্রেরিত অর্থ আজিম শাহের হাতে পড়তে পারে। কিন্তু এই খবর পাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই কক্ষের বাইরে থেকে খিদমতগার এসে বলল, আর একজন চর ফিরে এসেছে খবর নিয়ে।

চরটির নাম হুসেন আলি। খুব বিশ্বস্ত এবং বুদ্ধিমান। মুর্শিদকুলী খাঁ

হুসেনকে ডেকে পাঠায় তার কক্ষে। হুসেন এসে কুর্নিশ করে। দেখে বোঝা যায় বেচারা বহুদিন ঠিক মত খায়নি, বিশ্রাম নেয়নি।

—বল হোসেন, কি খবর? আজিম শাহ কোথায়?

—তিনি এখনো দিল্লীর পথে শুনেছি। কিন্তু এদিকে আপনার অর্থ আজিম-উদ্দিন দখল করে নিয়েছেন।

—সে কি? বল কি?

—হ্যাঁ হুজুর।

—কোথায় তিনি দখল করলেন।

—আগ্রার কাছে।

—ওখানে গেলেন কি করে?

—বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুসংবাদ পেয়েই তিনি পাটনা ছেড়ে আগ্রার দিকে রওনা হয়েছিলেন। তিনি আগ্রা নগরী দখল করে নিয়েছেন পিতা শাহ আলম মহম্মদ মুয়াজিমের সুবিধার জন্যে। তবে কেল্লা নিতে পারেননি। চাবিই দেননি কেল্লার অধ্যক্ষ।

মুর্শিদকুলী খাঁ ভেবে নিয়ে বলে—কি বুঝলে?

—কেল্লার অধ্যক্ষ বকির খাঁ তো মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন আজিম শাহের ছেলের সঙ্গে। তিনি চান আজিম শাহ মসনদে বসুন। তাই যমুনার যত নৌকো ডুবিয়ে দিয়েছেন। তাতে আজিমউদ্দীনের কিছুটা অসুবিধা হলেও, দুর্গ ছাড়া আগ্রা নগরী দখল করে নিয়েছেন। বকির খাঁ কেল্লায় অবরুদ্ধ অবস্থায় গোঁ ধরে আছেন চাবি তিনি আজিমউদ্দীনকে দেবেন না—দেবেন ভাবী বাদশাহ আজিম শাহকে। খবর পেলাম যে আজিম এখান থেকে যে আট কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিলেন সুবাদার থাকার সময় তাও কাজে লাগাচ্ছেন।

হিন্দুস্থানের তখ্ত্-তাউস নিয়ে এত যে বিরাট আলোড়ন চলছে তার বিন্দুমাত্র স্পর্শ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সাধারণ মানুষের মনে কিংবা জীবনে লাগেনি। তারা বরাবর যেভাবে দিন কাটায় সেই ভাবেই কাটাচ্ছে। তারা ওসব বাদশাহ-টাদশাহকে চেনে না। সহরের মানুষ মাঝে মাঝে রূপকথার রাজা-মহারাজের মত বাদশাহের নাম শোনে। কিন্তু সবাই মনে রাখে না। তবে মুর্শিদকুলীর নাম বাংলা আর উড়িষ্যার নগরগুলির ফারসী জানা ব্যক্তিরা জানে। অন্য অনেকেও শুনেছে। কারণ আগে যে এক শায়েস্তা খাঁ ছিল তার রাজত্বের মত এই রাজত্বেও টাকায় আট মণ চাল এখনো পাওয়া যায়। যারা উচ্চ মধ্যবিত্ত অর্থাৎ মাসে অন্তত দেড় দুই'টা কাঁচা টাকা রোজগার করতে সমর্থ তারা মাসের প্রতিটি দিন পোলাও কালিয়া খেতে পারে। সুতরাং নিশ্চিন্তের জীবন।

কিন্তু তারা নির্বিকার থাকলেও দেওয়ানখানার মানুষেরা কিছু কিছু খবর পায়। তাই দেওয়ান সাহেবের মুখের দিকে তারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় মাঝে মাঝে।

সেই মুখ নিস্তরঙ্গ বলে মনে হয়। কোন রকম চাঞ্চল্য সেখানে নেই। এমনকি মুর্শিদকুলী খাঁ তার বসবাসের জন্য যে চেহেল সেতুন নির্মাণ করেছে, সেখানকার হারেমের মানুষরাও কিছু অনুভব করতে পারে না। পারে শুধু একজন। বেগমসাহেবা। বেগমসাহেবা জানে কিছুদিন থেকে স্বামীর রাতের ঘুমে বিঘ্ন ঘটছে, কোরান নকল করার সময় হাত অজ্ঞাতসারে মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে।

—এত চিন্তার কি আছে?

দুপুরের খানা খাবার সময় বেগমসাহেবার কথায় চমকে উঠে মুর্শিদ বলে—চিন্তা আবার কিসের?

—আমাকে লুকিয়ে কি লাভ। আমার তো মনে হয় একজনের কাছে অন্তত মনের বোঝা হালকা করলে ভালই হয়। আমি কি সবাইকে বলে বেড়াব।

—না, ঠিক তা নয়।

—দিল্লী আর আগ্রায় কি হয়েছে, অত ভেবে লাভ কি। একটা কিছু হবে।

মুর্শিদকুলী খেতে খেতে গম্ভীর হয়ে বলে—একটা কিছু যে হবে, আমিও জানি। কিন্তু হওয়ার মধ্যে প্রভেদ আছে। ধর, ঔরঙ্গজেবের দ্বিতীয় পুত্র আজিম শাহ্ বাদশাহ হলেন, তিনি কেমন মানুষ আমার জানা নেই। তবে তিনি নিজে কিছুদিন বাংলার সুবাদার ছিলেন। খুব অল্প কিছুদিনের জন্যে। তবু তিনি বুঝবেন আমি এখানে ভালো কাজ করছি। আমার মনে হয় আমি এই পদে বহাল থাকব। আর যদি বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আলম মহম্মদ মুয়াজিম মসনদে বসেন, তাহলে কি হবে বুঝতে পারছ?

—না। বুঝিয়ে দাও।

—এও বুঝিয়ে দিতে হবে? শাহ আলমের পুত্র আজিমউদ্দীন আমাকে সহ্য করতে পারেন না। আমাকে বাংলা থেকে তল্পিতল্পা গোটাতে হবে।

—গোটাতে হয় গোটাবে। অত ভাবনা কিসের? বাদশাহের নোকরি করছ, যেখানে পাঠাবেন, সেখানে যাবে। তোমার মত সব দিক দিয়ে কাজের মানুষকে তিনি ফেলে রাখবেন না কখনই।

মুর্শিদকুলী খাঁ নীরব থাকে। বেগমসাহেবা বুঝবে না, পৃথিবীর একটি প্রাণীও জানবে না, বাংলার প্রতি তার নাড়ীর টানের কথা। সেকথা প্রকাশ করলে যে সে ছোট হয়ে যাবে। তাছাড়া আর একটা গোপন বাসনা যে তার অন্তরে সুপ্ত নেই একথা অস্বীকার করতে পারে না। হিন্দুস্তানের মুঘল রাজত্ব খুব বেশিদিন অটুট থাকবে বলে মনে হয় না। তেমন হলে তার নাতি আসাদউদ্দীন হয়ত কখনো সরফরাজ উপাধি নিয়ে বাংলা আর উড়িষ্যায় নবাব হয়ে বসবে। কিন্তু একথাও বলা হবে না কাউকে। তবে বেগমসাহেবাকে কিছুদিন পরে বলতে পারবে।

এর পরে মোটামুটি পাকা খবর এলো। হুসেন আগের খবর দিয়ে আবার চলে গিয়েছে। তার ফেরার অনেক দেরী। ফিরেছে দেদার বক্স্। সে যে খবর দিল,

তাতে শুধু মুর্শিদকুলী খাঁ নয় এবারে বেগমসাহেবাও চিন্তিত হলো। পিতা অর্থাৎ ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আলম মহম্মদ মুয়াজিম হিন্দুস্থানের বাদশাহ হলেন। উপাধি নিয়েছেন বাহাদুর শাহ। তাঁর এই সাফল্যের জন্য সিংহভাগ দাবী করতে পারেন পুত্র আজিম। তিনি তাঁর নিজের আট কোটি এবং বাংলা থেকে পাওয়া লুঠ করা অর্থ দিয়ে বিরাট সৈন্যদল গঠন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গেও ছিল বাংলা থেকে নিয়ে যাওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ সৈন্যরা। এদিকে আগ্রার কেল্লায় অধ্যক্ষ বাঁকির খাঁ যখন শুনলো ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র আগ্রায় এসে উপস্থিত তখন সে স্বেচ্ছায় সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের চাবি তার কাছে পাঠিয়ে দিল। কারণ জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই অধিকার হিন্দুস্তানের বাদশাহ হওয়ার। কেল্লা দখলে আসায় শাহানশাহ শাহজাহানের বিপুল অর্থ-সম্পদ ও মণি-মাণিক্য শাহ আলমের হস্তগত হলো।

আজিম শাহের সঙ্গে যুদ্ধ হলো আগ্রার অদূরে জজুতে। আজিম শাহ পরাস্ত হলেন। তিনি এবং তাঁর দুই ছেলে বেদার বখ্‌ত্‌ এবং ভালাজা নিহত হলেন। পরে ঔরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র কামবক্‌সকে হত্যা করার পর বাহাদুর শাহ নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি স্বীকার করলেন পুত্র আজিমের তৎপরতা এবং যুদ্ধকৌশলে তিনি জয়ী হতে পেরেছেন। তাই তিনি, তাঁর সবচেয়ে প্রিয় দ্বিতীয় পুত্রকে নতুন উপাধি দেন আজিম-উস্‌-সান এবং বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় সুবাদার হওয়া সত্ত্বেও তাকে দূরে না পাঠিয়ে নিজের কাছে রাখলেন। মুর্শিদকুলীকেই তাঁর সহকারী হিসাবে কাজ চালিয়ে যেতে আদেশ দিলেন।

প্রাসাদের হারেমে বেগমসাহেবার মুখে হাসি ফুটল।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু-খাগড়ার প্রাণ যায় এটা ঠিক কথা। কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনে সুখ-দুঃখ প্রেম-প্রীতি রাগ-অনুরাগে সব কিছুর প্রবাহ অবিরাম চলতে থাকে। তাতে ছেদ পড়ে না। তাতে ছেদ পড়লে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি ব্যাহত হতে পারে। রাজারাজড়া তো মানুষের সৃষ্টি, আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন স্বয়ং বিধাতা।

তাই অট্টালিকায় বাস করেও মানবী নাফিসা উন্নিসা হাঁপিয়ে উঠেছে। বাতায়ন-পথে রোজ চেয়ে থেকে থেকে তার চোখ ক্লান্ত হয় শুধু শুধু। সে দেখে সৈয়দ রেজা খাঁ রোজই আসে, বহুক্ষণ থাকে। শেষে চলে যায়। আসাদ উদ্দীনকে সে অনুরোধ করেছিল লোকটা সম্বন্ধে খোঁজ নিতে। আসাদ ঠাট্টা করেছিল। সে কোন গুরুত্বই দেয়নি প্রথমে। তারপর নাফিসা যেমন কেঁদে ফেলল, সেদিন আসাদ

গম্ভীর হয়ে বলেছিল—ঠিক আছে খোঁজ নেব।

খোঁজ নিয়েছিল আসাদ। বলেছিল রেজা খাঁ দেওয়ান সাহেবের কাছে আসে রোজ। অনেকক্ষণ কাজকর্ম করে। দেওয়ান সাহেব কখনো কখনো ভূপতি রায়, কখনো বা দর্পনারায়ণকে ডেকে এনে ওকে কাজ শেখাতে বলে। ব্যাস্। এইটুকুই খবর এনেছিল আসাদ।

এতে তৃপ্ত হয়নি নাফিসা। আসাদের ওপর মনে মনে চটে আছে সে। কখনো যদি এতটুকু নেংরামি তার চোখে পড়ে কিংবা কানে যায় ছেড়ে দেবেনা তাকে। সোজা দাদুর কাছে গিয়ে বলবে। আজও সে বারবার বাতায়নের কাছে যায় আর ফিরে ফিরে আসে। নাঃ মানুষটা বড্ড দেরি করছে আজ। কী এমন কাজ। ও দেখতে অত সুন্দর হলো কি করে। সবচেয়ে ভাল লাগে ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গিটি। কী সুন্দর সোজা—যেন লেগে রয়েছে জীবটির সঙ্গে। বোঝা যায় অশ্বারোহণে খুবই পারদর্শী। শরীরের গঠনও চমৎকার। ওই বলিষ্ঠ চেহারা অথচ কোমরের কাছে সরু। বেশ দীর্ঘ—আমাদের চেয়ে অনেক লম্বা। আর আসাদ কিরকম নরম নরম মনে হয়—ও তেমন নয়। আসাদ অনেকটা আদর-খাওয়া কুকুরের মত। ও তেমন নয়।

আবার বাতায়নের কাছে যায়। নাঃ আজ আর ফিরবে না। এখানে থাকবে নাকি? কোন কক্ষে যদি রাতে বা নিদ্রা যায়, তাহলে বেশ হয়। মনে হবে এই চেহেল সেতুনে দুজনাই নিদ্রা যাচ্ছি।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। বিরক্ত হয়ে নাফিসা বেগম ডেকে ওঠে—গুল্।

সাড়া পাওয়া যায় না।

কোথায় গেল হতচ্ছাড়ি। গুলবিবি যেখানে বসে সেখানে গিয়ে দেখে সে নেই। মেজাজ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তার হুকুম না নিয়ে চলে গিয়েছে। এতবড় স্পর্ধা। সে আবার ডাকে। এবারও জবাব দেয় না কেউ। নাঃ, মা কাছে থাকলে এখন ওকে বিদায় করে দেওয়া যেত। দাদির কাছে এসব ব্যাপারে বলে লাভ নেই। ওদের ওপর দাদির একটু বেশী সহানুভূতি। কথায় কথায় তাড়িয়ে দিতে চায় না।

—গুল্।

ঘরে বাতি দেবার সময় হলো. তবু সে নেই? আশ্চর্য সেই সময় দেখতে পায় থামগুলোর আড়ালে আড়ালে একটি স্ত্রীমূর্তি এগিয়ে আসছে। সে চেয়ে থাকে। তার ঘরের কাছাকাছি এসে বুঝতে পারে, স্ত্রীলোকটি গুলবিবি। এত চুপি চুপি আসছে কেন? নাফিসা নিজেও নিজেকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়।

গুলবিবি আলগোছে পর্দা তুলে ঘরে ঢুকতেই নাফিসা ডাকে—এদিকে আয়।

গুলবিবি আর্তনাদ করল না বটে, কিন্তু না করলেও তার মুখখানা ভয়ে মড়ার মত হয়ে গেল।

—কোথায় ছিলি?

গুলবিবি লক্ষ্য করে নাফিসা চটলে যেমন চেঁচামেচি করে তেমন কিছু করল না।

তাতে তার ভীতি আরও বাড়ে। সে আমতা-আমতা করে আজেবাজে কথা বলে চলে। মাথামুণ্ডু নেই।

—সত্যি কথা বলবি।

—বাঘবন্দী খেলতে—

নাফিসা স্পষ্ট বুঝতে পারে, গুলবিবি মিথ্যা কথা বলছে। সে বলে—মিথ্যা বললি? ঠিক আছে কার সঙ্গে খেলছিলি বল। তাকে ডেকে আনব।

গুলবিবি কেঁদে ওঠে।

আর সেই সময় নাফিসার নাসারন্ধ্রে অতি সুমিষ্ট আর বহুমূল্য আতরের সুঘ্রাণ এসে লাগে। এ যে খুব পরিচিত আতর। কোথা থেকে এলো এই গন্ধ। সে গুলবিবির আর একটু কাছে সরে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, তারই দেহ থেকে আসছে। নাফিসার মুখ রাগে বিকৃত হয়, তার চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে।

সে চেঁচিয়ে বলে—কোথায় গিয়েছিলি শয়তানী।

সভয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে গুলবিবি বলে—বাঘবন্দী।

—বাঘবন্দী? আমাদের আতর তোর গায়ে এলো কি করে? এতদিনে সব বুঝতে পারলাম। মাঝে মাঝেই তোকে ডেকে পাই না, তোকে ডাকলেই খোজা রহিম ছুটে আসত কোথা থেকে বুঝতে পারতাম না। ওর আমার ঘরের কাছে থাকার কথা নয়। এতদিনে বুঝলাম রহিমও রয়েছে এর মধ্যে। ঠিক আছে। আমি তোদের দুজনকে রাস্তার চৌমাথায় মেরে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করছি। আমাকে চিনিস না। মুর্শিদকুলী খাঁকে চিনিস না।

সেই সময়ে রহিম এসে উপস্থিত হতে তোপের মুখে পড়ে। নাফিসা চিৎকার করে ওঠে—খোজা হয়েছে বলে, ভেবেছ সাত খুন মাফ? কালই তোমাকে শূলে চড়াব বেইমান, দুর্জনা ষড়যন্ত্র করে আমার ভাই-এর সর্বনাশ করছ।

খোজা রহিম গুলবিবি নয়। কত ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গিয়েছে তার ওপর দিয়ে। আজকের ঝড়ে সে গুলবিবির মত দিকভ্রান্ত অসহায় হয়ে পড়ল না। আসলে সে মুর্শিদাবাদে এসেছে মুঘল হারেম থেকে। বাদশাহ ঔরঙ্গজেব নিজে যখন তাকে মুর্শিদকুলী খাঁর কাছে পাঠান তখন মুর্শিদকুলী হায়দ্রাবাদের দেওয়ান। সে কি আজকের কথা? তখন কতই বা বয়স হয়েছে তার? বড় জোর বাইশ। তার আগে দশটি বছর সে মুঘল হারেমে ছিল। সবার প্রিয়পাত্র ছিল। বেগমদের অতিরিক্ত প্রিয় হয়ে ওঠায় বাদশাহ তাকে হায়দ্রাবাদে পাঠিয়েছেন। একবার পরীক্ষা করিয়ে নেন সত্যিই সে খোজা কিনা।

গুলবিবির দিকে আড়চোখে চায় রহিম! ভূতলে লুণ্ঠিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে ঝড়ে বিধ্বস্ত লতার মত। অথচ আড়াল থেকে দেখেছে আসাদউদ্দীনের শয্যায় তার বাহুবন্ধনে গুলবিবির সম্পূর্ণ অন্য এক রূপ। মেয়েটার নিশ্চয় ক্ষমতা আছে, নইলে আসাদউদ্দীন এর কথাই বারবার বলেন কেন। এর চাহিদা এত বেশী বলেই

ধরা পড়ে গিয়েছে। ঠিক আছে, তার নামও খোজা রহিম। মুঘল হারেমের অনেক জেনানা তার দাড়িতে হাত বুলিয়ে দিয়ে পরখ করেছে, তার মধ্যে কোন উত্তেজনার সৃষ্টি হয় কিনা। সামনের এই মেয়েটি তো ছেলেমানুষ।

নাফিসার অগ্নিবর্ষী দৃষ্টির দিকে চেয়ে সে শান্ত কণ্ঠে বলে—মনে হয় কালকের মধ্যে সৈয়দ রেজা খাঁ সম্বন্ধে কিছু খবর আপনাকে দিতে পারব। পাকা খবর।

নাফিসার ক্রোধ নিমেষে কোথায় মিলিয়ে যায়। সে বলে ওঠে—ঠিক? ঠিক বলছ তো? এই শেষ সুযোগ কিন্তু।

—খোজা রহিম বেঠিক কিছু বলে না।

—বেশ। যাও তাহলে।

—গুলবিবি আমাকে অনেক সাহায্য করে। ওর কোন ক্ষতি হবে না তো?

—তোমাকে সাহায্য করে? আমার ভাই-এর সর্বনাশ করার জন্যে? মাকে বলে দেব। মা তোমাকে রেখেছিল ভাইকে আগলে রাখতে।

—আমি আগলে রাখি। কিন্তু বয়স বলে কথা। আপনার ভাই-এর তো আমার অবস্থা হয়নি। তাঁর সাধ আছে, যৌবন আছে। এতে তাঁর ক্ষতি হবে না। ভালই হবে। আমি যদি বেশী আগলাতে চেষ্টা করতাম. উনি বাইরে গিয়ে কিছু করতেন। লোকে জানত।

নাফিসা ভাবে, খোজা হলে কি হবে, রহিমের মগজে যথেষ্ট বুদ্ধি। যা হয় হোক, ভাই-এর ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব তার নয়, দাদুর। এসব নিয়ে মাথা খারাপ করে কোন লাভ নেই। তার চাইতে নিজের স্বার্থ দেখাই ভাল।

সে বলে—গুলবিবি এ যাত্রা বেঁচে গেল।

রহিম সন্তুষ্ট হয়ে কক্ষ ত্যাগ করে। আর গুলবিবি ধীরে ধীরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে।

—দাঁড়া।

গুলবিবি মাথা নীচু করে দাঁড়ায়।

—এই আতর তুই নিজে লাগিয়েছিস?

গুলবিবি মাথা নাড়ে।

—তবে? আসাদ?

—হুঁ।

—খামখা লাগিয়ে দিল?

গুলবিবি মাথা ঝাঁকিয়ে জানায়—না।

—তুই বোবা নাকি? কথা বলতে পারিস না? কেন লাগিয়ে দিল?

—আমরা বাঁদী। গায়ে খারাপ গন্ধ থাকে—তাই।

নাফিসা স্তব্ধ হয়ে শোনে। বেশ কিছুক্ষণ পরে বলে—কদিন গিয়েছিস?

গুলবিবির প্রতিদিনের কথা সবিস্তারে মনে গাঁথা হয়ে আছে। সবশুদ্ধ সাতদিন

সে গিয়েছে। কিন্তু সেকথা বলা যায় না। এখনো সে জানে না, সত্যিই বেঁচে গিয়েছে কিনা। রহিম মিথ্যা আশ্বাস দেবে না। কারণ সে-ও এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। তবে রহিমের মালিক তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করবেন অন্তত। পারবে কিনা বলা যায় না। দেওয়ান সাহেব খুব কড়া এ ব্যাপারে। তবু—

—বললি না? কদিন গিয়েছিস!

—দুদিন।

চিৎকার করে ওঠে নাফিসা—মিথ্যে বলবি না।

—না না, আজ নিয়ে তিন দিন।

—তি-ন দি-ন। কতক্ষণ থাকিস?

—ওর যতক্ষণ ইচ্ছে।

—কার ইচ্ছে?

—আপনার ভাই-এর।

—আমার ভাই-এর ইচ্ছা? শয়তানী কোথাকার। আর একদিন যদি জানতে পারি, তোকে আমি পুঁতে ফেলব। যাঃ, সামনে থেকে জাহান্নমে যা।

গুলবিবি চলে গিয়ে পর্দার ওপাশে তার সেই অপেক্ষা করার স্থানটিতে গিয়ে হাঁটুর ভেতরে মাথা গুঁজে অঝোরে চোখের জল ফেলে। আসাদউদ্দীনের আতরের গন্ধ, তার পরশের সুখস্মৃতি মনেও স্থান পায় না। নিজে যে সে হতভাগিনী সেই কথা মর্মে মর্মে অনুভব করে। ঈশ্বর কেন যে তাকে এ-যাত্রা বাঁচিয়ে দিলেন বুঝতে পারে না।

এদিকে খোজা রহিম পরের দিনই সৈয়দ রেজা খাঁ সম্বন্ধে পাকা খবর নিয়ে নাফিসার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়।

—কি খবর রহিম?

—সব জেনে এসেছি। মুঘল হারেমে কোন ভাল খবর জানালে বেগমরা বখশিস দিতেন। এ বান্দা অনেক পেয়েছে।

নাফিসার কৌতূহল তীব্রতর হয়। বলে—তাড়াতাড়ি বলে ফেল। বখশিস দেবার মত হলে দেব।

রহিমের একটা মস্ত গুণ যে সে কখনো দাঁত বের করে হাসে না। সে যত লঘু কথা বলুক, যত রসিকতা করুক, তার মুখে হাসি দেখা যায় না কখনো। সে জানে, হাসি পছন্দ করে না হারেমের জেনানারা। আবার মুখখানা খুব কঠোর করে রাখলেও বদনাম হয়। রটে যায়, লোকটা খুন করতে পারে। সুতরাং মুখে হাসিও থাকবে না, আবার কঠোরতাও ফুটে উঠবে না, এমনভাবে থাকতে হবে। অর্থাৎ পোষা খরগোস কিংবা কাকাতুয়ার মত। তবে বেগমরা যদি চায় তাহলে সামান্য একটু ফিকে হাসির মত কিংবা এক পলকের জন্যে মুখের ঠোঁট থেকে গাল পর্যন্ত

সীমায় আবদ্ধ রেখে মাখাতে হবে। তার বেশী কখনই নয়। তাহলে সম্ভ্রম থাকবে না। হ্যাঁ, খোজাদেরও সমীহ করে চলে জেনানারা। আসলে জেনানারা তো পুরুষ নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে একটু পুরুষাকার দেখাতে হয়। পুরোপুরি পুরুষ না হয়েও, সেটা খোজারা ভালই জানে। তারা খোজা পরম্পরায় শিক্ষা নেয়। নোকরি ছেড়ে যাওয়া প্রবীন খোজারা ছেড়ে যাবার আগে, খোজাগিরি করার আঁতঘাত শিখিয়ে দিয়ে যায় নতুনদের। এইভাবে চলে আসছে শিক্ষাগ্রহণ।

রহিম বোধ হয় মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। নাফিসা অস্থির হয়ে বলে ওঠে—চুপ করে আছো কেন ? তুমি কি ভাবছ বখশিস্ পাবে না ?

রহিম সালাম ঠুকে বলে—না। ওকথা আমাদের ভাবতে নেই। আমরা শুধু আল্লার বান্দা নই, আপনাদেরও বান্দা।

—তবে বলে ফেল।

—খুব গোপন খবর। আপনার আনন্দ হওয়ার মত খবর। তাই ভাবছি কথাটা ফাঁস হয়ে যাবে না তো ? দেওয়ান সাহেব চান না, এখনি কেউ জানুক।

এখানে রহিম খবরটাতে একটু গুরুত্ব আরোপ করার জন্য সামান্য ঘুরিয়ে বলল। আসলে দেওয়ানখানার দুচার জন ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে। নইলে সে জানতো কি ভাবে ?

—আমার মুখ বন্ধ থাকবে। তোমার কোন বিপদ হবে না।

—সৈয়দ রেজা খাঁকে দেওয়ান সাহেব, বাংলায় তাঁর সহকারী দেওয়ান করে নেবেন কদিন পরে।

—ও তাই নাকি ? ভাল সংবাদ। কিন্তু তাতে আমার আনন্দ হওয়ার কি আছে ?

—আর, দেওয়ান সাহেব ওঁর সঙ্গে আপনার সাদি ঠিক করে রেখেছেন। কদিন পরেই হবে।

নাফিসা উত্তেজিত হয়ে কক্ষের মধ্যে কয়েকবার ঘুরপাক খেয়ে রহিমের কাছে এসে বলে—রহিম ! সত্যি ?

—হ্যাঁ।

নাফিসা তার গলা থেকে মতির মালা খুলে নিয়ে রহিমের হাতে দেয়।

—এ জিনিষ আমি রাখব কোথায় ? ধরা পড়লে শূলে দেবে। আপনি ফিরিয়ে নিন।

—কেউ কিছু বলবে না। আমার নাম বলবে।

রহিম কুর্নিশ করতে করতে পেছোতে থাকে। সেইভাবে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। আর নাফিসা চরকীর মত বন্‌বন্ করে কিছুক্ষণ ঘুরে নিয়ে চিৎকার করে ডাকে—গুল্।

গুলবিবি পর্দার আড়াল থেকে সব কিছুই দেখছিল এতক্ষণ, কিন্তু দূরত্বের জন্যে কথোপকথন তার কর্ণগোচর হচ্ছিল না। সে বুঝে নিয়েছে রহিম রেজা খাঁ সম্বন্ধে

বেশ ভাল খবর এনেছে। নইলে দেওয়ান সাহেবের নাতনি অত দামী মালাটা খোজাকে কখনো দিত না। ওই মালার কদর খোজা কি বুঝবে? তার ঘরে কি যুবতী ঘরণী আছে? অপাত্রে দান। রহিমকে সে জিজ্ঞাসা করবে মালাটা নিয়ে কি করবে সে।

নাফিসার ডাক শুনে গুলবিবি ছুটে আসে। নাফিসা তাকে দেখে ঈষৎ হেসে বলে—মাফ্।

মাফ্?

—হ্যাঁ হ্যাঁ মাফ্।

গুলবিবি বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

—বুঝলি না? তোকে আমি মাফ্ করে দিলাম এবারের মত। কিন্তু আর কখনো যদি গায়ে আতরের গন্ধ পাই তাহলে কুত্তাকে দিয়ে খাওয়াব তোকে।

প্রাণের ভয় কেটে যেতেই গুলবিবির মন খারাপ হয়ে যায় মালাটার জন্যে। কী সুন্দর মালা—কত দামী। সে রহিমকে এক সময় পেয়ে যায় কাছাকাছি।

বলে—দেখলাম, মালাটা তোমাকে দিয়ে দিল।

—জানি। তোমাকে দেখেছি। আমার চোখ সব দিকে থাকে।

—কি করবে এখন মালাটা দিয়ে?

—একটা কিছু করব। ভেবে দেখি।

—ঘরে তো আওরত নেই। আমাকে দাও!

রহিম কিছুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলে—দিতে পারি, যদি আম আওরত হও।

গুলবিবি বহুদিন পরে খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে—নিজের গ্রামে যেভাবে হাসত।

—হাসলে যে।

—তোমার আওরত হতে, ধর, রাজী হলাম। আমাকে নিয়ে তুমি করবে কি? আমাকে মা করে দিতে পারবে।

খোজা রহিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—না গুলবিবি, আল্লার দান মানুষ কেড়ে নিয়েছে। আমার ছেলের মা তুমি হতে পারবে না। কিন্তু অনেক খোজার ঘরে নারী থাকে তারা দোস্ত হয়, তারা সঙ্গী হয়। জীবন বড় একঘেঁয়ে বিবি—বয়স বাড়লে পরে নাকি একা একা হাঁপিয়ে উঠতে হয়। তখন আমরা দুজন দুজনার সঙ্গী হব। খোজারা সবাই প্রায় ধনী। আমিও কম ধনী নয়। আমার ইচ্ছা মুর্শিদাবাদে থেকে যাব। রাজী থাকোতো বল।

—কিন্তু তুমি জান আমি কি করেছি।

—তাতে কি? তোমার ক্ষমতা আছে, তাই করেছ। ওতে আমি কিছু মনে করি না। তবে আমার ঘরে একবার গেলে ওসব চলবে না। কোন পুরুষের সঙ্গে

মেলামেশা করা চলবে না। সবাই যেমন বোরখা পরে থাকে তেমনি পরবে। লোকে তাল খুঁজবে। কারণ তারা জানবে আমি খোজা। কিন্তু তুমি এতটুকুও আমল দিতে পারবে না। বল রাজী আছ?

—আমি মা হবো না?

—রহিম বলে—তবে দেখছি মালাটা আর পেলে না। এখানেই থেকে যাও। মা হবার সাধ চিরজীবনের মত ঘুচে যাবে। আমি বড়জোর কোন শিশুকে এনে তোমার কোলে ফেলে দিতে পারি। তাকে মানুষ করবে। অমন শিশু কত পাওয়া যায় দু-একশো কড়ির বদলে। এমনিতেই দিয়ে দিতে চায় কত লোক।

গুলবিবির চোখে স্বপ্ন মাখিয়ে দেয় রহিম। সে ছোট একটা শিশুকে মানুষ করে তুলবে মায়ের মত, শুধু তাকে বুকের দুধ দিতে পারবে না। তাতে কি হলো? তার একটা ঘর থাকবে। আর থাকবে বিশ্বস্ত বলিষ্ঠ রহিম। রহিম আশ্রয়দাতা হিসাবে একটুও খারাপ নয়।

সে বলে—ও মালায় আমার দরকার নেই রহিম। আমি যদি যাই এমনিতেই যাব তোমার ঘরে।

রহিমের চোখেও আলোর দ্যুতি—সত্যি বলছ গুলবিবি?

—হ্যাঁ, কিন্তু কিভাবে?

—ঠিক বলেছ। কিভাবে? আমি আজ থেকে চেষ্টা করব। তুমি শুধু দেখো তোমার জীবন যেন বিপন্ন না হয়। আসাদউল্লার কাছে তোমাকে আর যেতে দেব না। থাকতে পারবে?

—পারব, যদি আমাকে একটা ছেলে কিংবা মেয়ে দাও।

—দেবো। নিশ্চয় দেব। জান, গুলবিবি তোমার ওপর হঠাৎ আমার একটা টান এসে গেল। তোমাকে আমি খুব যত্নে রাখব। বুক দিয়ে রক্ষা করব।

—জানি রহিম। আমিও তোমার সেবা করব।

খবরটা বেশী জানাজানি হওয়ার আগেই রেজার সঙ্গে নাফিসার সাদি হয়ে গেল। প্রাসাদ থেকে বিদায় নিলেও কাছাকাছি একটি ভাল প্রাসাদে সে চলে গেল রেজার সঙ্গে। আর তাদের দেখা শোনা করার জন্যে মুর্শিদকুলী খাঁ ভার দিল নাজির আহমেদ বলে একজনের ওপর। নাজির লোকটি, অতি সাধারণ ঘরের। কোনরকমে মুর্শিদকুলীর রাজস্ব আদায়ের ভার সে পেয়ে যায়। তার পর থেকেই সে মুর্শিদকুলী খাঁর নজরে পড়ে যায়। দেওয়ান সাহেব দেখে যে নাজির একজন অত্যন্ত কুশলী আদায়কারী। তার এলাকায় বলতে গেলে রাজস্ব একটুও বাকী পড়ে না। মুর্শিদ তখনো জানত না এই কর আদায়ের ব্যাপারে নাজির আহমেদ কতটা হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। যখন জানলো তখনো ভ্রুক্ষেপ করল না। বরং মনে মনে তার তারিফ করল।

তাকে কিছু সৈন্য সামন্তের ভারও দিয়ে দিল। এই আস্কারা পেয়ে নাজিরের বিকৃত মানসিকতার প্রকাশ পেতে শুরু করল। সে মানুষকে শাস্তি দেওয়ার নামে তাকে যন্ত্রণা দেওয়ার নব নব উদ্ভট কলাকৌশল উদ্ভাবন শুরু করল।

সেই নাজির আহমেদ মুর্শিদকুলী খাঁর নয়নের মণি হয়ে উঠেছিল বলে নাত-জামাই সৈয়দ রেজা খাঁর সঙ্গে তাকে দিয়ে দিল। সৈয়দ রেজা বাংলায় তার সহকারী দেওয়ান। সুতরাং কীভাবে টাকা আদায় করতে হয় নাজিরের কাছে সে শিখতে পারবে।

নাফিসার সাদিতে তার বাবা মাও এসেছিল উড়িষ্যা থেকে। পুরোনো জায়গায় এসেই সুজাউদ্দিন ছট্ফট্ করছিল। কিন্তু খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারেনি। বয়সও বেড়েছে। তাছাড়া এক রূপসী রমণীকে সে সাদি করবে বলে মনে মনে স্থির করে ফেলেছে। ফিরে গিয়েই তাকে ঘরে আনবে। আভাসে ইঙ্গিতে জিন্নৎ-কে বেশ কয়েকবার শোনানো হয়ে গিয়েছে। তাকে বলেছে, তার বয়স হয়েছে। মেয়েরা হৈ হুল্লোড় তো বেশীদিন সহ্য করতে পারে না। তার ওপর কদিন পরেই আবার নাতির মুখ দেখবে হয়ত। তাই জিন্নৎকে সে মিছিমিছি জ্বালাতন করতে চায় না যখন তখন। সে তার মত বড় বেগমসাহেবা হয়ে ধীর স্থির শান্ত জীবন যাপন করুক। স্বামীকে ছেড়ে দিক তার পছন্দ মত আর একবার সাদি করতে। সবাই তো একই সঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় শান্ত হয়ে যায় না—বিশেষ করে পুরুষেরা।

এতকথা সুজাউদ্দিন কখনই ইনিয়ে বিনিয়ে বলত না জিন্নৎকে, যদি না তার বাবা মুর্শিদকুলী খাঁ হতেন। কারণ উড়িষ্যার দেওয়ানী তারই মর্জির ওপর। কলমের এক খোঁচায় তিনি ওই পদ থেকে তাকে অপসারিত করতে পারেন। ওদিকে রেজা নামে ছেলেটা, যে তার জামাতা হলো, সে বাংলার সহকারী দেওয়ান। আসাদকেও ওই ধরনের একটা পদ দেবার কথা শোনা যাচ্ছে। সুতরাং জিন্নৎ বেগমের মূল্য কোন-দিনও কমবে না।

মীর্জা রেজাও যে তার মত সৈয়দ বংশের, এরজন্যে সুজাউদ্দিনের আনন্দ হলো। মেয়েটা জলে পড়ল না তাহলে। নিজের সাদি সম্বন্ধে তার নিজের মনের খুঁতখুঁতানি যত না থাক, শুনতে হয়েছে তার চেয়েও বেশী। দাক্ষিণাত্যে থাকার সময় অহরহ শুনেছে। এখানেও আগ্রা দিল্লী কিংবা দক্ষিণভারত থেকে যে সব উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী আসা-যাওয়া করেছে তারাও বলেছে। সে ওসব গায়ে মাখেনি। সে জানত মুর্শিকুলী খাঁ বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের পেয়ারের লোক—তার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। সুতরাং তার মেয়েকে সাদি করলে এই বিদেশ বিভূঁই এ এসে সে জলে পড়বে না। পড়েও নি। তার সঙ্গে পারশ্য আরব, তুরস্ক থেকে আরও কতজনা এসেছিল, কোথায় মিলিয়ে গেল সবাই। তাছাড়া 'সৈয়দ' শব্দটার গুরুত্ব যথেষ্ট। সেইজন্যে মুর্শিদকুলী খাঁ জিন্নৎ-এর সঙ্গে তার সাদি দেবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। নিজের বংশের তো তেমন ভিত্তি নেই। বাহাদুর বটে তার শ্বশুর আর এক সৈয়দকে ঠিক জুটিয়ে নিল।

নাফিসার সাদি যতটা জাঁকজমকের সঙ্গে হওয়ার কথা সবাই ভেবেছিল, ততটা হলো না। মুর্শিদকুলী খাঁ জাঁকজমক আদৌ পছন্দ করে না। তবু নাফিসা আর জিন্নৎ এর মুখ চেয়ে কিছুটা যাতে আড়ম্বর হয়, সেই অনুমতি দিয়েছিল। এই সাদিতে সে ফারুকশিয়ারকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। যদিও জানত সে আসবে না এবং আসা সম্ভবও নয়। ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদের রাস্তা কম দূর নয়। তাছাড়া সে মুঘল পরিবারের কেউ নয়, মুঘল বাদশাহের অধীনে এক কর্মচারী মাত্র। এখন ফারুকশিয়ারের পিতামহ হিন্দুস্থানের বাদশাহ এবং এই বাদশাহ হওয়ার পেছনে সব চেয়ে বেশী যাঁর অবদান তিনি হলেন তাঁরই পিতা আজিম-উস্-সান্। তবু নিমন্ত্রণ তাকে করতে হয়েছে। না করলে, বিরাগভাজন হতে পারত মুঘল পরিবারের।

সাদির পরের দিন পরিবারের সবাইকে নিয়ে বসে ছিল মুর্শিদকুলী খাঁ। এই সুযোগ তার জীবনে প্রথম এলো। পারস্য দেশ থেকে এসেছিল শুধু বেগমসাহেবাকে সঙ্গে নিয়ে। এখন সেই পরিবার কত বড়। আরও কত বড় হবে। সুজাউদ্দিনের যত দোষই থাকুক, সে সামনে এসে দাঁড়ালে চমৎকৃত না হয়ে পারা যায় না। এটাই বোধ হয় তার ওইসব বদগুণের জন্য দায়ী। আজ সুজাকে তার ভালই লাগছিল। জিন্নৎকেও আজ হাসি হাসি দেখতে লাগছে। এতেই তো সুখ। আর একটা সুখ হচ্ছে, সে আর একজন সৈয়দকে তার পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে পারল। কিন্তু এই সুখ আর সাফল্যের পেছনে যে একটা ব্যর্থতার বড় কাহিনী রয়েছে, সেকথা, চাপা মানুষ বলেই, মুর্শিদকুলী খাঁ কাউকে বলেনি—বেগম সাহেবাকেও নয়।

সৈয়দ রেজা খাঁয়ের সঙ্গে নাফিসার সাদি স্থির করার আগে সে আরও একজনের সঙ্গে চেষ্টা করেছিল। সাধারণত মুর্শিদকুলী খাঁ এ-পর্যন্ত এতবেশী প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল যে সে নিজেই বাংলার কোথায় কাকে ফৌজদার কিংবা অন্য কোন পদে বহাল করতে হবে ঠিক করত। বাদশাহ কচিৎ কখনো কাউকে ওখান থেকে নিয়োগ করে পাঠাতেন তাতে মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও মুখে কিছু বলতে পারতেন না মুর্শিদকুলী খাঁ। তাই বহুখ্যাত এবং পরম সম্মানীয় আমীর খাঁয়ের পৌত্রকে যখন পাঠানো হলো তখন প্রথমে মনে মনে বিরক্ত হলেও তাকে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হলো। অভ্যর্থনা তাকে করতেই হবে—যে সে ব্যক্তি নয়, আমীর খাঁর পৌত্র সৈফ খাঁ।

কিন্তু অভ্যর্থনা করতে এসে সেই তরুণকে দেখে মন গলে গেল মুর্শিদকুলী খাঁর। একেই বলে বড় ঘরের ছেলে। যেমন চেহারা, তেমনি কথাবার্তা আর আদব-কায়দা। এক কথায় মনকে আকৃষ্ট করে নেয়। সে সঙ্গে সঙ্গে তাকে পূর্নিয়ার ফৌজদার করে পাঠায়। কিছুদিন পরেই খবর পেল সৈফ খাঁ বীরনগরের জমিদার বীরশাকে জমিদারী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তারপর শুনলো আরও অনেক জমিদারকে কয়েদ করেছে। এইভাবে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছে। এসব শুনে মনে মনে মুর্শিদকুলী খাঁ যখন তারিফ করছে, সৈফ খাঁ তখন দেখল পূর্নিয়া থেকে পাওনা যা পেল, গত বছরের

তুলনায় এমন কিছু বেশী নয়। অর্থাৎ বাকীটুকু সৈফ খা নিজে রেখে দিয়েছে। তা হোক, বড় ঘরের বড় বড় ব্যাপার। সে যথারীতি সৈফ খাঁ কে মুর্শিদাবাদে নিমন্ত্রণ করল এবং মনের ইচ্ছাটা তার কাছে প্রকাশ করল। অর্থাৎ নাফিসাকে সে যদি গ্রহণ করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সৈফ খাঁ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। বলল, তার পরিবারের পক্ষে এটা সম্ভব নয়।

সৈফ খাঁ প্রত্যাখ্যান করেছিল বলেই রেজা খাঁকে নির্বাচিত করতে হলো। অবিশ্যি রেজা খাঁয়ের বংশ ভাল। কিন্তু সৈফ খাঁ যেন আকাশের চাঁদ। দেখাই যায় শুধু, হাত দিয়ে ধরা যায় না। শেষ পর্যন্ত ধরা গেলও না। তবে এই ব্যর্থতার কাহিনী বাইরের কাকচিলও জানে না। হ্যাঁ, সৈফ খাঁ অবশ্য জানে। কিন্তু এসব কথা তার মুখ থেকে কখনো বের হবে না। তার পিতামহ আর কেউ নন স্বয়ং আমীর খাঁ। তবু রেজাও ভাল। চটপটে ছিমছাম, বংশের তুলনা নেই! আবার আসাদ সাদির পরে বলল, নাফিসার আগে থেকেই নাকি একে পছন্দ। শুনে থ' হয়ে গিয়েছিল মুর্শিদকুলী। কি করে পছন্দ হলো? না, বাতায়ন পথে দেখত রোজ নাকি। সেই থেকে হারেমের কয়েকটা জানলা বন্ধ করে দেবার হুকুম দিয়েছে সে। এ সব অনাচার চলতে দেওয়া যায় না।

সৈফ খাঁকে ওপর থেকে চাপানো হয়েছিল। প্রথমে বিরক্ত হলেও পরে তার সঙ্গে একটা সুহৃদসুলভ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল মুর্শিদকুলী খাঁর। খাতির করে তার উপাধিও দিয়ে ফেলেছিল সে। উপাধিটা হলো জেন্‌বক্‌স্‌।

কিন্তু তাই বলে ঘন ঘন এভাবে বাদশাহের কাছ থেকে নিযুক্তি নিয়ে বাংলায় লোক এলে, কাঁহাতক সহ্য করা যায়? বাদশাহ তো এখন ঔরঙ্গজেব নন। বর্তমান বাদশাহ বাহাদুর শাহ তাকে কখনই পছন্দ করে না। কারণ তার সঙ্গে তাঁর পুত্র অজিম-উস্‌-সায়নের সম্পর্ক ভাল ছিল না। তবু ওঁদেরও অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। অর্থ কমলে চলবে না, অথচ কাজে হস্তক্ষেপ চলবে—দুটো জিনিষ একসঙ্গে চলতে পারে না। আজিমেরও কথাটা বোঝা উচিত বাস্তবতার খাতিরে। তাকে যতই অপছন্দ করুক তার প্রেরিত টাকার পরিমাণকে অপছন্দ করে না নিশ্চয়।

তবু বাদশাহের এক উজিরের পৃষ্ঠপোষকতায় আর এক উচ্চবংশীয় যুবককে পাঠানো হলো। নাম তার সৈয়দ আবু তোরাব। এ আর কিছুই নয়, ওদের খাইয়ে পরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা। নইলে স্থানীয় মানুষদের দিয়ে যে বাংলার কাজকর্ম খুব ভালভাবে চলছে সেকথা কি বাদশাহ জানেন না? ভালই জানেন।

আবু তোরাবের প্রতি মৌখিক যতটুকু ভদ্রতা সেটুকু দেখাল বটে কিন্তু অন্তর হিম-শীতল মুর্শিদকুলী খাঁর। এও তো এসেছে লুঠতে—সবাই যা করে। নইলে রাজধানীতে কিংবা নিজের দেশে মর্যাদা থাকে না। মনে মনে ঠিক করে নেয় মুর্শিদকুলী খাঁ, কোনরকমের সহযোগিতা আর নয়। বরং যদি পারা যায় পদে পদে বাধার সৃষ্টি করবে, অসুবিধায় ফেলবে এদের। নইলে তার নিজের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে যেতে বাধ্য। এরা সব নিজেদের ভাবে বাদশাহের লোক বলে। আর কারও কাছে বিশ্বস্ত থাকার দায়দায়িত্ব এদের নেই। তাছাড়া মীর আবু তোরাবের সঙ্গে আজিম-উস্-সানের কি রকম একটা সম্পর্ক আছে। সুতরাং পায়া বেশ ভারী। কিন্তু যতই পায়া ভারী হোক তাকে পাঠানো হয়েছে মোক্ষম জায়গায়। ভূষণার ফৌজদার করে। মনে মনে মুর্শিদকুলী খাঁ সন্তুষ্ট হলো। পাশেই রয়েছে মহম্মদপুরের সীতারাম। বাদশাহের কাছ থেকে রাজা উপাধি যোগাড় করে চুটিয়ে রাজত্ব চালাচ্ছে। একটা সৈন্যদলও তৈরী করেছে। যুদ্ধবিদ্যাটাও আয়ত্ব করেছে ভাল। যথেচ্ছ ভাবে আশেপাশের জমিদারী দখল করে নিয়ে সমৃদ্ধ হচ্ছে। খুন খারাবি করলে কি হবে, লোকটার জনপ্রিয়তা আছে বলে মুর্শিদকুলী খাঁ শুনেছে। একজন মুসলমান ফকিরের সে পরম ভক্ত। তাঁরই নাম অনুসারে সে মধুমতী নদীর তীরে বাগজানী গ্রামকে উন্নত নগরে পরিণত করে নাম রাখে মহম্মদপুর। এদিকে তার এলাকায় অনেক মন্দিরও তৈরী করেছে—লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির, দশভূজার মন্দির কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির। এককথায় লোকটা যেমন বুদ্ধিমান করিৎকর্মা তেমনি ঠ্যাটা। মীর আবু তোরাবকে সহজে ছেড়ে দেবে না। মুর্শিদকুলী খাঁ নিজেও ওকে ঘাঁটায় না। এখন তো সীতারাম বিরাট ভূখণ্ডের অধীশ্বর। সে যখন নলদি পরগণায় রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে নাম করে সবে একটু শক্তিশালী হয়েছে তখনি তার ক্ষমতা দেখে ফৌজদার নরুল্লা তাকে আক্রমণ করতে সাহসী হয়নি, এখন মীর তোরাব তাকে আক্রমণ করলে ফ্যাসাদে পড়বে—ভালই হবে। মুর্শিদকুলী খাঁ লক্ষ্য করেছে আবু তোরাব নিজের বংশ আর বিদ্যার অহংকারে তার সঙ্গে একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা বলেছিল।

কিছুদিনের মধ্যেই সৈয়দ আবু তোরাব বুঝলো সে শক্ত পাল্লায় পড়েছে। যেভাবে সীতারাম প্রতি পদে তাকে অবহেলা করে খুশীমত কাজকর্ম করছে, সেভাবে চললে তার ফৌজদারী দুদিনেই বেহাল হয়ে যাবে। সে মুর্শিদকুলী খাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন জানাল। মুর্শিদকুলী খাঁ চুপচাপ বসে থাকেন। ভাবখানা এবারে অত অহঙ্কার কোথায় যায় দেখা যাবে। আবু তোরাব বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করে বুঝলো সাহায্য পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। সে তখন পীর খাঁ নামে একজন আফগানকে সেনাপতি নিযুক্ত করে দুই শো সৈন্য তাকে দিয়ে বলল সীতারামকে দমন করতে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আবু তোরাবের। কিছুদিনের মধ্যেই চরম অঘটন ঘটে গেল। ভূষণার সর্বত্র সীতারামের চর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পীর খাঁকে নিযুক্ত করার পরের

দিনই সীতারাম খবরটা পেয়ে গেল। সে তার সৈন্যদের আদেশ দিল, পীর খাঁর সৈন্যদের আক্রমণ করতে হবে আড়ালে আড়ালে থেকে। সম্মুখ যুদ্ধ কখনই নয়। অনেকটা শিবাজীর ধরন। তবে শিবাজীর ওখানে.অসংখ্য ছোট বড় পাহাড় ছিল, এখানে ঝোপ জঙ্গলের সাহায্য নিতে হবে। পীর খাঁয়ের সৈন্যরা কোথাও নদী পার হচ্ছে জানতে পারলে আগেভাগে গিয়ে নৌকোগুলো ডুবিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। ফলে পীর খাঁ নাকানি চোবানি খেতে লাগল।

এরই মধ্যে একদিন সৈয়দ আবু তোরাব কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে এক বনের ভেতরে শিকার করতে গেল। শিকারের পেছনে ছুটতে ছুটতে চলে গেল সীতারামের এলাকার কাছাকাছি। আর পড়বি তো পড় ঝোপ-জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা সীতারামের সৈন্যদের মধ্যে গিয়ে পড়ল। সে নিমেষে তার ভুল বুঝতে পারল।

চেঁচিয়ে উঠল—আমি ফৌজদার সৈয়দ আবু তোরাব।

সৈন্যদের যে দলপতি ছিল সেই বিধু সর্দার অট্টহাসি হেসে বলে ওঠে—ফাঁদে পড়লে কত মানুষ ফৌজদার হয়ে যায়। হ্যা হ্যা—

—আমি সত্যিই ফৌজদার আবু তোরাব। বিশ্বাস কর।

সৈন্যরা বিশ্বাসই করল না। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস লোকটা পীর খাঁ। ফাঁদে পড়ে মিথ্যে বলছে। তারা বাঁশের তৈরী গদা দিয়ে আবু তোরাবকে পিটিয়ে মেরে ফেলল।

সীতারামের কাছে খবর গেল পীর খাঁ মরেছে। সে খুশী হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বনের প্রান্তদেশে চলে আসে, যেখানে তোরাবের মৃতদেহ নিয়ে আসা হয়েছিল।

সীতারাম ঘোড়া থেকে নেমে মৃতদেহের কাছে এসে এক পলক দেখেই চমকে উঠে বলে—তোরা সর্বনাশ করেছিস। এ যে ফৌজদার সাহেব। তোরা এঁকে মেরে ফেললি শেষে? আমার সব সাধ সব আকাঙ্ক্ষা গুঁড়িয়ে দিলি?

সৈন্যরা ফ্যালফ্যাল করে প্রভুর দিকে চেয়ে থাকে। তারা ভাবে, লোকটা সত্যি কথাই বলেছিল। বিধু সর্দার গাঁজা খেয়ে সব গুলিয়ে দিয়েছে। নইলে, ফৌজদার সাহেবের চেহারা আর পোষাক দেখে তাদের বিশ্বাস হয়েছিল। তারা মেরে ফেলত না। বন্দী করে রাজার কাছে নিয়ে আসত।

সীতারাম স্তব্ধ হয়ে যায়। সে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আবু তোরাবের গায়ের রক্ত পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করে। তারপর খুব সম্মানের সঙ্গে তার শবদেহ পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু মনে মনে বুঝতে পারে তার স্বাধীন রাজত্ব গড়ার স্বপ্ন দেখার দিন শেষ হয়ে এসেছে। এবারে সমস্ত মুঘলশক্তি তার টুঁটি চেপে ধরবে। মুঘল বাদশাহের পরাক্রম ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তেমন নেই। বাংলাতেও মুর্শিদকুলী খাঁর পরে তেমন কোন শক্ত লোক আসবে বলে মনে হয় না। সে তাই তার স্বপ্নকে রূপ দেওয়ার জন্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল। এরা সব শেষ করে দিল। তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনাই রাখল না। তবু সীতারাম এদের কিছু বলে না। কতটুকুই বা বোঝে

এরা ? যতটুকু করে তার ভালোর জন্যেই করে। এই বিধু সর্দার একবার তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। বিষধর সাপের উদ্যত ফণাকে সে নির্ভয়ে হাত দিয়ে চেপে ধরে মাটিতে রেখে পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলেছিল। আজ সে মারাত্মক ভুল করে বসেছে, যা শুধরে নেওয়া যায় না। যদি সম্ভব হতো বিধু সর্দার নিজের প্রাণ দিয়েও তা করত।

খবরটা শুনে মুর্শিদকুলী খাঁ কেঁপে উঠলো। হ্যাঁ ভয়েই কাঁপলো—যে ভয়, সে ভেবেছিল, বহুদিন আগে তাকে ত্যাগ করেছে। এমন চূড়ান্ত অঘটন ঘটার কথা সে কল্পনা করেনি। মনে মনে সে স্বীকার করে সীতারামকে অতটা বাড়তে দেওয়া মারাত্মক ভুল হয়েছে। নাফিসার সাদির ব্যাপারে মনটা কিছুদিন প্রফুল্ল ছিল। এখন নিমেষে সেই প্রফুল্লতা উধাও হয়ে গেল। সে ভেবে উঠতে পারে না, বাদশাহ, বিশেষ করে আজিম-উস-সান এই ঘটনার কথা শুনলে তার কপালে কি ঘটবে। কিন্তু সে সব পরের কথা। এই মুহূর্তে সীতারামকে বন্দী করতে কিংবা হত্যা করতে সৈন্য-পাঠাতে হবে। এতটুকুও দেরী নয়। যদিও দেরী যথেষ্টই হয়ে গিয়েছে।

এত বেশী বিচলিত হয়ে পড়ে মুর্শিদকুলী খাঁ যে সীতারামের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার জন্যে সে একজন উপযুক্ত সেনাধ্যক্ষের নাম মনে করতে পারে না।

বেগমসাহেবা খবরটা শুনে খুবই উতলা হয়েছিল। তাই মুর্শিদের অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে বসেছিল। ভোরবেলা খবরটা-এলো-বাইরে গিয়েছে। তাই বলে কোরাণ নকলের সময় আসবে তো। এমন কখনো হয় না। অনেক পরে মুর্শিদকুলী খাঁ এলো বটে, কিন্তু ছট্‌ফট্ করতে লাগলো।

—অত ছট্‌ফট্ করছ কেন ? তোমাকে এমন হতে কখনো দেখিনি।

—ব্যাপারটা ঘটেছে আমার গাফিলতিতে। তাই বিবেকের তাড়নায় সুস্থির হতে পারছি না।

—বুঝেছি। কিন্তু অস্থির হয়ে কোন লাভ হবে না।

—একজন দক্ষ সেনাপতি পাচ্ছি না, যাকে পাঠাতে পারি সীতারামকে বন্দী করে আনতে।

—একটা কথা বলব ?

—বল।

—একজন সেনাপতি বেশ কিছুদিন হলো এসে বসে রয়েছে। বসে থেকে থেকে সে নিষ্কর্মা হয়ে গেল। তাকে কাজটা দাও। মনে হয় সে সহজে পারবে।

মুর্শিদকুলী খাঁ বেগমসাহেবার মুখের দিকে চেয়ে বলে—কে সে ?

—আমার ভাই বক্‌স্ আলি খাঁ, যাকে তুমি হাসান আলি বল।

—হ্যাঁ। তাই তো। ওর নাম মনেও আসেনি। আসলে ওকে তোমার ভাই বলেই জানি। ও যে এখানে কাজ করতে এসেছে সেকথা মনে থাকে না।

—ওকে পাঠাও।

—ঠিক।

সেইদিন মধ্যাহ্নের পর দেওয়ান খানায় গিয়ে বক্‌স্‌ আলির নেতৃত্বে সৈন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করে মুর্শিদকুলী খাঁ। সে দর্পনারায়ণ আর ভূপতি রায়কে বলে, আশেপাশের সব জমিদারদের খবর পাঠাতে, সবাই যেন বক্‌স্‌ আলিকে সব রকমের সাহায্য করে। যারা সাহায্যে গাফিলতি করবে কিংবা সীতারামকে তাদের জমিদারীর ভেতর দিয়ে পাঠাতে সাহায্য করবে তাদের জমিদারী কেড়ে নেওয়া হবে। সেই সঙ্গে শাস্তিও পেতে হবে তাদের।

রঘুনন্দন দর্পনারায়ণের পাশে দাঁড়িয়ে আদেশটি শুনলো। সে ইতিমধ্যে অনেক বলেকয়ে তার ভাই রামজীবনের জন্য একখণ্ড ছোট্ট জমিদারীর ব্যবস্থা করে দিয়েছে রাজশাহীতে। খাজনা পত্তর ঠিক মত দিচ্ছে সে। মুর্শিদকুলী সন্তুষ্ট তার প্রতি। রঘুনন্দন দেখল, সীতারামকে দমনের ব্যাপারে রামজীবন যদি বেশ একটু আগ বাড়িয়ে উৎসাহ দেখায় তাহলে দেওয়ান সাহেব আরও সন্তুষ্ট হবে। সে লোক মারফৎ ঘটনার বিবরণ দিয়ে পত্র পাঠালো। দাদার চিঠি পেয়েই রামজীবন সঙ্গে সঙ্গে লোকলস্কর নিয়ে ছুটলো বক্‌স্‌ আলি খাঁকে সাহায্য করতে।

চারদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে সীতারামের বিশেষ কিছু করার ছিল না। সে দু একজন জমিদারকে অনুরোধ করেছিল, আর কিছু নয়। তাকে একটু পথ দিতে, যাতে সে দূরে চলে যেতে পারে। সামান্য সময় পেলে মানুষ তার ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু জমিদাররা এককাট্টা। এতদিন তারা সীতারামের উপস্থিতিতে বিনয়ে গদগদ হতো, এখন উদ্ধত। সীতারামকে চিনতেই পারে না। সুতরাং কোন উপায় রইল না। ওই বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে তার সামান্য কয়জন বিশ্বস্ত অনুচরকে লড়তে দিয়ে লাভ কি? প্রাণে মরবে। তার চেয়ে সে নিজেই ধরা দেবে।

এবং তাই দিল। স্ত্রী পুত্র পরিবারের ভার কার কাছে দিয়ে যাবে? চেষ্টা করে বিফল হলো। সুতরাং সবাই বন্দী হলো। বক্‌স্‌ আলি খাঁয়ের লোকেরা তাদের হাতে পায়ে গলায় লোহার শেকল পরিয়ে মহা আনন্দে মুর্শিদাবাদে নিয়ে এলো। মুর্শিদকুলী খাঁ এতটুকুও দেরী করল না। সীতারামের শরীর মুখ গরুর চামড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো। তাকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হলো মুর্শিদাবাদের পূর্বপ্রান্তে বড় রাস্তার ওপর। এই রাস্তা দিয়েই লোকে জাহাংগীর নগরে যায়। এই রাস্তার পথিকরা মুর্শিদাবাদের খবরাখবর জাহাংগীর নগরে গিয়ে বলে। মনে মনে মুর্শিদকুলী খাঁ ভাবে, এত পথিকের মধ্যে অনেকেই সেখানে গিয়ে প্রচার করবে নিশ্চয় সীতারামের কী শাস্তি হয়েছে। ফারুক শিয়ার শুনবে সেকথা। শত হলেও সৈয়দ আবু তোরাবের সঙ্গে তাদের রক্তের সম্পর্ক আছে।

সীতারামকে রাস্তার পাশে শূলে দেওয়া হলো, তার পরিবারের সবার ভাগ্যে প্রথমে জুটলো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। তারপর একসময় তাদের কলকাতায় নিয়ে

গিয়ে বেচে দেওয়া হলো।

সেদিন সীতারামের মৃত্যুর পর মুর্শিদকুলী খাঁ কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে দেওয়ানখানায় বসেছিল। সেই সময় রঘুনন্দন এসে খবর দিল তার শ্যালক বক্‌স্ আলি খাঁ দেখা করতে চায়।

—হ্যাঁ নিশ্চয়। নিয়ে এসো এখানে।

রঘুনন্দন ইতিমধ্যে বক্‌স্ আলির সঙ্গে কথা বলেছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল রামজীবন কোন সাহায্য করেছিল নিশ্চয়। নিজেকে রামজীবনের দাদা বলে পরিচয় দিল। সেকথা শুনে বক্‌স্ আলির খুব আনন্দ। সে রামজীবনের সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ। রঘুনন্দন বুঝলো তার কথা মত রামজীবন লম্ফঝম্ফ ভালই করেছে।

বক্‌স্ আলি ঘরে ঢুকতে মুর্শিদাকুলী খাঁর মুখে হাসি ফোটে। বলে—তুমি এসে পৌঁছোবার আগেই তোমার শিকারকে খতম করা হয়ে গিয়েছে।

—শুনলাম পথে আসতে আসতে।

—অসুবিধা হয়েছিল কোন?

—একটুও না। আর রামজীবন আমাকে খুব সাহায্য করেছে।

—তাই নাকি? ওতো এই রঘুনন্দনের ভাই।

—শুনলাম ওর কাছে।

—যাক্, তুমি একটা ভাল কাজ করেছ। যাও বিশ্রাম নাও।

বক্‌স্ আলি চলে গেলে মুর্শিদকুলী খাঁ রঘুনন্দনকে বলে—তোমার ভাই তো পাকা জমিদার হয়ে উঠেছে দেখছি।

—না হুজুর। এমন কিছু নয়। আপনি স্নেহের চোখে দেখেন, তাই অমন মনে হচ্ছে।

—বক্‌স্ আলি নিজে বলল, শুনলে না? ওকে সীতারামের জমিদারীটা দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে বল দর্পনারায়ণকে।

—যে আজ্ঞে।

দর্পনারায়ণকে গিয়ে বলতেই সে অবাক হয়ে বলে ওঠে—তুমি আরম্ভ করেছ কি রঘুনন্দন?

—আজ্ঞে?

—আজ্ঞে ফাজ্ঞে নয়। সারা বাংলার জমিদারীগুলো তোমার ভাই কুক্ষিগত করবে নাকি? এরমধ্যেই তো তিনটে হয়ে গেল।

—আমার কি দোষ? দেওয়ান সাহেবের অভিরুচি।

দর্পনারায়ণ হেসে বলে—তা তো বুঝতেই পারছি। আমার মাথার মধ্যে কানুন গোগিরি গিজগিজ করছে। আর তোমার মাথার মধ্যে কত কি যে আছে ভেবে পাই না। তুমি জাফর খাঁকে টেক্কা দিতে পার।

—জাফর খাঁ? ও মনে থাকে না। আপনি আর কিশোর রায় ছাড়া কাউকে

বড় একটা ও নামে ডাকতে দেখিনা। দর্পনারায়ণ বলে—মুসলমান কর্মচারীরা ওই নামেই ডাকে—যারা বাদশাহের কাছ থেকে আসে।

—তা হতে পারে।

—সীতারামের জন্যে তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

—আমি ভাবিনি। আপনার?

—আমিও ভাবার চেষ্টা করিনি। দেখছি তুমি ছেলেমানুষ হলেও মাথাটি তোমার যথেষ্ট পাকা। জয়নারায়ণ এতদিন আমার কাছে কাজ করে মাথার চুল পাকালো। কিন্তু তার বুদ্ধি কোথায় যেন ঠেকে রয়েছে।

এত ব্যস্ততা, ধর্মানুশাসন অনুযায়ী—দৈনন্দিন জীবনে এত ঋজুতা। হিন্দুস্থানের বাদশাহের প্রতি এত আনুগত্য—সব কিছুর মধ্যেও মুর্শিদকুলী খাঁর হৃদয়ের এককোনে একটা আশঙ্কা থেকেই যায়। আশঙ্কাটি হলো, আজিম-উস্-সান, বলতে গেলে সর্বশক্তিমান হয়েও, তাকে কেন এখনো রেহাই দিয়ে চলেছেন। তার ওপর বাদশাহ-জাদার ক্রোধের যে পরিসীমা নেই একথা শুধু সে কেন দর্পনারায়ণ জয়নারায়ণ এমনকি ইদানীং রঘুনন্দনও জেনে ফেলেছে। পুরোনো কর্মচারীদের মধ্যে কে না জানে? নকদি ফৌজদের লেলিয়ে দিয়ে তাকে হত্যা করার প্রচেষ্টা—এ সব তো এখন প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও বাদশাহজাদা তার সম্পর্কে কেন যে কোনরকম আগ্রহ দেখাচ্ছে না, যে আগ্রহ তাকে বিপদে ফেলে, তার সম্মানে আঘাত হানে। হতে পারে, এইভাবে সে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে চলেছে মুর্শিদকুলী খাঁর মনে। কখন কি হয়, অজানা আশঙ্কার চাপ। একটা কিছু করে ফেললে শেষই হয়ে গেল। কিন্তু আজিম উস্-সান্ সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছে মুর্শিদকুলী খাঁ, তাতে অতটা কূট বলে মনে হয় না। সে সাহসী, বীর যোদ্ধা, বুদ্ধিমানও বটে। কিন্তু কূট কৌশল সে তেমন রপ্ত করতে পারেনি। বরং তার কনিষ্ঠ পুত্র ফারুক শিয়ার এ ব্যাপারে বেশ এগিয়ে। তার মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা—বুদ্ধিও খেলে ভাল।

তবু আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছিল মুর্শিদকুলী খাঁর। সব কিছুই করছে, কিন্তু নিজের ভেবে করতে পারছে না। হারেমের খোজা ও বাঁদীর অবস্থা তার। শুষ্ক কর্তব্য করে যাচ্ছে।

অবশেষে এলো সেই আঘাত। প্রথমে তাকে বাংলার দেওয়ানী থেকে অপসারিত করা হলো। রাখা হলো শুধু উড়িষ্যার সহ সুবাদার হিসাবে। এবং সেই আঘাত সামলাতে না সামলাতে তাকে পাঠানো হলো দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান করে।

আত্মীয় স্বজন চেনাজানা সবার চোখে বিহ্বলতা। কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁ

দাঁতে দাঁত চেপে সব সামলে নিল। জীবনের পথ সব সময় কুসুমাস্তীর্ণ থাকবে এমন কোন কথা নেই। তবু তো এই রাজ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ কমছিল।

জিয়াউল্লাকে তার জায়গায় বাংলার দেওয়ান করে পাঠানো হলো। দেওয়ান খানায় সবাই এসে চুপি চুপি দেখা করে গেল। বড় শান্তিতে ছিল সবাই। এমন কি দর্পনারায়ণ অবধি শান্তিতে ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁ মনে মনে ভাবলো, লোকটা বেঁচে গেল। সে যদি এখানকার দেওয়ান হিসাবে বহাল থাকত তাহলে দর্পনারায়ণের আয়ু অনেক সংক্ষিপ্ত হতো। অপমানের জ্বালা জীবনে সে ভোলে না।

সবাই বিমর্ষ হলো, কিন্তু চোখের জল ফেলল মাত্র দুজন ভূপতি—আর কিশোর। কেন চোখের জল ফেলল? আর তো কেউ কাঁদলো না? সেই কথাই সে জিজ্ঞাসা করে ভূপতিকে।

—শুধু তোমরাই কাঁদছ। কেন?

—জানি না।

—তোমরা পুরুষ নয়? হিন্দুরা বড় নরম ধাতের হয়।

—হয় তো তাই। আপনি চলে যাচ্ছেন, মনে হচ্ছে আমরা অভিভাবক হারাচ্ছি।

—বাজে কথা। তোমরা ভেবেছ আমি চলে গেলে তোমাদের নোকরি যাবে। সেই ভয়ে কাঁদছ?

দুজনাই প্রতিবাদ করে ওঠে। তারা বলে মুর্শিদকুলী খাঁ যদি চায় তারা কাজ কর্ম ছেড়ে আবার গ্রামে ফিরে যাবে।

—খুব বাহাদুরী। আর নতুন দেওয়ান সব শুনে ভাববে, তোমরা দুজন আমার লোক। তোমাদের অস্থির করে তুলবে। কাজ করে যাও। ফালতু ওসব মেয়েলী-পনা ত্যাগ কর।

এক সময় রঘুনন্দন এসে দেখা করে। তার নিজের জন্যে ভয় নেই। সে জানে, তাকে কেউ সরাতে পারবে না। তাকেও না, দর্পনারায়ণকেও না। তবে তার রামজীবনের জমিদারীর কি হবে, বুঝে উঠতে পারে না। রামজীবন বলতে গেলে এখন সব চেয়ে বড় জমিদার। নতুন দেওয়ান জিসউল্লা যদি জমিদারীর বর্তমান ব্যবস্থা পালটে দেয় তাহলে রামজীবনের সর্বনাশ হয়ে যাবে, কিন্তু সেকথা বিদায়ী দেওয়ানকে সে জানাতে পারে না।

মুর্শিদকুলী খাঁ ওর মনের কথা টের পেয়ে যেন বলে ওঠে—রামজীবনের জন্যে ভাবতে হবে না। যেভাবে টাকা দিচ্ছে ওভাবে দিয়ে গেলে যে কোন দেওয়ানকে একশোবার ভাবতে হবে ওর জমিদারী কেড়ে নেওয়ার আগে।

ওপর থেকে শুধু মুর্শিদকুলী খাঁ সম্বন্ধে হুকুম এসেছে। আর কারও সম্বন্ধে আসেনি। সুতরাং সুজাউদ্দিন যেখানে আছে সেখানে রইলো। এমন কি নাত-জামাইকেও সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কি হয়। হয়ত একে একে ওদের সবাইকে সরতে হতে পারে একদিন। কিন্তু এখন তারা এখানে

থাক। নাফিসা মৃদু আপত্তি তুলেছিল। ওর চাইতে ওর মায়ের আপত্তি তীব্রতর ছিল। সে একা পড়ে আছে উড়িষ্যায়। সুজাউদ্দিন নতুন বেগমকে নিয়ে ব্যস্ত। জিন্নৎ নিজেকে বড় অবহেলিত বলে মনে করে। মাঝে নাকি আপন মনে বকবক করত। মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ ভেবে মুর্শিদকুলী খাঁ ঢাকা থেকে এক বিখ্যাত হাকিমকে পাঠিয়েছিলেন। হাকিম ফিরে এসে মুর্শিদকুলী খাঁকে আশ্বস্ত করে যায় যে ওটা সাময়িকভাবে হয়েছিল। সব ঠিক আছে।

আসাদউদ্দীন সম্বন্ধে একটু ভাবনা হয়েছিল তাকে সঙ্গে নেবে, না রেখে যাবে। শেষ পর্যন্ত রেখে যায়। রেখে যায় বেগমসাহেবার পরামর্শে। নইলে নাফিসা ভাবতে পারত, তার আর রেজা খাঁর চাইতে আসাদের মূল্য বেশী দেওয়া হলো। তাদের দুজনার প্রাণের যেন মূল্য নেই। মুর্শিদকুলী খাঁ ভাবে, কদিন আগে সত্যিই তাঁদের প্রাণের তুলনায় আসাদের প্রাণের মূল্য ছিল অনেক বেশী। তাকেই সে ভাবত তার উত্তরাধিকারী। আর সেই উত্তরাধিকারিত্ব শুধু দেওয়ানী বা সুবাদারীতে শেষ হয়ে যেত না। কিন্তু এখন চিত্র পালটে গিয়েছে। এখন ওসব প্রশ্ন ওঠে না। এখন সবার জীবনের মূল্য সমান। নতুন জায়গায় এই বয়সে গিয়ে সে প্রশাসনের ওপর প্রভাব বিস্তার কতটা করতে পারবে সন্দেহ আছে। কারণ হিন্দুস্থানের সোনার খনিকে সে পেছনে ফেলে যাচ্ছে। এই শ্যামল সমতল ক্ষেত্র জীবনে আর কি সে দেখতে পাবে ?

পথের মধ্যে বেগমসাহেবা এক সময় বলে ওঠে-চল, ফিরে যাই।

—পাগল হলে ? বাংলায় ফেরার কথা ভাবছ কি করে ? এ কি আমার মর্জি ?

—আমি বাংলার কথা বলিনি।

—তবে ? কোথায় ফিরে যাব ?

—যেখান থেকে এসেছিলাম। দক্ষিণ ভারতে গিয়ে আর কি হবে ? বরং চলো ফিরে যাই পারস্য দেশে। ওখানে আপন পরিবেশে শেষ কয়টা দিন শান্তিতে কাটিয়ে দেব।

মুর্শিদকুলী খাঁ বেগমসাহেবার মুখের দিকে চায়। মনে হলো বেগমসাহেবা স্বপ্ন দেখছে। তার নয়ন দুটি খোলা অথচ কোন বিশেষ দিকে সে তাকিয়ে নেই। এমনকি মুর্শিদকুলী খাঁর দিকেও নয়।

মুর্শিদকুলী খাঁ ভাবে, তুমি না হয় তোমার দেশে ফিরে যাবে, কিন্তু আমার দেশ ? তোমার দেশের দিকে যত অগ্রসর হব আমার দেশকে তত পেছনে ফেলে যাব। আমার দেশের সেই হেলানো বটগাছ কোথায় পাব ? সেই পুরোনো আম আর নিমের গাছ ? সেই [illegible]রি ভীড় ? বাংলায় থেকেও হয়ত ভূপতি রায়ের গ্রামে আর যাওয়া হতো [illegible]নে হতো, কাছে আছি ইচ্ছে করলেই গিয়ে দেখে আসতে পারি।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে মুর্শিদকুলী খাঁ বেগম সমভিব্যাহারে দক্ষিণ ভারতে

গিয়ে পেঁছেছিল। এই সময়টা তার জীবনের এক অন্ধকার অধ্যায়। কারণ উদ্যমের কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

কিন্তু নিশ্চয় ঈশ্বরের কৃপা তার ওপর ছিল। নইলে নবোদ্যমে জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করার সম্ভাবনা তার হতো না। একসময় যা তার জীবনে ঘটতে ঘটতে ঘটেনি, বাংলার নবনিযুক্ত দেওয়ানের ভাগ্যে সেটা ঘটে গেল, বছর ঘুরে ঘুরে কয়েক মাস পার হতে না হতে দেওয়ান জিয়াউল্লা নক্দি ফৌজের হাতে নিহত হলো। সেবারে যেটা ছিল অভিনয় এবারে তা সত্যি। নক্দি ফৌজ তাদের প্রাপ্য পাচ্ছিল না। আর বাংলার মত সুবাকে সুনিপুণভাবে শোষণ করার ক্ষমতা কার আছে? অধিকাংশ দেওয়ান গোদুগ্ধ দোহন করতে গিয়ে বাছুরকে নিয়ে ফেলে। বাংলায় জনগণকে বাঁচিয়ে রেখে, সেখানকার উৎপাদনে এতটুকু বাধার সৃষ্টি না করে প্রতিবছর অগাধ ধনরাশি বাদশাহকে প্রেরণের ক্ষমতা মুর্শিদকুলী খাঁ ছাড়া দ্বিতীয় কারও আর নেই। আজিম-উস্-সানকেও শেষ পর্যন্ত এই কথাটা স্বীকার করতে হলো। এবং তারই মত নিয়ে মুর্শিদকুলী খাঁকে আবার পাঠানো হলো সেই বাংলায়।

প্রত্যাবর্তনের পথে মুর্শিদকুলী খাঁর মনে হলো যেন নব-যৌবন ফিরে পেয়েছে। মনের আর দেহের যে শক্তি চিরবিদায় নিয়েছে বলে মনে হয়েছিল তা সত্য নয়! বুঝতে পারল, কিছুই হারায়নি সে। হারিয়েছিল শুধু আশা। তাই আকাঙ্খাও অন্তর্হিত হয়েছিল। আর আকাঙ্খা চলে গেলে জীবনের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

বাড়ির দাওয়ায় বসে বেগমসাহেবাকে প্রশ্ন করে মুর্শিদকুলী খাঁ—তোমার নিশ্চয় খুব খারাপ লাগছে?

—কেন বলতো?

—নিজের দেশ পারস্যে যেতে পারলে না বলে। আবার ফিরে যেতে হচ্ছে সেই বাংলায়।

—কে বলেছে তোমাকে?

—এর মধ্যে ভুলে গেলে? বাংলা ছেড়ে চলে আসার সময় কী বলেছিলে?

—কী বলেছিলাম?

—বলেছিলে, দক্ষিণ ভারতে গিয়ে আর কাজ নেই। চলো দুজনে আবার ফিরে যাই পারস্য দেশে, একদিন যেমন দুজনে এদেশে এসেছিলাম।

—বলেছি নাকি? নিশ্চয় মাথার ঠিক ছিল না। বাংলায় আমার জিন্নৎ পড়ে রইল, নাফিসা আর আসাদ রইল, আমি চলে যাব পারশ্য দেশে? আমাকে অত স্বার্থপর ভাবো নাকি? আমি কি অতটা হৃদয়হীন?

—কে বলেছে তুমি হৃদয়হীন। আমি শুধু মনে করিয়ে দিলাম তোমার উক্তিটি। আসলে ওকথা আমারও মনে হয়েছিল। ভেবেছিলাম চলে যাব। কী হবে এখানে থেকে। যে টাকা সঙ্গে আছে স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে বাকী জীবন। আমার জীবন বিলাসবহুল নয়।

অবশেষে মুর্শিদাবাদে এসে পেঁছোয় ওরা।

মুর্শিদাবাদ যেন নতুন করে জেগে উঠল। আগের কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল। সাধারণ লোকে বলাবলি করতে থাকে,—যাঁর নামে এই শহরের নাম, তিনি না থাকলে শহরের প্রাণ থাকে? কয়জন ওকে চেনে জাফর খাঁ নামে?

সব চেয়ে আগে আসে ভূপতি রায় আর কিশোর তারা। সসম্ভ্রমে মাথা নীচু করে নমস্কার করে।

—মুর্শিদকুলী খাঁ লক্ষ্য করে ভূপতির শরীর বেশ খারাপ তবে তার উল্লেখ না করে বলে, কী ভূপতি, কেমন ছিলে তোমরা?

—বেঁচে ছিলাম। সাপ যেমন শীতকালটা কাটায়।

—সাপের মত কাটিয়ে বেশ কথা শিখেছ দেখছি।

ভূপতি লজ্জা পেয়ে যায়। একথা সে বলতে চায়নি।

এর পরে দেখা করতে আসে রঘুনন্দন। সে বলে—সবই করছিলাম হুজুর কিন্তু যেমন অসহায় মনে হতো নিজেকে। আমার কাজের তারিফ করারও কেউ ছিল না। ভুল করলে ধমক দেবারও কেউ ছিল না। কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগত।

মুর্শিদকুলী খাঁ বুঝলো রঘুনন্দন অন্তরের কথাই বলেছে। সে জিজ্ঞাসা করে—তোমার ভাই-এর খবর কি?

—আপনি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার পেছনে লেগেছিল অনেকে। মতলব ছিল তার জমিদারী থেকে কিছুটা ভাগ বসাতে।

—কে তারা?

—তাদের নাম বলতে আদেশ দেবেন না হুজুর। কারণ আমি তাদের ডেকে বলতেই তারা নিরস্ত হয়।

—তোমার কথা শুনলো?

—তাই তো দেখলাম হুজুর। বলেছিলাম, আপনি চিরকালের জন্যে চলে যাননি। আবার ফিরে আসবেন।

—একথা বললে? কেন বললে?

—বিশ্বাস করুন। আমার মনে হতো আপনি ওখানে বেশীদিন থাকবেন না।

—এটা মনে হওয়ার কারণ?

—একদিন ঠিক ভোরবেলা একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছিলাম। দেখেছিলাম, না ; সেকথা বললে আপনার সম্মানে আঘাত লাগবে।

—বলে ফেল। স্বপ্ন যখন, বলতে অনুমতি দিলাম।

—নাটোরে এক জাগ্রত কালী আছেন। হিন্দুদের খুব বিশ্বাস। স্বপ্ন দেখেছিলাম, খুব ঝড়-ঝঞ্ঝা হচ্ছে, আমি যেন নৌকো করে কোথায় যাচ্ছিলাম। হঠাৎ নৌকো উল্টে গেল। নৌকোয় আরও আরোহী ছিল। দেখলাম তাদের অনেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য কী আপ্রাণ চেষ্টা করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুহাত মুঠো করে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তলিয়ে গেল। আমারও দম শেষ হয়ে আসছিল, শরীর জমে যাচ্ছিল। ডুবে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে হঠাৎ সেই কালীর কথা মনে হলো। আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম মনে মনে। একটু পরেই দেখি আকাশের গায়ে মা কালী। হাসি মুখে ডান হাত তুলে অভয় দিচ্ছেন আর একটি নৌকো দেখিয়ে দিচ্ছেন। নৌকোটি কাছে আসতে দেখি ওটিতে আপনি বসে রয়েছেন। আমাকে তুলে নিলেন নৌকোয়।

মুর্শিদকুলী খাঁ গম্ভীর হয়ে যান। সে জানে রঘুনন্দন তাকে সন্তুষ্ট করতে মাঝে মাঝে একটু বাড়িয়ে বলে। তাতে সে কিছু মনে করে না। কারণ সে কাজ জানে এবং নিপুণ ভাবে করতে পারে। কিন্তু আজকের ঘটনা শুনে তার বিশ্বাস হলো স্বপ্নটা রঘুনন্দন দেখলেও দেখতে পারে।

—ঠিক আছে রঘুনন্দন। যাও কাজ করগে। দর্পনারায়ণের খবর কি ?

রঘুনন্দন বলতে পারে না জিয়াউল্লাকে নতুন দেওয়ান পেয়ে খুব খুশী হয়েছিল দর্পনারায়ণ। বলতে পারে না কারণ বয়োজ্যেষ্ঠ। তাছাড়া বলতে গেলে তার গুরু। দর্পের কাছেই কাজ শিখেছে সে। দর্পের ইচ্ছা ছিল কিছু কামিয়ে নেওয়ার। মুর্শিদকুলী খাঁ ফিরে আসায় সেটা বন্ধ হয়ে গেল।

রঘুনন্দন বলে—তিনি এখুনি আসছেন। একটা কাজে আটকে গিয়েছেন।

মনে মনে মুর্শিদকুলী খাঁ ভাবে, দর্পনারায়ণকে ডাঙায় তুলতে আরও বড় টোপ ঝোলাতে হবে। দেখা যাক্, ফিরে যখন এসেছি ধীরে-সুস্থে ব্যবস্থা নিলে হবে।

মেদিনীপুরকে উড়িষ্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুবে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করার বহুদিনের ইচ্ছা এতদিনে পূরণ করল মুর্শিদকুলী খাঁ। জিনিষটা এতদিন পরে স্বাভাবিক হলো। উড়িষ্যার সঙ্গে থাকার সময় মেদিনীপুরকে কিরকম নিঃসঙ্গ বলে মনে হতো। আদায়ের ব্যাপারে সৈন্য প্রেরণের ব্যাপারে মেদিনীপুর মুর্শিদাবাদের অনেক কাছে।

কিন্তু এই কাজ শেষ করতে না করতে হুগলী নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়ে গেল। হুগলীর ফৌজদার জিয়াউদ্দিন সাক্ষাৎ বাদশাহ দ্বারা নিযুক্ত। এজন্যে তার আত্মম্ভরিতা বরাবরের। সে নিজেকে ভেবে এসেছে স্বাধীন বলে। বাংলার দেওয়ান বা নাজিমের তোয়াক্কা সে কোনদিনও করেনি। হুগলী ফিরিঙ্গিদের ব্যবসা বাণিজ্যের একটি বড় ঘাঁটি। তাদের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এসেছে জিয়াউদ্দিন। তারাও খুশী হুগলীর ফৌজদারের ওপর। কিন্তু মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্গত থাকার সময় মুর্শিদকুলী খাঁর মনের ভেরে যেমন একটা অস্বস্তি ছিল, জিয়াউদ্দিনের হামবড়া ভাবের জন্যেও তেমনি তার ভেতরে একটা জ্বালা ছিল। ঔরঙ্গজেবের সময়ে এ বিষয়ে বাদশাহকে কিছু বলতে সে সাহস পায়নি। বাহাদুর শাহের সময় তো বলার প্রশ্নই ছিল না। কারণ আজিম-উস্-শান বাদশাহকে সব ব্যাপারে পরামর্শ দেয়। আসলে নরম প্রকৃতির বাদশাহের নামে আজিমই দেশ চালায়।

কিন্তু এবারে দক্ষিণ ভারত থেকে ঘুরে আসার পরে মুর্শিদকুলী খাঁর মনের জোর তার ভেতর দুটোই বেড়ে গিয়েছে। সে বুঝেছে তাকে ছাড়া বাদশাহের আর উপায় ছিল না বলেই বাংলায় ফিরিয়ে এনেছেন। অর্থাৎ প্রকারান্তরে মুর্শিদকুলী খাঁর জয় হয়েছে। তাই সে সোজাসুজি বাদশাহকে লেখে যে হুগলীতে একজন স্বাধীন ফৌজদার থাকায় প্রশাসনের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। এ যেন একই এলাকায় দুই শাসনকর্তা। এর একটা বিহিত করা দরকার। জিয়াউদ্দিনকে এই মুহূর্তে অপসারিত করা দরকার। জোরালো যুক্তি দেখে বাহাদুর শাহ সম্মতি জানালেন। বললেন, হুগলীর জন্য মুর্শিদকুলী খাঁ নিজের পছন্দ মত একজন ফৌজদার যেন নিযুক্ত করে।

সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদকুলী খাঁ একজন কুশলী মুঘল কর্মচারী, ওয়ালী খাঁ যার নাম, তাকে পাঠালো হুগলীতে সৈন্যসামন্ত দিয়ে। জিয়াউদ্দিন বুঝলো তার দিন শেষ। সে হুগলীর কেল্লা পরিত্যাগ করে হিন্দুস্থানের রাজধানীর দিকে যাবার জন্যে বাইরে চলে এলো।

জিয়াউদ্দিনের পেশকার হলো এক বাঙালী, নাম কংকর সেন। অনেক পয়সা করেছে সে। সেও খাতাপত্র নিয়ে জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো।

ওয়ালী বেগ খবর পেল পেশকারও প্রাক্তন ফৌজদারের সঙ্গে রওনা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে আপত্তি জানালো। বলে পাঠালো যে, হিসাবপত্র না বুঝিয়ে দিয়ে পেশকারের যাওয়া চলবে না।

জিয়াউদ্দিন ঘাবড়ে গেল। বলল—কি করবে কংকর?

—সর্বনাশ। আমি থাকলে যে আপনিও ফাসাদে পড়বেন। অনেক উল্টোপাল্টা ব্যাপার আছে হিসাবে। আপনি তো জানেনই। বাইরে থেকে যতটা সম্ভব আমি ঠিক করে রেখেছি। কিন্তু নতুন ফৌজদার তো ওপর ওপর দেখবেন না। উনি সব কিছুর নাড়ী-নক্ষত্র জানতে চাইবেন। ধরা পড়ে যাব, হুজুর।

—তাহলে তুমিও চল। কিন্তু ওরা যে তোমাকে যেতে দেবে না।

—ফিরিঙ্গিরা আপনার সহায়। ওদের সৈন্যসামন্ত বেশী হলে কি হবে, ওরা এখানে নতুন এসেছে। ফিরিঙ্গিরা আপনাকে সাহায্য করলে ওরা পারবে না। আমি হুজুর আপনার সঙ্গে সারাজীবন থাকতে চাই।

—ঠিক আছে।

ওদিকে ওয়ালী খাঁ শুনলো জিয়াউদ্দিন কঙ্কর সেনকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। সে বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হলো।

জিয়াউদ্দিন তার সৈন্য সাজালো চন্দননগর আর চুঁচুড়ার মাঝামাঝি একটা জায়গায়। সামনে পরিখা খুঁড়ে ফেলল। ওয়ালী বেগ ইদ্‌গার মাঠে দেবীদাসের পুকুরের ধারে তার সৈন্য-সামন্ত জড়ো করল। সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদে খবর পাঠানো হল, যত সত্বর সম্ভব একজন যোগ্য সেনাপতির অধীনে সৈন্য পাঠাতে। মুর্শিদকুলী খাঁ রেগে গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে দিলীপ সিং এর অধীনে অশ্বারোহী আর পদাতিক সৈন্য পাঠালো। সেই সঙ্গে ফিরিঙ্গিদের কাছে পেঁছে দেবার জন্য হুমকি দিয়ে একটি পত্রও পাঠালো।

জল রীতিমত ঘোলা হয়ে গিয়েছে দেখে জিয়াউদ্দিন আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। কিন্তু কঙ্কর সেন প্রাণের ভয়ে তাকে প্রবোধ দিয়ে বলল—আপনি হুজুর, ওদের সেনাপতি দিলীপ সিং এর কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠান।

ভীত জিয়াউদ্দিন ক্ষেপে গিয়ে বলে ওঠে—তাতে হবেটা কি?

কঙ্কর সেন বলে—আপনি লোক পাঠান হুজুর। আমি সব ব্যবস্থা করছি।

—কী ব্যবস্থা? তুমি যুদ্ধ জান নাকি?

—আজ্ঞে না। আমি কৌশল জানি।

—কী কৌশল?

—আপনি যাকে পাঠাবেন, সে যেন একটা লাল রঙের কোর্তা গায়ে দিয়ে যায়। সে যখন দিলীপ সিং এর সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবে, তখনই আসল কাণ্ড ঘটবে।

—কি ঘটবে?

—ফিরিঙ্গির গুলিতে দিলীপ সিং লুটিয়ে পড়বে হুজুর।

কঙ্কর সেন কথাটা শেষ করে খুব হাসতে থাকে। জিয়াউদ্দিনের মুখেও হাসি ফুটে ওঠে। কঙ্কর তো দারুণ বুদ্ধিমান। সে বলে—সেই ফিরিঙ্গিটা? সেই যে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ হুজুর। অব্যর্থ লক্ষ্য। লোকটা কোর্তা না পরে মাথায় লাল রঙের শালও জড়িয়ে নিতে পারে। তবে হুজুর সে যেন কথা বলার সময় একটু দূরে থাকে। কামানের গোলার ব্যাপার।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে।

সেইদিনই ঠিক ভর দুপুরে মাথায় লাল শাল জড়িয়ে একটি লোক চলল দেবী

দাসের পুকুরের দিকে। ওয়ালী খাঁয়ের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝলো সন্ধির প্রস্তাব আসছে।

লোকটির মাথায় শাল খসে পড়ছিল। তাড়াতাড়ি আবার ভাল করে জড়িয়ে দিল। শীতের সময় হলেও দুপুরে ওভাবে শাল জড়িয়ে নেওয়া বিসদৃশ লাগছিল। ওয়ালী খাঁয়ের লোকেরা তাকে খুব কাছে আসতে দেয় না।

লোকটা বলে—আমি আগের ফৌজদার জিয়াউদ্দিন সাহেবের কাছ থেকে আসছি। সিপাহিশালার দিলীপ সিংকে একটা পত্র দেব। তিনি কিছু বললে, আমার মালিককে গিয়ে জানাব।

দিলীপ সিং তখন আদুড় গায়ে স্নানের পূর্বে তেল মাখছিল। সেই অবস্থাতেই শিবির থেকে বেরিয়ে আসে। লোকটির কাছ থেকে পত্রটি হাতে নেয়। লোকটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে দুচারটে কথা বলে। খুব অপ্রাসঙ্গিক এবং নির্বোধের মত কথা। দিলীপ সিং অবাক হয়, বিরক্তও হয়।

ঠিক সেই সময় একটি গোলা এসে তার দেহকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। আচমকা এই নিদারুণ ঘটনা সবাইকে হতচকিত করে দেয়। সৈন্যরা ছোটাছুটি শুরু করে। আর ওয়ালী খাঁ উপায়ান্তর না দেখে কেল্লার ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

জিয়াউদ্দিন হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করতে থাকে—এবারে কি হবে কঙ্কর? এবারে যে মুর্শিদকুলী খাঁ আমার টুঁটি চেপে ধরে জবাই করবে।

—কি যে বলেন হুজুর। এখুনি চলুন, পালাই। এইতো সুযোগ। কোন রকমে বাদশাহের কাছে পেঁাছোতে পারলে আর ভয় নেই।

ওরা হাতী-ঘোড়া যা পায়, সব নিয়ে ছোটে দিল্লীর পথে। আর দিলীপের সৈন্যরা তার ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহটির সৎকারের ব্যবস্থা করে যথাসাধ্য শাস্ত্রীয় মতে। দিলীপ সিং মানুষটা সিপাহীদের প্রিয় ছিল। সেনাপতি বলে নিজেকে আলাদা করে সরিয়ে রাখত না। তাদের সঙ্গে সহকর্মীর মত মিশতো।

ওয়ালী বেগ ফৌজদার হয়ে বসলো বটে। কিন্তু আসল পাখি পালিয়েছে। অনেক টাকাই তছরূপ করেছে নিশ্চয়। সে মুর্শিদাবাদে সবিস্তারে সমস্ত জানিয়ে দূত পাঠালো।

মুর্শিদকুলী খাঁ সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অস্ফুট উচ্চারণ করে—কঙ্কর সেন। কাঁকর সেন। কাঁকরের মত পায়ের নীচে পিষে ফেলতে হবে।

সেই সময় দর্পনারায়ণ পাশে দাঁড়িয়েছিল হিসাবের খাতা দেওয়ান সাহেবের সামনে ধরে। মুর্শিদকুলী খাঁ মনে মনে ভাবে এই কঙ্কর হলো দ্বিতীয় ব্যক্তি যার নিস্তার নেই। আর সামনে যে অতি বিনীত ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে হলো প্রথম ব্যক্তি। এদের ক্ষমা নেই। তবে অনেক খেলিয়ে তবে এদের পৃথিবী থেকে সরাতে হবে। বড় মাছ, সহজে ধরা দেয় না। গভীর জলের মাছ।

—দর্পনারায়ণ।

—বলুন হুজুর।

—এবারে রঘুনন্দনকে নিয়ে একটা বিরাট কাজ করতে হবে। আমি চাই জমিদারী-গুলোর সুনির্দিষ্ট এলাকা হোক। কর আদায় সুবিধা হবে—শাসনেরও সুবিধা। একটা স্পষ্ট ধারণা হবে সবার। সম্ভব এটা?

—নিশ্চয় সম্ভব হুজুর। রঘুনন্দনকে পেলে করে ফেলব।

—ঠিক আছে। আর কদিন পরেই রবি উল-আওয়ালের সেই পুণ্য দিনগুলি। তার পরই শুরু করে দিন।

সেই পবিত্র দিবস অবশেষে এসে গেল। কোরাণ নকল করার সময় কত বছর আগে স্বপ্ন দেখেছিল মুর্শিদকুলী খাঁ এই দিনগুলি সার্থকভাবে পালন করবে বলে। মনের মধ্যেই এতদিন ছিল সেই ইচ্ছা। পূরণ করা হয়নি। দক্ষিণ ভারতে চলে গিয়েছিল। এবারে ফিরেছে। আর তাকে কেউ এ-দেশ ছাড়া করবে বলে মনে হয় না। কারণ দিনকাল অনেক বেশী জটিল হচ্ছে। সাগরপারের ওই ফিরিঙ্গিগুলো ব্যবসা-বাণিজ্যে ওস্তাদ। এখানকার ব্যবসায়ীরা তাদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে চলতে পারে না। হুগলীর ফৌজদার জিয়াউদ্দিন তো তাদের হাতের পুতুল হয়ে পড়েছিল। তাদেরই এক গোলায় দিলীপ সিং এর মত মানুষকে হারাতে হয়েছে। ওদের ক্ষমা নেই। আজিম-উস-সানদার-উল-জারবে ওদের টাকা তৈরীর অনুমতি দিয়েছিলেন। সেই অনুমতি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। ব্যবসাতে যে সব সুযোগ-সুবিধা পেত, তাও আর নেই। অন্যান্য ব্যবসায়ীর মত ব্যবসা করুক। কোন খাতির নেই। ওরা মিষ্টি কথায়, উপহার দিয়ে মন গলাতে ওস্তাদ। কিন্তু এ বান্দা সেই মানুষ নয়। ওরা শত চেষ্টাতেও এ বান্দার মন ভেজাতে পারবে না। তবে ওসব কথা এখন নয়। এই কটা দিন আর কিছু নয়। মনকে পবিত্র রাখতে হবে। এই দিন-গুলোতে মনে মনে প্রতীক্ষা করতে হবে, সুবার গরীবদের কষ্ট লাঘব করার জন্য সতত চেষ্টা করতে হবে। যারা নিপীড়িত তাদের নিষ্কৃতি দেবার প্রয়াস চালাতে হবে। এই দিনে প্রতি বছর সংকল্প করতে হবে, গরীবরা যাতে বেশী দামে খাদ্যশস্য না কেনে। কেউ যদি তাদের ঠকায় তাহলে তাকে চরম শাস্তি দিতে হবে। মহলদার, ওজনদার, দোকানদার কারও নিস্তার নেই। মুর্শিদকুলী খাঁ ঠিক করে, প্রতি সপ্তাহে সে রাজ্যের খাদ্যশস্যের মূল্যের তালিকা নিজে যাচাই করবে। কারও কোন গাফিলতি দেখলে তাকে গাধার পিঠে চাপিয়ে সারা শহরে ঘোরানো হবে।

হ্যাঁ, এই পবিত্র দিনগুলো তার প্রতিজ্ঞা গ্রহণের দিন। আর সেই সঙ্গে নগরীর মানুষ যাতে আনন্দ পায় সেই ব্যবস্থা তো করতেই হবে।

তাই করা হলো, মহীনগর থেকে লাল বাগ এই দীর্ঘপথ নদীর ধার বরাবর আলোকসজ্জায় সজ্জিত করার ব্যবস্থা হলো। আর সে কি সাধারণ আলো? মসজিদ

গাছপালা সব আলোয় আলোময়। হাজার হাজার মানুষকে নিযুক্ত করা হলো একই সঙ্গে চিরাগবাতি জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য। যেন মুহূর্তে সব বাতি জ্বলে ওঠে।

সেই দিন সন্ধ্যায় নদীর দুই কূল মানুষের ভীড়ে জমে উঠলো। কত মানুষ। দীর্ঘ প্রতীক্ষা তাদের। শুনেছে একই সঙ্গে সব উদগ্রীব। এমন সময় কামানের গর্জন। সঙ্গে সঙ্গে সব বাতি জ্বলে উঠলো। দুই তীরের মানুষ আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। মুর্শিদকুলী খাঁ নিজে দাঁড়িয়ে সেই আনন্দ কোলাহল শুনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করল। কিন্তু আরও বাকি আছে। এপারের মানুষেরা বুঝতে পারল না। কিন্তু দূর থেকে ওপারের মানুষেরা বিস্ময়ে চেয়ে দেখল চিরাগগুলো কোথাও মসজিদের রূপ নিয়েছে। কোথাও গাছের রূপ নিয়ে হাসছে। সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, কোরাণের বাণী ফুটে উঠলো মসজিদের বেদীপ্রান্তে। আবার চিৎকার ওপার থেকে। এপারের মানুষরা প্রথমে বুঝতে পারেনি, ওদের অত উৎসাহ কেন। পরে বুঝতে পেরে শত শত নৌকোয় নদী অতিক্রম করতে শুরু করল। ওপার থেকে দেখবে বলে। নিষ্কর্মা দরিদ্র মাঝিরা ভীষণ উৎসাহিত হয়ে ওঠে। তারা অর্থের স্বাদ পেয়েছে। একবার, দুবার, কবার পারাপার করতে হবে। পার করে দেবার সময় তারা জানতে চায়, এই বছর শেষ কিনা। প্রতি বছর কি হবে? আশ্বস্ত হয়। প্রতিবারই এই উৎসব হবে। অর্থাৎ বছরের কয়েক মাসের জীবন ধারণের পয়সা তারা পেয়ে যাবে ফি বছর এই দিনগুলোতে। খোদা মেহেরবান।

ওদিকে নদীর ধারে আলোকসজ্জা আর এদিকে কদিন ধরে মুর্শিদকুলী খাঁ নিজ নিবাসে বিনম্রভাবে অভ্যর্থনা জানাতে থাকে প্রতিদিন শেখ, উলেমা, সৈয়দ ও আরও সব ধার্মিক ব্যক্তিদের। তাঁরা এই কদিন তার নিবাসে আহার গ্রহণ করবেন। মুর্শিদকুলী খাঁ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ভক্তের মত তাঁদের খানাপিনার তদারক করে চলে। শুধু তাঁরাই বা কেন? সাধারণ জীবজন্তুও বাদ পড়ে না। রাতের পেচকেরাও এই খাদ্যের অংশীদার। কল্পনা আজ বাস্তবে পরিণত। মুর্শিদকুলী খাঁর হৃদয় এতদিনে সম্ভবত ভাবাবেগে আপ্লুত হলো—যে ভাবাবেগকে সে সংযত রাখে নিষ্ঠুর-ভাবে। তার ধারণা ভাবাবেগ দুর্বল মানুষের একটা দোষ।

এই কদিন শুধু মসজিদে নয় বহু স্থানে হাজার হাজার পাঠক উচ্চকণ্ঠে কোরাণ পাঠ করে চলে। ওদিকে তার ও অন্যান্য নকলনবীশের নকল করা অসংখ্য কোরাণ পাঠানো হল মক্কা ও মদিনা নাজাফ ও কারবালা, বাগদাদ আর খোরাসান, জিদ্দা এবং বসরায়। দেশের ভেতরে আজমীর পাণ্ডুয়া প্রভৃতি পুণ্যস্থানে পাঠানো হলো কোরাণের নকল।

এইভাবে সুদীর্ঘ বারোদিন ধরে চলল পবিত্র দিবস পালন। সবাই মুর্শিকুলী খাঁর প্রশংসা না করে পারল না।

জাহাঙ্গীর নগরে বসে ফরুকশিয়ার এখবর শুনলে। তার মা সাহেবউন্নিসাও শুনলেন। কিন্তু তাদের মনে বিশেষ কোন দাগ পড়ল না। আজিমউস-সান এখানে

থাকলে ঈর্ষান্বিত হতেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁর পক্ষেও এই ব্যাপারে মাথা ঘামানো বোধহয় সম্ভব হতো না। কারণ ফারুকশিয়ারের মত তাঁরও মন পড়ে থাকত দিল্লী আর আগ্রার ঘটনার দিকে। বাহাদুর শাহ ভীষণ রকম অসুস্থ, তাঁর পীড়া শুধু দেহের নয় মস্তিষ্কেরও।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকেই ফারুকশিয়ারের ইচ্ছে ছিল সেও ঢাকা ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদে গিয়ে বসবাস করবে। তৈমুরবংশের সন্তান বলে মনে তার গর্ববোধ আছে ঠিকই কিন্তু পিতা আজিম-উস-সানের মত আত্মম্ভরিতা তার আদৌ নেই। সে অনেক বেশী বাস্তববাদী। সে ঠিক করে নিয়েছিল মুর্শিদকুলী খাঁর সঙ্গে আর সংঘর্ষ নয়। তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া উচিত। তেমনি তার কাছা-কাছিও থাকা উচিত। জাহাঙ্গীর নগরে সে পড়ে ছিল নিঃসঙ্গ অবস্থায়। কারণ দেশের সবাই মানে আসল রস রয়েছে মুর্শিদাবাদে। যত কিছু টাকা পয়সার লেন-দেন সব এখানে। সে যদি মুর্শিদাবাদে থাকে তাহলে সুবাদার আজিম-উস-সানের প্রতিনিধি হিসাবে এখানে তার গুরুত্ব বেড়ে যাবে, আর মুর্শিদকুলী খাঁ দরবারী নিয়মনিষ্ঠা যে ভাবে পালন করে তাতে নিশ্চয় নিয়মিতভাবে এসে তাকে দর্শন দিয়ে যাবে। লোকটাকে অবিশ্বাসী বলে কিছুতে মনে হয় না। বরং বাদশাহের প্রতি একটু বেশী মাত্রায় বিশ্বাসী এবং নিঃসন্দেহে অনুগত।

ফারুকশিয়ারের মুর্শিদাবাদে আসা পেছিয়ে গিয়েছিল একটি সামান্য কারণে। সে মুর্শিদকুলী খাঁয়ের নাতনীর সাদিতে যোগ দেবার আমন্ত্রণ এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে অনেক দেরীতে এল। নইলে আগেই চলে আসত। তারপর মুর্শিদকুলী খাঁ দক্ষিণ ভারতে চলে যাওয়ায় সে এখানে আসার তাগিদ আর অনুভব করেনি তখন।

মুর্শিদকুলী খাঁ জান-মান দিয়ে তাকে আসতে সাহায্য করল, এতটুকু অসুবিধা যাতে না হয়, সেই ব্যবস্থা করে দিল। লালবাগের প্রাসাদে শাহজাদার বসবাসের ব্যবস্থা করা হলো।

লালবাগের প্রাসাদে ফারুকশিয়ার স্থিত হয়ে বসলে একদিন মুর্শিদকুলী খাঁ এসে সসম্ভ্রমে তাকে কুর্ণিশ করে জিজ্ঞাসা করে—শাহাজাদা, আপনার কোনরকম কোন অসুবিধা থাকলে আমাকে বলবেন। নতুন জায়গায় এসেছেন, সেই জন্যে জানতে চাইছি।

ফারুক সন্তুষ্ট হয়ে বলে—তেমন কোন অসুবিধা নেই। অসুবিধা হলে নিশ্চয়

বলব। আচ্ছা আমার দৈনন্দিন খরচাপাতি দেখাশোনার জন্যে কোন লোক দিতে পারেন ? নিয়াজ খুব বুড়ো হয়ে গিয়েছিল বলে, ওকে আনিনি সঙ্গে।

—অবশ্যই লোক দেব আপনাকে। হিসাব নিয়েই আমি থাকি। আচ্ছা, কোন হিন্দু দিলে আপনার আপত্তি আছে ?

—হিন্দু কখনো রাখিনি—

—ঠিক আছে। অন্য কাউকে দেব।

—না না, হিন্দু দিতে পারেন। একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে। আপনি শুনি ওদের ওপর বড় বড় দায়িত্ব দিয়েছেন !

মুর্শিদকুলী খাঁ কথাটা শুনে একটু হাসতে পারত, কিন্তু হাসে না। আসলে সে বরাবর কম হাসে। সে দেওয়ানখানায় এসে ভূপতি রায়কে ডাকে।

ভূপতি রায় এসে দাঁড়াতে প্রশ্ন করে—তোমার ছেলের নামটি কি যেন ?

—গোলাপ।

—বসরার নাকি ?

—কি বললেন হুজুর ?

মুর্শিদকুলী খাঁ বুঝতে পারে মুখ দিয়ে আলগা কথা বের হয়ে পড়েছে। ভাবে, ভূপতির ছেলের নাম এই প্রথম জিজ্ঞাসা করল সে। ভূপতির তাতে কিছু মনে করার কারণ নেই। কিন্তু সে মনে মনে জানে, মানুষ অনেক রকমের ফাঁদে পড়ে জীবনে। হৃদয়ের কোমল বৃত্তিনিচয়কে বেশী বাড়তে দেওয়ার সুযোগ দিলে এই ফাঁদে পবার সম্ভাবনা খুব বেড়ে যায়। সুতরাং কোমলতাকে কোন প্রশ্রয় নয়—আবেগকে রুদ্ধ করতে হবে।

মুর্শিদকুলী খাঁ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে—না কিছু না। আমি বলছি গোলাপকে ফারসি শিখিয়েছ ?

—হ্যাঁ, খুব ভাল শিখেছে। ফারসীতে সায়ার লেখে।

—খেয়েছে।

—হুজুর ?

—না বলছি কি। শুধু ওই সবই লেখে নাকি ? আমিও তো একটু লেখালেখি করি। আবার অন্য কাজও করি। গোলাপ কি অন্য কাজ করে ?

—করে, কিন্তু মন নেই। ওদিকে আবার পদাবলীও লেখে।

—সেটা কি জিনিষ ?

—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি যেমন লিখেছেন হুজুর।

—আমি ওসব বুঝি না। তুমি ভুল করেছ ভূপতি। ভেবেছিলাম তোমার পরে তোমার জায়গায় গোলাপকে বসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব। সেটি আর হলো না। এখানে বসাবার আগে, ছোট-খাটো দায়িত্ব দিয়ে দেখতাম। তুমি সুযোগ হারালে।

—এজন্যে সংসারে আমার কম অশান্তি নয়। কিন্তু ছেলেটা হয়েছে অন্যরকম। জানি, ওর কপালে দুঃখ আছে :

মুর্শিদকুলী খাঁ একটু আশাহত হলো। সে অন্য একজনকে ফারুকশিয়ারের কাছে দিল। লোকটা মুসলমান।

ফারুকশিয়ার প্রশ্ন করায় মুর্শিদকুলী খাঁ বলে– ভেবে দেখলাম, মুসলমান থাকাই ভাল। তাছাড়া লোকটা মুঘল আদব-কায়দা জানে।

লাহোরে বাহাদুর শাহের অসুস্থতার খবর ফারুকের জানা ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে সেই খবর তার জানা ছিল না। আজিম-উস-সানের দক্ষতার ওপর তার অগাধ আস্থা। জানে যুদ্ধবিদ্যায় তার পিতা সর্বশ্রেষ্ঠ। পিতার জ্যেষ্ঠ ভাই মৈজাদ্দিন কিংবা অন্যান্য ভাই জেহান শাহ আর রাকিয়া ওস্মান পিতার সমকক্ষ কখনো নয়! মৈজদ্দিন তো অপদার্থ।

ফারুকের ধারণা হয়ত মিথ্যা নয়, কিন্তু পিতৃ চরিত্রের সবটুকু তার জানা ছিল না। মৈজাদ্দিন জ্যেষ্ঠ হয়েও কখনো পিতা বাহাদুর শাহের কাছে থাকতে চাইত না। তার মনে মনে একটা অভিমান, আজিম তার চাইতে বয়সে ছোট হলেও পিতার পক্ষপাতিত্ব তার প্রতি। তাকে কাছে রেখে দিয়ে বড় বড় পদ দিয়েছেন। মৈজাদ্দিনের এই অভিমানের ফলে আজিম-উল-সান পিতার মৃত্যুর পর সবটুকু সুযোগ পেয়ে গেল। সে পিতার ধনসম্পত্তি পেল, তাঁর সৈন্য-সামন্ত পেল, হীরা-জহরৎ পেল এমনকি সিংহাসনও পেল। আর অতি সহজে এতবড় সুযোগ পেয়ে যাওয়ার, সে ভেবে বসল, উপযুক্ত বলে এটা তার প্রাপ্য। তার চিরকালের আত্মগরিমা বহু গুণ বেড়ে গেল। ফলে আমীর-উল-ওমরাহ্ জুলফিকার খাঁয়ের মত শক্তিধর, বুদ্ধিমান এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে অবহেলা করার দুঃসাহস দেখলো। আর সঙ্গে সঙ্গে পাশায় চাল পাশাতে শুরু করল। আমীর-উস-ওমরাহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ডেকে নিয়ে বোঝালো আজিম-উস-সান বাদশাহ হলে কপালে অশেষ দুর্গতি আছে। সুতরাং তাকে পরিত্যাগ করা উচিত। সবাই আজিমের ব্যবহারে তিক্ত-বিরক্ত। তারা বাকী তিন ভাই মৈজদ্দিন, জাহানশাহ আর রফিয়াস্ সান্ এর সঙ্গে যোগাযোগ করল। তারও আগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিল।

এই সময় বাদশাহের সমস্ত সৈন্য লাহোরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছিল। আর শিবির স্থাপন করা হয়েছিল রাবি নদীর এক দিকে। আজিম-উস-সানের শিবির ছিল নদীর অপর পারে। সুতরাং বাদশাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহের শিবির দখল করে নিতে তার অসুবিধা হয়নি। বাকী তিন ভাই এর শিবির ছিল সহরের ওই দিকে।

কিন্তু আত্মসন্তুষ্টি আজিমকে পথে বসালো। সে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভাইদের আক্রমণ করলে তার জয় ছিল অবধারিত। অথচ সে ভাবলো অন্য কথা। ভাবলো:

সৈন্যরা আমীর-ওমারহ সবাই জানে বাদশাহের যাবতীয় সম্পত্তি তার দখলে। সুতরাং কেউ তাকে ছেড়ে যাবে না। সে নিশ্চিন্ত হয়ে পরিখা দমন করতে হুকুম দিল। আক্রমণ সে করবে না নিজে থেকে। ওরা আক্রমণ করুক।

সে যখন ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে বিভোর সেই সময় আমীর-উল-ওমরাহের পরামর্শে অন্যান্য ভাইরা লাহোরের কেল্লা থেকে গোলন্দাজদের বের করে এনে আজিম-উস-মানের সৈন্যের ওপর কামান দাগতে শুরু করল।

এইভাবে চারদিন কেটে গেল। আজিমের সঙ্গে ছিল তার অপর পুত্র করিমউদ্দিন। সে তার শিবিরেই বসে রইল। সামনে এগিয়ে গেল না। সৈন্যরা একটু ভীত হয়ে পড়ল। কার হুকুমে চলবে তারা? কেউ নেই। সেই সময় তারা দেখল বড় বড় সৈন্যাধ্যক্ষরা সবাই একে একে গিয়ে অপর পক্ষে যোগ দিচ্ছে। তারাও পালাতে শুরু করল।

শত্রুপক্ষরা এগিয়ে আসতে লাগলো ধীরে ধীরে। আজিমের স্বপ্ন ভাঙলো বড় দেরিতে। সে দেখল হীরে-জহরৎ আর ধনসম্পত্তির লোভে কেউ তার সঙ্গে থাকলো না। তারা চলে গিয়েছে অন্য ভাইদের পক্ষে। এমন কি সিপাহীরাও পালিয়েছে।

আজিম কাপুরুষ নয়। সে বুঝলো এতটুকুও আশা আর অবশিষ্ট নেই। তবু মরণপণ যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল সে। করিমউদ্দিনকে ডেকে বলে—আমি ওদের আক্রমণ করতে যাচ্ছি। তুমি কি করবে?

—এখন আক্রমণ করে কোন লাভ আছে?

—শেষটুকু না দেখা পর্যন্ত লাভ লোকসানের হিসাব করা যায় না। তুমি কি করবে?

—আপনি যুদ্ধে যাচ্ছেন যখন আমি বসে থাকব না। আমিও যাব।

সৈন্যদের বাকী যারা সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেছিল, যারা যুগের সঙ্গে তাল মানিয়ে চলতে শেখেনা, পুরোনো মালিকের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে যেতে চায়, তাদের দুইভাগে ভাগ করে পিতাপুত্র শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আজিম-উস্-সান চেপেছিল একটা হাতিতে আর করিমউদ্দিন বেছে নিয়েছিল অশ্ব।

তাদের আক্রমণে মৈজাদ্দিন প্রথমে হতচকিত হয়ে গেল। সত্যিই সেই আক্রমণ অত্যন্ত জোরালো। বিপরীত কিছু ঘটে যাবার মত উপক্রম হলো। কিন্তু ভাগ্যের পাল্লা তাদের দিকে হেলে পড়ল। একটা কামানের গোলা সোজা গিয়ে আঘাত করল আজিম-উস-সানের হাতিকে। হাতিটি তখন ছিল ঠিক রাবি নদীর পাড়ে একবারে কূল ঘেঁষে। গোলার ধাক্কায় বিধ্বস্ত হাতিটি নদীর জলে গিয়ে পড়ল। আর আজিম? সে কি জলে পড়ল? তার মৃতদেহ তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো। একটি দেহ পাওয়া গেল বটে কাছে-পিঠে। দেহটির মুখ বিকৃত, দেহে শত আঘাত চিহ্ন। আজিমের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া গেল। কিন্তু এই কি আজিম? এই পোষাকে? এমন কিছু রাজকীয় পোষাক নয়। তিন ভাই বুঝতে পারে না।

অনেক নিহত সৈন্যের মত আজিমের দেহও কি তবে রাবি নদীর জলে হারিয়ে গেল? আসল সিদ্ধান্তে কেউ আসতে পারল না। তবে এটুকু বোঝা গেল আজিম-উস-সান মৃত। যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যাবার মত কাপুরুষ সে নয়।

করিমউদ্দিন যুদ্ধক্ষেত্রে ধরা পড়ল। তাকে কিছুদিন কয়েদ করে রাখা হলো। তারপর মৈজাদ্দিনের নির্দেশ হত্যা করা হলো! মৈজাদ্দিন হিন্দুস্থানের বাদশাহ হয়ে উপাধি নিল জাহাঙ্গীর শাহ। তৈমুরবংশের চিরপ্রচলিত একটি নিয়ম রয়েছে আত্মীয়দের মধ্যে শত্রুর শেষ রাখতে নেই। বিশেষ করে তারা জানে ধমনীতে যদি একই রক্ত প্রবাহিত হয়, পেছনে তারা আরও বিপজ্জনক। তাই করিমউদ্দিনের পর মৃত্যু নেমে এলো দুই ভাই জাহান শাহ্ আরও রফিয়াস্‌মানের ওপর। এরপর ঠিক আট দিনের মধ্যে আরও একত্রিশ-বত্রিশ জন তৈমুর বংশীয়কে কতল করে জাহান্দার শাহ্ ভাবলেন এবারে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু বাদশাহ কি ভুলে গিয়েছিলেন সুদূর বাংলায় রয়েছে আর একজন তৈমুর শোণিত-ধারা-তরুণ যে তাঁর প্রধান শত্রু আজিম-উস-সানের পুত্র, যে এখনো পিতার মৃত্যুর পরও নায়েব নাজিমের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে? ভোলেননি নিশ্চয়। হয়তো উপায় নির্ধারণের জন্য সময় নিচ্ছিলেন।

লালবাগের প্রাসাদের নিভৃত কক্ষে সাহেবউন্নিসার চাপা ক্রন্দন কারও কর্ণগোচর হলো না। এমনকি ফারুকশিয়ারের বেগম কিংবা তাদের শিশুকন্যা মিলেখি নেমাজও শুনতে পেল না। তবে লাহোরের ঘটনা শুনে সারা প্রাসাদে শোকের ছায়া নেমে এলো। খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ সহরবাসীরাও বিপদাক্রান্ত হলো। তারা অনেক অত্যাচারী সুবাদার দেখেছে, সেই তুলনায় আজিম উস্‌-সান অনেক ভাল ছিল। জাহাঙ্গীর নগরে তো স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রবল ভাবে নাড়া খেল। ওখানেই আজিমের বাস ছিল।

খবরটা শুনে মুর্শিদকুলী খাঁর প্রতিক্রিয়া হলো অন্য রকমের। সে বাদশাহের কাছ থেকে ফরমানের অপেক্ষা করতে থাকে। মুঘলদের রীতি রয়েছে কেউ তখ্‌ত্‌ তাউসে বসে নিজেকে শাহানশাহ হিসাবে ঘোষণা করার পর সব প্রদেশে খবর পাঠায় যে এখন থেকে সে বাদশাহ। সুতরাং সমস্ত সুবাদার ও দেওয়ান সেই অনুযায়ী কর্তব্য করবে।

ইতিমধ্যে মুর্শিদকুলী খাঁ একটু দ্বিধান্বিত হয় ফারুকশিয়ারের সঙ্গে তার আচার-আচরণ কিরকম হবে সেকথা ভেবে। ফরমান আসলে কোন কথা নেই। কিন্তু আসার আগে সে কি করবে?

শেষে এক অপরাহ্নে সে তার দেহরক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে লালবাগ প্রাসাদে যায়। ফারুকশিয়ার তাকে দেখে একটু বিস্মিত হয়।

—আপনি? আপনার লোকটিকে ফেরত চান?

—না শাহজাদা, আমি দুঃখ জানাতে এসেছি। আমাদের সুবাদারের মৃত্যু হয়েছে, আপনি তাঁর পুত্র। আপনার বেদনায় আমি ব্যথিত। তাছাড়া আপনি এখনো আমাদের নায়েব নাজিম। আপনার প্রতি কর্তব্য আমার শেষ হয়ে যায়নি।

—ফরমান এলে?

—তখন অন্য প্রশ্ন।

—যা হোক, আমার দুঃখের দিনে আপনি এসে সমবেদনা জানিয়েছেন, একথা মনে থাকবে।

মুর্শিদকুলী খাঁ ধীরে ধীরে লালবাগ প্রাসাদ থেকে বের হয়ে আসে। নিজেকে হালকা বলে মনে হয় তার। একটা বড় কর্তব্য পালন করা হলো। কর্তব্য করেছে সে আইনমাফিক। এতটুকু এদিক-ওদিক হয়নি।

আর ফারুকশিয়ার মুর্শিদকুলী খাঁর গমন পথের দিকে তাকিয়ে ভাবে, ফরমান এলে লোকটি তাকে আর চিনতে পারবে না। এর ধরনই সেই রকম। কিন্তু কী করবে সে এখন। আজ খবর এসেছে একমাত্র সে ছাড়া তার নিকট-আত্মীয়দের সবাইকে মেরে ফেলেছে মৈজদ্দিন। তাকেও রেহাই দেবে না। সে মৃত্যুকে বরণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু তার শিশু কন্যা, বয়স এখন যার সবে ছয় বছর। আধো-আধো মিষ্টি কথা বলে। ওকে এই সুন্দর পৃথিবী থেকে সে চলে যেতে দিতে পারে না। তার বেগম আর মা-ই বা কী দোষ করেছে? ওরা বাঁচুক। তার প্রাণের বিনিময়েও যদি বাঁচাতে হয় বাঁচাবে সে। কিন্তু সেইভাবে তো বাঁচানো যাবে না। তাকেও ওদের সঙ্গে যেতে হবে। কিন্তু কোথায়?

হ্যাঁ, সমুদ্রপথে পালাবে সে। হিন্দুস্থানের আর কোথাও তার স্থান হবে না এই মুহূর্তে। মসনদ যার, সব কিছুই তার। দেশের কারও বিবেক-বুদ্ধি আছে কি? বাদশাহের দিকে সবাই ঢলে পড়ে কেন? টাকার লোভে, পদের লোভে আমীর ওমরাহরা বাদশাহকে সমর্থন করতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষও সেদিকে যায় কেন? মনে হয়, কোন কিছুতে তাদের আসে যায় না। কে গেল আর কে এলো, তাদের বয়ে গেল। এতে তাদের কোন লাভ-লোকসান নেই। কেউ আশ্রয় নিলে তারা ধরিয়ে দিয়ে মজা দেখে। সাময়িক উত্তেজনা উপভোগ করা যায়।

সমুদ্রপথেই চলে যাবে সে। তবু সব কিছু ঠিক করার আগে মা সাহেবউন্নিসাকে একবার জিজ্ঞাসা করতে হবে। সে লক্ষ্য করেছে, তিনি যে স্বামীর মৃত্যুতে কেঁদেছেন একথা কাউকে জানতে দিতে চান না। তাঁর চোখে অশ্রুর পরিবর্তে লক্ষ্য করেছে সে আলোর ঝলকানি। প্রথম দেখে চমকে উঠেছিল। এখন একটু অভ্যস্ত হয়েছে দেখতে দেখতে। মায়ের নিজের কোন চিন্তা থাকতে পারে। পিতা আজিম-উস-সানও

মায়ের পরামর্শ নিতেন। হয়ত মা তাঁর কাছে থাকলে হিন্দুস্থানের ইতিহাস অন্যরকম হতে পারত।

মা তাঁর কক্ষের এককোণে বড় বাতায়নের সামনে ভূমিতে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। উন্মুক্ত বাতায়ন। সামনে রক্তবর্ণ সূর্য ধীরে ধীরে অস্ত যাচ্ছে। সেই আলোয় মায়ের মুখ রক্তিম হয়ে উঠেছে।

ফারুকশিয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে ডাকে—মা।

—বল।

—হিন্দুস্থানে আমাদের স্থান নেই।

—কি বলতে চাইছো?

—বলছি আমার কোন ছেলে নেই আপাতত। মসনদের দাবীদার হবার মত কাউকে দেখি না আমার বংশে।

—কেন মসনদের দাবীদার তুমি হতে পারো না? কতই বা বয়স তোমার? অল্প বয়সে সাদি হয়েছে বলে মেয়ে হয়েছে। পরে ছেলেও হতে পারে। বাদশাহজাদাদের হবার এমন হয়।

—জানি। কিন্তু তেমন আশা দেখছি না।

—কেন?

—আমার তাই মনে হচ্ছে। আমি বলছি কি সাগর পাড়ি দিয়ে কোথাও কিছুদিন আশ্রয় নিলে সবাই বাঁচবে। ভাবার অবসর পাওয়া যাবে। ছেলে হলে উপযুক্ত ভাবে মানুষ করা যাবে।

সাহেবউন্নিসা উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চেয়ে বল্লেন—সাগর পাড়ি দিতে চাও? হ্যাঁ দেবে। এই সাগরও লবণাক্ত কিন্তু রক্তবর্ণ। ওই যে দেখছ সূর্য ডুবছে, ওই রকম। যুদ্ধ করে রক্তের সমুদ্র তোমাকে পার হতে হবে ফারুকশিয়ার। সেইজন্যেই তোমাকে আমি গর্ভে ধারণ করেছিলাম। একবার ভাবো, তোমার পিতার মুখখানা। একবার ভাই করিম-এর কথা মনে কর তো? কি? পালাবে?

ফারুকশিয়ারের ধমনীর রক্তও উদ্দাম ছোটাছুটি সুরু করে। সে বলে—না। প্রতিশোধ নেব।

—হ্যাঁ। ব্যবস্থা কর।

ফারুকশিয়ার মায়ের কক্ষ থেকে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হয়।

ঠিক সময়ে এক অশ্বারোহী মুর্শিদকুলী খাঁর প্রাসাদের সামনে অশ্ব থেকে নামলো। সূর্য তখন ডুবে গিয়েছে। তবে সন্ধ্যার আঁধার তখনো জাঁকিয়ে বসতে পারেনি ভালভাবে। অশ্বারোহী পরিশ্রান্ত। তার সঙ্গের আরও দুজন অশ্বারোহী

বাইরে অপেক্ষা করে। ভেতরের অশ্বারোহী সোজা সামনের একজনকে বলে—জাফর খাঁয়ের সাক্ষাৎপ্রার্থী সে।

—দেওয়ান সাহেবকে কি বলব?

—বলবেন, বাদশাহের ফরমান এনেছি।

সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে একজন ছুটে এসে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

এতদিনে এলো।

ফরমান মনোযোগ সহকারে পড়লো মুর্শিদকুলী খাঁ। ফারুকশিয়ারের সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকে গেল। কোন দায়-দায়িত্ব রইল না। মীর্জা রেজা খাঁ আর নাজির আহমেদের ডাক পড়ল। বলা হলো, কারও কিছু কর অনাদায়ী থাকলে এক সপ্তাহের মধ্যে যেন আদায় করা হয়। দর্পনারায়ণ আর রঘুনন্দনকে আদেশ দেওয়া হলো আগামী বারে যাতে দুই কোটির মত টাকা তোলা যায় তার ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখতে। আর সেই সঙ্গে হিসাবটা এখন থেকেই তৈরী সুরু করে দিতে হবে।

কয়েকদিনের মধ্যে প্রচুর অর্থ আর উপঢৌকন নিয়ে কিছু সিপাহী যাত্রা করে নতুন বাদশাহের দরবারে। নগর প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে দেওয়ানখানায় ফিরে এসে সুস্থির হয়ে বসতে না বসতেই খবর আসে ফারুকশিয়ার দেখা করতে চায়।

ফারুকশিয়ার? কে সে? সে তো আর কেউ নয়। কিন্তু ডাকছে সে। মুর্শিদকুলী খাঁ অনেকক্ষণ ভাবে। তারপর বেশ বড়সড় একদল সৈন্য নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হয় লালবাগে। বরাবর মুর্শিদকুলী খাঁকে ফারুকের সঙ্গে প্রাসাদের অভ্যন্তরের দিকে দেখা করতে যেতে হতো। কিন্তু এবারে সে দেখল, ফারুকশিয়ার বাইরের সোপানশ্রেণীর কাছে অপেক্ষারত। মনে মনে ভাবে মুর্শিদকুলী খাঁ, হাজার হলেও বাদশাহী বংশ তো, আদব-কায়দার এতটুকু ব্যতিক্রম হয় না এদের। ফারুকশিয়ার জানে, ফরমান আসার পর থেকে তার আদেশ আর মানতে বাধ্য নয় মুর্শিদকুলী খাঁ। তবে এও জানে, ফরমানে কোথাও লেখা নেই যে আজিম-উস-সানের প্রতিনিধিকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তাই মুর্শিদকে ডেকে পাঠিয়েছে। আর অনেক ভেবে-চিন্তে মুর্শিদকুলী খাঁও এসেছে অনুরোধ রক্ষা করতে।

আজিম-উস-সানের পুত্র হলেও ফারুকশিয়ারকে মুর্শিদকুলী খাঁ বরাবর পছন্দ করে এসেছে তার স্বভাবের জন্য। সে উগ্র নয় আদৌ, অথচ ব্যক্তিত্ব রয়েছে। প্রায় শৈশব থেকে দেখে আসছে তাকে। অন্য যে ভাইটি উগ্র ছিল সে এখন মাটির নীচে শুয়ে রয়েছে।

অপেক্ষমাণ ফারুকশিয়ারকে দূর থেকে দেখে আদৌ অসহায় বলে মনে হলো না। সে অবাক হলো একটি ব্যাপার লক্ষ্য করে। পিতার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে ফারুকের ছোট্ট কন্যা মিলেখি। মুর্শিদকুলী খাঁ চট করে ভেবে নেয়, একি সহানুভূতি আকর্ষণের কৌশল? হতে পারে মুঘলবংশীয়রা শুধু যোগ্য প্রশাসক নয়, কূটনীতিবিদও বটে। তবে তার অন্তরে যদি কোমল অংশ কিছু থেকে থাকে, তাতে

নাড়া দিতে পারবে না। সে নিজে তো আর কূটকৌশলী নয়, সে সোজাসুজি বাদশাহের কর্মচারী।

ফারুকশিয়ার বলে,—আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। চলুন ভেতরে গিয়ে বসি।

মেয়েটি মুর্শিদকুলী খাঁকে বলে ওঠে—আপনি খেলতে জানেন?

মুর্শিদকুলী খাঁ মেয়েটির থুতনিতে হাত দিয়ে বলে—না মা। আমি খেলতে শিখিনি।

—কেন? তাই কি হয়? আমি কত খেলা করি।

—আমার দুর্ভাগ্য। তোমার মত ছেলেবেলা আমার আসেনি।

ফারুকশিয়ারের দিকে চেয়ে মিলেখি বলে—উনি কি বলছেন? বুঝতে পারছি না তো?

—তোমার আর বুঝতে হবে না। শুধু পাকা পাকা কথা।

কক্ষে প্রবেশ করে দুজনা বসে। মুর্শিদকুলী খাঁ ভাবে, আজকের এই যে দুজনা সামনাসামনি বসল, এতে কত তফাৎ। এইভাবে সে আজিম-উস-সানের সামনে একদিন উত্তেজিতভাবে বসে পড়েছিল, সেদিন নকদি ফৌজের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে জাহাঙ্গীর নগরের প্রাসাদে সে ছুটে গিয়েছিল। সেদিনের সেই উত্তেজনার মধ্যেও শাহজাদার প্রতি তার একটা সম্ভ্রমবোধ ছিল। আজও সে এই যুবককে অশ্রদ্ধা করছে না। কিন্তু বিশেষভাবে একে সম্মান জানাবার তাগিদ একটুও নেই। বলতে গেলে এই মুহূর্তে সে শত্রু শিবিরে। বাদশাহ জাহাঙ্গীর শাহ এখন তার প্রভু। আর ফারুকশিয়ার বাদশাহের একমাত্র শত্রু যে এখনো জীবিত রয়েছে।

ফারুকশিয়ার মুর্শিদকুলী খাঁর চোখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। দেখলো সেই চোখের চাহনিতে কোনরকম ছটফটানি নেই। সেই চোখ তার চোখের ভেতরে তার মনের প্রতিচ্ছবি খুঁজতে ব্যস্ত।

একটু হেসে ফারুক বলে—নিশ্চয় বুঝেছেন, কেন ডেকেছি।

—কল্পনা করে নিয়ে লাভ কি? আপনার মুখ থেকে বরং শুনি। তাতে সুবিধে হবে, সময়ও কম লাগবে।

—ঠিক। শুনুন তবে। আপনি বাদশাহ আলমগীরের দরবারে আগে কিছুদিন ছিলেন। জাহাঙ্গীর শাহকে আপনি চেনেন আশা করি।

—বলুন।

—আপনি ভালভাবে জানেন সে অপদার্থ। হিন্দুস্থানের বাদশাহ হওয়ার যোগ্য সে নয়।

—আমাকে এবারে উঠতে হবে। বাদশাহের সমালোচনা করা আমার ধৃষ্টতা।

—বেশ তাহলে সোজাসুজি শুনুন। আমি আমার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চাই। আমি ওকে হত্যা করে তখ্‌তত্তাউস অধিকার করতে চাই। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

মুর্শিদকুলী খাঁ উঠে দাঁড়ায়। বলে—আপনাকে আমি শৈশব থেকে দেখছি বলতে গেলে। আমি বলছি, যিনি যখন মসনদে বসবেন আমি তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য। আমি বাদশাহের চরিত্র নিয়ে সমালোচনা করতে চাই না। সেটা আমার অধিকারের বাইরে।

—আপনি আমাকে সাহায্য করবেন না ?

—না। সেই সঙ্গে আপনার হিতৈষী হিসাবে বলি, আপনি সত্বর বাংলা ছেড়ে চলে যান। যদি বাদশাহের আদেশ চলে আসে যে আপনাকে বন্দী করে দিল্লী পাঠিয়ে দিতে হবে, তাহলে কর্তব্যের খাতিরে সেই কাজ আমাকে করতে হবে। আমি অক্ষরে অক্ষরে কর্তব্য মেনে চলি বলে আপনাকে আগেভাগে বন্দী করে পাঠালাম না।

—আপনি খুব ধর্মপ্রাণ বলে প্রচার। শুনি কোরাণ নকল করেন প্রতিদিন। কোরাণের একটি উক্তি আমার মনকে বলিষ্ঠ রাখবে। অন্য সাহায্যের দরকার নেই। উক্তিটি হলো—আল্লার প্রতি আমি আমার বিশ্বাস রাখি।

দুপুর গড়িয়ে চলছে বিকেলের দিকে। গঙ্গা সমর্পিতাপ্রাণ হয়ে সাগরের দিকে ছুটছে। ভাঁটার টান। নদীর পাড় থেকে অনেক নীচে অবধি শুধু কাদা। সেই কাদার ওপর দিয়ে অনেকে ছুটছে জলের দিকে। তারা স্নান করবে। সারা দিনই স্নান করে মানুষে। জলের কিনারায় গিয়ে হাত দিয়ে এক আঁজলা জল তুলে মাথায় দিয়ে নেয়—পাদস্পর্শ হবে মা, অপরাধ নিও না। অনেক নৌকো উঁচুতে কাদার ওপর পড়ে রয়েছে। জোয়ার এলে আপনা হতে ভেসে উঠবে। তাই মাঝি মাল্লারা সেই সব নৌকোর ওপর কেউ রান্নার আয়োজন করছে, কারাও নৌকোয় মধ্যাহ্ন ভোজ সমাধা হলো, টুকরো টুকরো কথা এ-নৌকো ও-নৌকোর মধ্যে অনেক নৌকোয় নমাজ পড়ার ছোট মাদুর কিংবা অন্য কিছু ছৈ এর ওপর শুকোতে দেওয়া আছে, অমাবস্যা কিংবা পূর্ণিমা কাছে-পিঠে নেই। বান আসার সম্ভাবনা নেই। তেমন হলে এইসব নৌকো কাদার ওপর পড়ে না থেকে জলে ভাসত বানের অপেক্ষায়। নইলে উল্টে-পাল্টে লণ্ডভণ্ড হয়ে কোথায় চলে যেত।

পাড়ে অশ্বত্থ বট বেল আমলকি আর অশোক গাছের পঞ্চবটী। বেশ বড়। বটের ঝুরি ঝুলছে। তার নিষ্কাষণে কিছু গাছের প্রাণ ওষ্ঠাগত কিছু গাছ গতাসু। তবু ওই বটবৃক্ষের মাহাত্ম্যে পঞ্চবটীর পাদদেশ বাঁধানো বেদী। পথিক এসে বসে প্রাণ জুড়োয়। গঙ্গার শীতল হাওয়া বৃক্ষের পাতায় পাতায় লুকোচুরি খেলে পথিকের গায়ে এসে পরশ লাগায়।

ভূপতি রায়ের ছেলে গোলাপ একা বসে ছিল বেদীর ওপর। মাঝে মাঝে সে

এখানে এসে বসে, যখন কেউ থাকে না। সে দু'চোখ মেলে গঙ্গার দৃশ্য দেখে, ওপারের দিকে চেয়ে থাকে। ওপারের গাছপালার মধ্য দিয়ে নিজের কল্পনায় সৃষ্ট ছায়া শীতল এক গ্রাম্য পথে চলতে থাকে সে। তখনি একটা কামরাঙা গাছের নীচে বুঝি দেখা হয়ে যায় তার মানস-প্রিয়ার সঙ্গে। এই মানস-প্রিয়াই তার পদ রচনার সায়ার রচনার প্রেরণাদাত্রী। কিন্তু কামরাঙা গাছ ছাড়া অন্য কোন গাছ তার কল্পনায় কিছুতেই আসে না। কত ভাল ভাল গাছ আছে—তাল তমাল কদম্ব আরও কত কি। অথচ ছেলেবেলায় গ্রামের বাড়ির পাশে দেখা ওই কামরাঙা গাছ, যা এখনো রয়েছে, তার শিশু মনে বড় বেশী গেঁথে গিয়েছে। এক এক সময় মনে হয় এই কামরাঙা গাছই কাব্য প্রতিভা বিকাশের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুতেই সে সার্থক হয়ে উঠতে পারছে না। ওই গাছ তার মানস-প্রিয়ার রূপকে স্পষ্ট হতে দিচ্ছে না। যেন অশরীরী কেউ।

হয়ত একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল গোলাপ রায়। কিংবা এমনও হতে পারে, পদের মিল খুঁজতে চোখ বন্ধ করেছিল। ঠুং করে একটু শব্দ হতে সে চমকে চোখ মেলে। আর চোখ মেলতে আর এক চমক। তার মানস-প্রিয়া মূর্তিমতী হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে তার পেতলের কলসী। কলসী শান-বাঁধানো বেদীর কোণে ধাক্কা খাওয়ায় ঠুং করে শব্দ হয়েছিল।

একেই বলে রূপ। এ রূপ কোথায় ছিল। এই মুর্শিদাবাদে। গোলাপ তন্ময় হয়ে চাইতে পারে না। সঙ্কোচবোধ করে। কুমারী বোধহয় খুবই অন্যমনস্ক। নইলে তরতাজা এক যুবককে গাছের এক পাশে বসে থাকতে দেখেও তার নজরে পড়ছে না কেন?

কুমারী কলসী কাঁখে নেয়, গঙ্গার দিকে একবার হতাশ দৃষ্টিতে তাকায়। শেষে অস্ফুট স্বরে বলে—কি করে নামব?

গোলাপ রায়ের কবি-মন কেঁদে ওঠে। এই বিপদে যদি এই রূপসী কন্যাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিতে পারি, ধিক্ তার জীবন।

—আপনি গঙ্গাজল নিতে এসেছেন?

লজ্জা আর ভয়ে কুমারী কেমন হয়ে যায়। কোনরকমে বলে—হ্যাঁ।

—আমি এনে দিচ্ছি। আমাকে কলসী দিন।

—কিন্তু।

—কিন্তু কি?

—ব্রাহ্মণ না হলে যে হবে না।

—গঙ্গাজলের ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ নেই। যে কেউ এনে দিতে পারে।

—না। ওঁরা ভীষণ গোঁড়া।

—বেশ। এই দেখুন পৈতে। আমি ব্রাহ্মণ। দিন।

মেয়েটি কলসী দেয় গোলাপকে। তার বুক কাঁপতে থাকে। বাবা মাসছয়েক

হলো মারা গিয়েছে। কাকার আশ্রয়ে থাকে। প্রায় অরক্ষণীয়া হয়ে পড়েছে। তাই বাড়ির সবার রাগ তার ওপর। এমনকি তার মায়েরও। তার রূপ আছে গুণ আছে কিন্তু ঠিকুজীতে মিলছে না। তার রাশি ইত্যাদি নাকি খুব চড়া। পাত্রপক্ষ ভয় পেয়ে যায়। এই সব মেয়েদের বৈধব যোগ না থাকলেও বিধবা হয়। অথবা স্বামীকে তারা ভেড়া বানিয়ে রাখে।

বাড়ির সবার বিশ্বাসের প্রমাণ মিলল একটু পরেই। গোলাপ কলসী নিয়ে এসে কন্যাকে দিতে তার মুখে মিষ্টি হাসি ফোটে। অবাক হয়ে গোলাপ ভাবে এ এখনো অবিবাহিতা। কি করে সম্ভব? কত প্রশ্ন মনে, অথচ জানবার উপায় নেই। তার মন খারাপ হয়ে যায়, এখুনি কলসীটা নিয়ে মেয়েটি চলে যাবে।

মেয়েটি বলে ওঠে—ওঁরা যে বিশ্বাস করবেন না।

—কি বিশ্বাস করবেন না। আমাকে বলুন আমি দেখছি।

—ওঁরা জানেন এখন ভাঁটা চলছে। সেজন্যে পাঠালেন। আমার পায়ে কাদা নেই। ওঁদের সন্দেহ হবে। আমি বরং—

—না না, যাবেন না, একটু দাঁড়ান।

গোলাপ ছুটে নীচে গেল। দুহাতে কাদা তুলে নিল। তারপর ছুটে এসে কুমারীর পায়ের কাছে বসে পড়ে দুহাত দিয়ে পায়ের পাতায় কাদা মাখিয়ে দেয়।

—একি! আপনি ব্রাহ্মণ।

মনে মনে গোলাপ বলে—দেহি পদপল্লব মুদারং!

—একি করলেন? কি করব এখন?

—কিছু করতে হবে না। আমি রোজ এখানে বসব এবার থেকে।

মেয়েটি কাঁখে কলসী নিয়ে চলতে চলতে একবার পেছনে ফেরে, তারপর একটা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে গোলাপের মন আফশোষে ভরে ওঠে। কোন্ বাড়ির কন্যা জানা হলো না। তবু এতদিন পরে তার মানস-প্রিয়ার মূর্তি পরিস্ফুট হলো। এবারে আর ওপারের কোন কামরাঙা গাছের ছবি ফুটে উঠবে না। এবারে পঞ্চবটী। গঙ্গার পলি মানস প্রিয়ার পায়ে।

একটু পরেই গোলাপ দেখে পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে খোজা রহিম। রহিম লুকিয়ে লুকিয়ে সায়ার লেখে আর বান্দাগিরি করে দেওয়ান সাহেবের নাতির। গোলাপকে সে খাতির করে। তাকে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে আসে।

হেসে বলে—হাতে কাদা মেখে বসে আছেন কেন?

—এঁ্যা। হাতে কাদা?

—জানেন না?

—এ তো কাদা নয়, এ চন্দন রহিম। আমার মনের আগুনে এই চন্দন পুড়িয়ে ধূপ সৃষ্টি করব।

রহিম বুঝতে পারে কবির ভাব উঠেছে। মুঘল হারেমে দিল্লীতে এক বেগমের

এমন ভাব উঠত। তিনিও লিখতেন। এক শাহজাদার বেগম তিনি। এখনো হয়ত বেঁচে আছেন। যেদিন শুনতেন শাহাজাদা তাঁর ঘরে আসবেন, সেদিন মন খারাপ হয়ে যেত। সায়ার লিখতে পারবেন না। কত লিখেছেন। কোথায় গেল সে সব কে জানে? হারেমের গুমড়োনো ব্যথার মত এই সব কবিতার হদিস কেউ কখনো পারে না। হারিয়ে যাবে।

রহিম বলে—আমি চলি।

—কোথায় চললে?

—একটা জমি কিনেছি। বাড়ি বানাব।

—সেকি? দিল্লীতে ফিরবে না?

—না। এ দেশে থেকে যাব। পরে কথা হবে।

—আচ্ছা।

রহিম ফিরে দাঁড়িয়ে বলে—লালবাগ কাল ভোরবেলা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে।

—কেন?

—ফারুকশিয়ার চলে যাচ্ছেন।

—কোথায়?

—শুনছি তো পাটনায়। জানিনা কি হবে।

—আমি জানি, ফারুকশিয়ারকে তুমি পছন্দ করতে।

—ওসব কথা আমাদের মুখে মানায় না। তবে মানুষটি ভাল।

রহিম চলে যায়।

গোলাপ রায় গুটিগুটি হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির আঙিনায় পা দেয়। রোজ সে চোরের মত বাড়ি ফেরে। সব সময় একটা অপরাধবোধ তাকে পীড়া দেয়। তার ধারণা সংসারে সে কোন কাজে লাগবে না।

উঠোনে পা দিয়ে দেখে ভূপতি রায় আহারের পরে সামান্য দিবানিদ্রা সেরে দেওয়ানখানায় যাওয়ার আগে আলবোলায় তামাক সেবন করছে। মুর্শিদাবাদে এসে এতো দেখেও সে বাবার সেই গ্রামের তামাক খাওয়ার কথা ভুলতে পারে না। মজা লাগে ভেবে। হুঁকোর ওপর কল্কে সাজিয়ে উঁচু হয়ে বসে দুই হাঁটু এক করে তামাক খেত। কত পরিবর্তন। তারও কি কম পরিবর্তন হয়েছে? তার মা কাকীমার কত গয়না, কত দামী দামী শাড়ি। গ্রামে জোলার তৈরী শাড়ি পরে পরে ছিঁড়ে যেত, তবু অন্য শাড়ি জুটতো না। গোলাপ ভাবে, বাবা কাকা সবাই বলে তার মাথায় কিছু নেই। অথচ এতসব অতীত কাহিনী মনে থাকে কি করে? এগুলো ভুলে গেলেই তো ভাল হতো। শুধু জেগে থাকত তার হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিতা সদ্য দেখে আসা মানস প্রিয়া। ওর অমন ফুলের মত পায়ে কাদা মাখিয়ে দেবার সময় নিজেকে জল্লাদ বলে মনে হচ্ছিল।

—শোন।

বাবার গলার স্বরও পালটে গিয়েছে। এখন অনেকটা দেওয়ান সাহেবের গলার মত শুনতে লাগে। যেন সিংহ গর্জন। ধীরে ধীরে ভূপতি রায়ের সামনে গিয়ে নতমস্তকে দাঁড়ায় গোলাপ।

—কোথায় গিয়েছিলে?

—নদীর ধারে।

—কি করতে গিয়েছিলে?

গোলাপ জবাব দিতে পারে না। সত্যি তো, কি করতে গিয়েছিল সে? কোন কাজ ছিল না এমনিতে।

—এভাবে কতদিন চলবে? আমার আর কিশোরের তুমি একমাত্র সন্তান। অনেক উপায় করেছি। বুঝলাম তোমার দ্বারা কিছু হবে না। কিন্তু যেটুকু করেছি তা রক্ষা করার ক্ষমতা থাকতে হবে। আজ তুমি যদি অপদার্থ না হতে তাহলে রঘুনন্দনের ভাই রামজীবনের মত ভূসম্পত্তির মালিক হতে পারতে। রঘুনন্দন কত কম বয়সে এসে কি রকম গুছিয়ে নিল, ভাবার চেষ্টা করেছ কখনো?

গোলাপ ফস্ করে বলে বসে—অত সম্পত্তি রাখাও ঝামেলা শুনি। এতটুকু এদিক ওদিক হলে মীর্জা রেজা খাঁ নাকি খুব অত্যাচার করেন।

—এদিক-ওদিক হবে কেন? শোন, তুমি বড় বাইরে বাইরে ঘোরো, তোমাকে এবারে ঘরমুখো করতে হবে।

—না না, মীর্জা রেজাকে আমার কথা বলবেন না। আমি বাইরে বেশী ঘুরব না। শুধু সকালে আর বিকেলে—

—বোকার মত কথা বলো না। তোমাকে আমি বিয়ে দেব ঠিক করেছি। মেয়েও ঠিক।

চোখ বড় বড় করে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে গোলাপ—না, না।

ঘর থেকে মা ছুটে বাইরে আসে। দরজার আড়ালে কাকীমা এসে দাঁড়ায়। ভূপতি রায়ের মত সবাই বিস্মিত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চোখাচোখি হয়। বড় জা ছোট জায়ের দিকে তাকিয়ে নেয়। ছেলে কি মেয়েদের দেখতে পারে না? নাকি ভয় পায়? ওর সেরকম কোন অসুখ তো নেই।

—তোমার আপত্তির কারণ?

—আমি—

—তুমি কি? কখনো বিয়ে করবে না?

—তা করব।

—এখন করতে চাও না কেন?

—না, ঠিক তা নয়।

—তবে কি?

—আমার যেন মনে হয় নদীর তীরে ওই পঞ্চবটী যেখানে আছে, তারই কাছাকাছি

কোথাও বিয়ে হবে। মনে হয়, মানে স্বপ্নে দেখেছি। মানে মা, কোন্ মা যেন, হ্যাঁ মা কালী এসে বলছেন—এই মেয়েকে বিয়ে করবি।

—কোন্ মেয়ে?

গোলাপের ঘেমে গিয়ে ধাত ছেড়ে যাবার অবস্থা। সে বলে—তা তো জানি না। ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

—ঠিক আছে। যাও।

এবারে দুই ভাই এ কথা হয়, স্বামী-স্ত্রীতে কথা হয়, জায়ে জায়ে কথা হয়। তারা বলাবলি করে, গোলাপ সাদাসিদে হলেও মা কালীর আশীর্বাদ নিশ্চয় আছে। নইলে এমন মিলে গেল কি করে?

ফারুকশিয়ার বাংলা থেকে বিদায় নেয়। আগের দুদিন থেকে শকট, অশ্ব, হস্তী সব কিছু এনে রাখা হয়েছিল লালবাগের প্রাসাদের সামনের মাঠে।

ভোরবেলা যাত্রা সুরু হলো অনিশ্চিতের পথে। এমন অনেক মুঘল বংশের শাহজাদা যাত্রা করেছেন অতীতে কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। এই বাংলা থেকে শাজাহান-পুত্র সুজা মসনদের দাবীদার হয়ে যাত্রা করেছিলেন সসৈন্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাগ্য তাঁকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে খেলতে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছিল।

ফারুকশিয়ারের গতিবিধি সব কিছুর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল মুর্শিদকুলী খাঁ। কিন্তু যখন খবর পেল জাহাঙ্গীর নগর থেকে ফারুকশিয়ারের সব চেয়ে সেরা এবং বিশ্বস্ত সৈন্যদল তার সঙ্গে পথিমধ্যে যোগ দেবার জন্য যাত্রা করেছে, তখন মুর্শিদকুলী খাঁ বিচলিত হলো। আগে একবার ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মসনদের লড়াই এর সময় আজিম-উস-সানের উদ্যোগে বাংলা থেকে প্রেরিত অর্থ লুঠ হয়েছিল। এবারও রাজকোষের জন্য অর্থ পাঠানো হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে তেমন বড় সৈন্যদল নেই। তাড়াতাড়ি দূত পাঠালো মুর্শিদকুলী খাঁ উড়িষ্যায় তার জামাতা সুজাউদ্দিনের কাছে। সুজাউদ্দিনকে বলা হলো সে যেন বড় একদল সৈন্য নিয়ে এই মুহূর্তে উড়িষ্যা ত্যাগ করে সেই অর্থের সঙ্গে প্রেরিত সৈনদলের নেতৃত্ব দেয়। সে যেন নির্বিঘ্নে ওই অর্থ বাদশাহ জাহাঙ্গীর শাহের কাছে পেঁছে দেয়। সুজাউদ্দিন বহুদিন পরে কাজের মত কাজ পেয়ে ছুটলো। এতদিন পরে বাদশাহের দরবারে যাওয়ার একটা সুযোগ মিলল। সেখানে তার স্বদেশ থেকে আসা কারও দেখা পেলে আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করবে। তাছাড়া বাদশাহের নেকনজরে কে না পড়তে চায়।

ফারুকশিয়ার পাটনা অভিমুখে যাত্রা করার সাত-আট দিনের মধ্যে দেখা গেল, তার সৈন্যদলের সংখ্যা বেশ বেড়ে গিয়েছে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অনেকে সঙ্গে চলেছে। পাটনায় পিতা আজিম-উস-সানের হয়ে এখনো কাজ করে চলেছে সৈয়দ হুসেইন আলি খাঁ। সৈয়দ হুসেইন আলি এবং তার ভাই সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ এই দুই ভাই বাহাদুর

শাহ মসনদে বসার আগে আজিম-উস-সানকে প্রচুর সাহায্য করেছিল। দুই ভাই বীর এবং কৌশলী যোদ্ধা। তারা সুনিপুণ প্রশাসক। সব চেয়ে বড় কথা তারা নিজেদের জাহাপনা হজরত মহম্মদের বংশধর বলে দাবী করে এবং সবাই স্বীকারও করে। বাহাদুর শাহ বাদশাহ হওয়ার অল্পদিন পরেই আজিম-উস-সান্-আবদুল্লা খাঁকে তার জায়গায় এলাহাবাদে এবং সৈয়দ হুসেইন আলি খাঁকে বিহারে সুবাদার হিসাবে নিযুক্ত করেছিল বাহাদুর শাহকে বলে।

ফারুকশিয়ার ভাবে, সৈয়দ হুসেইন আলি কি তার বাবার প্রতি এখনো কৃতজ্ঞ? অত বড় বংশ যার, সে কি উপকারীর উপকারে বিস্মৃত হবে? তবু একথা স্বীকার করতে হবে, সে বর্তমান বাদশাহের হুকুম অমান্য করতে পারে না। তার বিরুদ্ধতা করতে পারে না। তাই নগরীতে প্রবেশ না করে নগরীর বাইরে শিবির স্থাপন করে রুক। তারপর সৈয়দের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ব্যক্ত করে একটি পত্র প্রেরণ করে। পত্রের মর্মার্থ হলো: আপনার কাছে আজ সাহায্যের জন্যে উপস্থিত হয়েছি উপায়ান্তর না দেখে। আমার পিতা আজিম-উস-সান্ আপনাদের উভয় ভ্রাতাকে এককালে খুবই পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। আপনি সেকথা ভুলে যাননি, এই আশা নিয়ে আজ আপনার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছি।

সৈয়দ হুসেইন রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। সে জানে, আজিমের প্রতি বিরক্ত হয়ে বড় বড় আমীর-ওমরাহ সবাই জাহাঙ্গীর শাহের পক্ষে যোগ দিয়ে তাঁকে রীতিমত শক্তিশালী করে তুলেছে। এক্ষেত্রে তাঁর বিরোধিতা করার অর্থ নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনা। তাই সে ঠাণ্ডা ভাবে খুব বিনয়ের সঙ্গে লিখল যে, অতীতের সব কথা তার মনে আছে। আজিম উস-সানের উপকার সে কখনো ভুলবে না। কিন্তু এখন সে কিছু করতে অক্ষম। কারণ ইতিমধ্যে সে বাদশাহের আদেশ পেয়ে গিয়েছে ফারুককে বন্দী করার জন্য।

বিধবা সাহেবউন্নিসা, ফারুকের স্ত্রী সবাই মিলে তখন পরামর্শ করে। অবশেষে ঠিক হয়, মির্লোখিকে কিছু কথা শিখিয়ে দিতে হবে। তার মিষ্টি কথায় পাষাণ গলে। তাই একবার যদি সৈয়দ হুসেইনকে কোনরকমে এখানে এনে উপস্থিত করা যায়, তাঁকে নিজেদের পক্ষে টানা যেতে পারে।

ফারুক আবার লেখে: আপনার পত্র পেয়ে সব অবগত হলাম। আমি আপনার অবস্থার কথা সম্যক উপলব্ধি করছি। তবে আমাদের একজন হিতৈষী হিসাবে প্রার্থনা করছি আপনি একবার অন্তত আমাদের শিবিরে আসুন এবং আমাদের সদুপদেশ দিন। তারপর না হয় আমি পাটনা থেকে চলে যাব।

হুসেইন আলি খাঁ এই প্রার্থনা উপেক্ষা করতে পারল না। সে ফারুকশিয়ারের শিবিরে গিয়ে উপস্থিত হলো পরদিন।

ফারুকশিয়ার বাদশাহের পোষাকের মত বহু মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান করে সৈয়দকে অত্যন্ত সৌজন্য সহকারে অভ্যর্থনা করে শিবিরের অভ্যন্তরে নিয়ে এলো।

তারপর ধীরে ধীরে আলোচনা সুরু হলো। আজিম-উস-সান্ কীভাবে নিহত হয়েছে বলা হল। তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা করিমকে কেমন নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়েছে বলল ফারুক। এরপর তাকে হত্যার পালা। সে জানে প্রথমে তাকে দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে—তারপর হত্যা। এই তার ভাগ্যের লেখা। শুধু এইজন্যই সে সৈয়দের সহায়তা চায়।

সৈয়দ হুসেইন সব কথা সহানুভূতির সঙ্গে শুনল। তারপর বলল—আমার হাত পা বাঁধা। আমার কিছু করার নেই।

ঠিক সেই সময় পর্দার আড়াল থেকে ফারুকের কন্যা মিলেখি জামান্ বাইরে এলো। সে টল্‌টলে চোখে বলে ওঠে—আমার দাদু আপনার কথা কত বলতেন। তিনি আপনার উপকার করেছিলেন। তিনি বলতেন আপনি পয়গম্বর হজরত মহম্মদের বংশে জন্মেছেন। শুনে আমার কী আনন্দ হতো। তখন আমি আরও ছোট। হজরত মহম্মদ বলতেন—উপকারীর উপকার কখনো ভুলে যেও না। তাই না?

স্তব্ধ বিস্ময়ে সৈয়দ মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে। এ কথা ও বলল কি করে? অত সুন্দর ভাবে? ওর কথায় যে হৃদয় গলে যায়।

সেই সময় আজিম-উস-সানের বিধবাও পর্দার বাইরে এলো। একজন বলতে গেলে এখনো শিশু, অপরজন বয়স্কা। সুতরাং অপরিচিত পুরুষের সামনে আসা অতটা অন্যায় নয়। সাহেবউন্নিসা অনুরোধ করতে করতে চোখে জল এনে ফেলল। আর পর্দার আড়ালে অল্পবয়সী বেগম এবং রমজীকুন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। তাদের কান্নায় সৈয়দ রীতিমত বিচলিত হয়ে ওঠে। সে তার ডান হাতখানা সামনে প্রসারিত করে বলে ওঠে—আমার বেশী কি দেওয়ার আছে? এই জীবনটা। তাই তো? আজ থেকে আপনাদের জন্যে এই জীবন উৎসর্গ করলাম।

ফারুকশিয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তার তলোয়ার সৈয়দ হুসেইনকে দিয়ে বলে—আপনার প্রতি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব।

পরদিনই মহা আড়ম্বরের সঙ্গে শাহজাদা ফারুকশিয়ারকে মসনদে বসিয়ে হিন্দুস্থানের বাদশাহ বলে ঘোষণা করা হলো। আর এই ঘোষণার কথা বার্তাবাহকেরা নিয়ে গেল দেশের প্রতিটি প্রান্তে জানিয়ে দেবার জন্যে।

আর সেইদিনই ফারুকশিয়ারের অতি পরিচিত রসিদ্ খাঁ নামে এক ব্যক্তি নতুন বাদশাহের কাছে এক আর্জি পেশ করল। তার বহুদিনের বাসনা বাংলার সুবাদার হয়। এতদিনে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার সুযোগ এসেছে। সে জানে মুর্শিদকুলী খাঁ নতুন বাদশাহকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সে জানে ফারুকশিয়ার চলে যাবার পর মুর্শিদকুলী খাঁ প্রকারান্তরে বাংলার সুবাদারের ভারপ্রাপ্ত। এদিকে তার সৈন্য-সংখ্যা তেমন কিছুই নেই। সেদিকে তার নজর কম। সুতরাং এই সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। ফারুকশিয়ারকে সে বোঝায়। ফারুক সহজেই বোঝে। মুর্শিদকুলী খাঁর ওপর সে চটে ছিল। রসিদ খাঁ মানুষটিকে বিশ্বস্ত বলে মনে হয়। লোকটা বাংলার

এক অভিজাত বংশের মানুষ। সুতরাং মন্দ কি ?

রসিদ খাঁ সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করে। সে জানে, যুদ্ধটা হবে নিয়মরক্ষা গোছের। মুর্শিদকুলী খাঁর পক্ষে তাকে সামলানো সম্ভব হবে না। যেদিন সে মুর্শিদাবাদে পেঁছিবে, সেদিন থেকেই বাংলার নতুন সুবাদারের তত্ত্বাবধানে চলে যাবে।

মুর্শিদকুলী খাঁ শুনলো এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে রসিদ খাঁ শকরিগলির কাছে চলে এসেছে। সে এগিয়ে আসছে মুর্শিদাবাদের দিকে। কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁ ভ্রুক্ষেপ করল না। সে তার দৈনন্দিন কাজকর্ম নিয়মিতভাবে করতে থাকে। কদিন পরে খবর এলো রসিদ খাঁ মুর্শিদাবাদের প্রায় কাছাকাছি এসে গিয়েছে। শুনে সে দুহাজার অশ্বারোহী তৈরী করতে বলল। তারপর সে মীর বাঙালী আর সৈয়দ আনোয়ার জৌনপুরী নামে দুই সেনাপতি নির্বাচন করে রসিদ খাঁর বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দিল। তারপর প্রতিদিনের মত কোরাণ নকল করতে বসে গেল।

মুর্শিদকুলী খাঁ নিবিষ্ট মনে কোরাণ নকল করে চলছিল কদিন পরে। এমন সময়, আর কেউ নয়, স্বয়ং বেগম সাহেবা তাড়াতাড়ি এসে বলে—খবর এসেছে।

—কোথা থেকে ?

—করিমাবাদ—যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে।

—বুঝেছি। খারাপ খবর তো ?

—হ্যাঁ। সৈয়দ আনোয়ার নিহত।

—হুঁ। মীর বাঙালী ?

—রসিদ খাঁ তাকে ঘিরে ধরেছে। সে সাহায্য চাইছে। বার্তাবাহককে খুবই উত্তেজিত দেখলাম।

—তাকে বল, মীর বাঙালীকে বলতে, আমি যাচ্ছি।

—কখন যাবে ?

—এটা শেষ করি।

—ততক্ষণে মীর বাঙালীও মরবে। চেহেল সেতুনে এসে ঢুকবে রসিদ খাঁ।

মুর্শিদকুলী খাঁ কোন কথা না বলে কোরাণ নকল করা শেষ করে। তারপর ফতেহা-ই খয়ের আবৃত্তি করতে শুরু করে। সে যুদ্ধ যাত্রার জন্য নিজেকে অস্ত্র-সজ্জিত করে। তারপর পরিচিত আত্মীয়-স্বজন, হাবসী, তুর্কী যে সমস্ত সৈন্য ছিল তাদের নিয়ে হস্তীপৃষ্ঠে উঠে করিমাবাদের দিকে রওনা হয়। সেখানে পেঁছে রসিদ খাঁর অবস্থান দেখে নিয়ে মুর্শিকুলী খাঁ দুয়া-ই-সৈফি শুরু করে। মীর বাঙালীর অধীনের সেন্যরা হস্তীপৃষ্ঠে খোদ মুর্শিদকুলী খাঁকে দেখে নতুন শক্তি পায়। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুপক্ষের ওপর।

রসিদ খাঁ মুর্শিদকুলী খাঁর অগ্রগমনকে হেয় চোখে দেখছিল। তার মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠেছিল। ওদিকে মুর্শিকুলী খাঁ অনর্গল দুয়া-ই-সৈফি বলতে

লাগল। আর সেই সময় ঘটলো এক অলৌকিক ঘটনা। মুর্শিদকুলী খাঁর খরসান কার খাপ থেকে আপনা হতে নির্গত হয়ে এক অদৃশ্য শক্তি দ্বারা চালিত হয়ে অসংখ্য শত্রু নিধণে ব্যাপৃত হলো। ওদিকে রসিদ খাঁর সৈন্যরা দেখল, মেঘের আড়াল থেকে সবুজ পোষাক পরিহিত অসংখ্য সৈন্য উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে নেমে এসে তাদের হত্যা শুরু করল। রসিদ খাঁয়ের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হতে সবুজ পোষাকের সৈন্যরা আবার মেঘের আড়ালে চলে গেল। আর এদিকে মীর বাঙালী তার ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করল। সেই তীর রসিদ খাঁর কপাল ভেদ করে মাথার পেছন দিকে অনেকটা বের হয়ে এলো। রসিদ খাঁ হাতির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আর নিরাসক্ত মুর্শিদকুলী খাঁ একবার প্রার্থনার ভঙ্গীতে আশমানের দিকে চাইল। সে জানে এই দুয়া হজরত মহম্মদ বদরের যুদ্ধ করেছিলেন। এই দুয়া বিপর্যয় থেকে যুদ্ধকে জয়ের পথে নিয়ে এসেছিল সেদিন।

খবরটা পাটনায় গিয়ে পেঁছোলো। ফারুকশিয়ার একটু দমে যায়? তবে তখন তার লক্ষ্য দিল্লী। বাংলায় এই সাময়িক বিপদটা তার মনে বেশীক্ষণ ছায়া ফেলতে পারল না। সারা হিন্দুস্থান জেনে গিয়েছে সে জাহাঙ্গীর শাহের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করেছে। তার অনেক ধন-দৌলত। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তার পক্ষে। তাছাড়া সব চেয়ে বড় কথা বাংলা থেকে যে অর্থ আসছিল, মুর্শিদকুলী খাঁর জামাতা সুজাউদ্দিনের তত্ত্বাবধানে সেই অর্থ এখন ফারুকশিয়ারের কবজায়। এদিকে পাটনা এবং এলাহবাদের যত বড় বড় শেঠ আর বণিক সৈয়দদের প্রভাবে ফারুককে মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করে। কাশীতে এসেও ফারুকশিয়ার অনেক অর্থ পেলেন। অনেক বড় বড় কর্মচারী তার পক্ষে যোগ দিল। আসলে সবাই তখন জাহাঙ্গীর শাহ আর তার ওমরাহ আর লোকজনের ব্যবহারে তিক্ত বিরক্ত।

ফারুকশিয়ারের অগ্রগমন অব্যাহত রইল। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তার সঙ্গে রয়েছে। তারা এসে পেঁছালো সেইখানে যেখানে ঔরঙ্গজেব আর সুজার মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল বহুদিন আগে। সৈয়দদের মুখে একথা শুনে ফারুকশিয়ার ভাবে সুজাও এসেছিলেন বাংলা বিহার থেকে। সে মনে মনে প্রার্থনা করে তার ভাগ্য যেন সুজার ভাগ্যের মত না হয়। তেমন ফল হলো না। এখানে জাহাঙ্গীর শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র আই-উদ্দিন ফারুকের কাছে পরাস্ত হয়।

অবশেষে আগ্রার কাছে ফারুকশিয়ার বাদশাহ জাহাঙ্গীর শাহের সৈন্যের সম্মুখীন হয়। এই যুদ্ধ চলে সারা দিন। জাহাঙ্গীর শাহের সৈন্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা বলতে কিছু ছিল না। সব যেন ছন্নছাড়া। পরাজিত হবার জন্যে তৈরী হয়ে যেন ফারুকের সম্মুখীন হয়েছে তারা এবং পরাজিত হলো।

জাহাঙ্গীর তার নর্মসহচারী লাল কোয়ারকে নিয়ে হস্তীপৃষ্ঠে প্রথমে গেলেন আগ্রায়। কিন্তু সহজেই লোকে তাকে চিনে ফেলতে পারে। তাই হিন্দুদের মত

মাথার চুল দাড়ি গোঁফ সব কামিয়ে ফেললেন। তারপর লালকে নিয়ে দিল্লীর পথে পালালেন। সেখানে কেল্লায় না গিয়ে উজির আসাদ-উ-দ্দৌলার বাসভবনে আশ্রয় নিলেন। উজির জানত এটা মারাত্মক হতে পারে। মনে মনে স্থির করে তেমন কিছু দেখলে বাদশাহকে ফারুকের হাতে দিয়ে দেবে। কিন্তু উজিরের পুত্র আমীর উলউমর বাদশাহকে শত্রুর হাতে তুলে দেবার পক্ষপাতী নয়।

যা হোক ফারুকশিয়ার বাদশাহের পশ্চাদ্ধাবন করে দিল্লীতে এসেই জেনে যায় বাদশাহের আশ্রয়স্থল কোথায়। সে প্রধান উজিরের গৃহ ঘেরাও করে বাদশাহকে তার হস্তে সমর্পণের আদেশ দেয়। প্রধান উজির সঙ্গে সঙ্গে জাহাঙ্গীর শাহকে ফারুকের হাতে তুলে দেয়। সেই সঙ্গে একটা চিঠিতে জানায় যে ভূতপূর্ব বাদশাহকে সে ফারুকশিয়ারের হাতে তুলে দেবার জন্য বন্দী করে রেখেছিল।

ইতিমধ্যে ফারুকশিয়ার মসনদে আরোহণ করে আনুষ্ঠানিক ভাবে হিন্দুস্থানের বাদশাহ হলেন। তিনি দিল্লীর উপকণ্ঠে শিবির স্থাপন করে উজির আসাউদ্দৌলা ও তার পুত্রকে তাঁর সামনে আনতে আদেশ দিলেন। তারা উভয়েই উচ্চ পদাধিকারী। তাই তাদের মর্যাদার সঙ্গে অভ্যর্থনা করা হলো। তারপর বাদশাহ প্রধান উজিরকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে বললেন। তার পুত্রকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শিবিরে রাখা হলো। পরদিন দিল্লীবাসী দেখল জাহাঙ্গীর শাহের দেহের পাশাপাশি উজির পুত্রের মৃতদেহ ঝুলছে একটি নগর প্রদক্ষিণরত হস্তীপৃষ্ঠ থেকে। মাথা তাদের নীচের দিকে। আগের রাতে তাদের গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

ফারুকশিয়ারের মসনদে আরোহণের খবর মুর্শিদাবাদে এসে পেঁছোলো সন্ধ্যা গড়িয়ে যাবার পর। সংবাদ শুনেই দর্পনারায়ণ ছুটে গেল জয়নারায়ণের বাড়িতে।

—কি বুঝছ হে, জয়নারায়ণ?

জয়নারায়ণ দর্পনারায়ণের এত উৎসাহের কারণ বুঝতে পারে না। সে বলে --দেখা যাক।

—আর কি দেখবে! এবারে হয়ে গেল।

—কি হলো?

—জাফর খাঁর কপাল পুড়লো।

—তাতে কি সুবিধে হবে কিছু?

—তা অবিশ্যি বলা যায় না। তবে আমার অসুবিধা কিছু হবে না। আমাকে হটায় কোন্ শর্মা?

জয়নারায়ণের এ ধরনের কথা শুনতে ভাল লাগে না। ভয়-ভয় করে। দর্প-

নারায়ণ এ-সব আলোচনা না করলেই পারে। ওই তো রঘুনন্দন রয়েছে। এত অল্পবয়সী অথচ এতটুকু ফালতু কথা বলে না কাজের কথা ছাড়া। ছেলেটি কাজও শিখে নিয়েছে কত চট্‌পট। দেওয়ান সাহেব ওকে এত স্নেহ করেন যে ওর ভাই রামজীবনকে ঢেলে দিয়েছেন। এখন বোধহয় রামজীবনের জমিদারী সব চাইতে বড়।

—কি হে জয়নারায়ণ, তোমাকে বড় চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে।

একটু হেসে জয়নারায়ণ বলে—আমি আর কি চিন্তা করব? আমি সামান্য মানুষ।

সেই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে রঘুনন্দন এসে প্রবেশ করে ওখানে।

—একি! রঘুনন্দন? তুমি আমাদের খোঁজ কি করে পেলে?

—আপনার বাড়ি গিয়েছিলাম। সেখানে শুনলাম, আপনি এখানে থাকতে পারেন।

—কেন? আমার কাছে কেন? এই রাতে?

—উনি ডাকছেন। এখুনি।

—এখুনি? কোথায়?

—চেহেল সেতুনে।

—জয়নারায়ণকে ডাকেননি।

—আপনার কথা শুধু বলেছেন আমাকে।

—তুমি কোথায় ছিলে?

—বাড়িতে। উনি লোক পাঠিয়েছিলেন! আপনাকে খুঁজে নিয়ে যেতে বলেছেন। আপনার বাড়িতে আপনাকে ওঁর লোক পায় নি।

—দেখ দেখি কাণ্ডকারখানা। তা জয়নারায়ণ যাবে নাকি হে?

—আমাকে মিছিমিছি নিয়ে গিয়ে কি করবেন? উনি আপনাকে চান।

চেহেলসেতুনে মুর্শিদকুলী খাঁ একা বসেছিল। ওরা দুজনে আসতে বলে ওঠে—খবর পেয়েছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কাল সকালে চলে আসুন দেওয়ানখানায়। বাকী নজরানা এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন বাদশাহকে পাঠাতে হবে। খুব জরুরী।

দর্পনারায়ণ ঘাড় কাত করলে মুর্শিদকুলী খাঁ বলে—রঘুনন্দনকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

ওরা বাইরে যেতে ফারুকশিয়ারের মুখ ভেসে ওঠে মুর্শিদকুলী খাঁর চোখের সামনে বিশেষ করে যেদিন সে টাকা দিতে অস্বীকার করেছে। সেদিনের সেই মুখের কথা ভুলতে পারে না। ফারুকশিয়ারকে সে কখনো অধৈর্য হতে দেখেনি তার বাবার মত। তবু সেদিন তাঁর মুখখানা চাপা ক্রোধে আরক্তিম হয়ে উঠেছিল। এই টাকা তাঁর কাছে পৌঁছোনোর আগে অন্য এক হুকুমনামা আসতে পারে বাদশাহের কাছ থেকে। এই

বাদশাহ তারই সামনে একদিন ধীরে ধীরে কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন। সাদি হলো, মেয়ে হলো। সবই বলতে গেলে চোখের সামনে! তবে সবটুকু দেখা হয়ে ওঠেনি মুর্শিদাবাদে চলে আসার জন্যে। নতুন বাদশাহ প্রথমে জাহাঙ্গীর নগরে থাকতেন।

রাস্তায় এসে দর্পনারায়ণ রঘুনন্দনকে বলে—কাল তুমি আমাকে ডেকে নিয়ে যেও।

—ঠিক আছে।

—ওকে কেমন দেখলে?

রঘুনন্দন একটু অবাক হয়। প্রশ্নের ধরনে যেন খুশী-খুশী ভাব। আসলে রামজীবনকে নিয়ে তার দুর্ভাবনা আছে। মুর্শিদকুলী খাঁর ভাগ্যের সঙ্গে তার আর তার ভাই-এর ভাগ্য যে জড়িত একথা দর্পনারায়ণ ভালভাবে জানে। তাই তার এধরনের কথায় অবাক না হয়ে পারে না।

—চুপ করে আছ কেন রঘুনন্দন! দেওয়ান সাহেবকে গম্ভীর দেখালো না?

—নতুন বাদশাহ। ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক।

দর্পনারায়ণ আর কিছু বলে না। সে জানে রঘুনন্দন দেওয়ান সাহেবের লোক। এর কাছে ঝেড়ে কাসা উচিত নয়। আসলে দর্প চায় নতুন কোন দেওয়ান—যে হিসাবনিকাষ এত বেশী বুঝবে না। এর কাছে কাজ করা বড় কষ্টকর। তবে লোকটা এখন বুঝেছে দর্পনারায়ণ ছাড়া তাকে চলবে না। তাই খুব খাতির করে। তবু লোকটা যে তাকে পছন্দ করে না, এটা সে বুঝতে পারে। তাই একটা অস্বস্তি।

নতুন বাদশাহের কাছে নজরানা ও উপহার সামগ্রী প্রেরণের পরদিনই ফারুকশিয়ারের কাছ থেকে হুকুমনামা এসে হাজির। এই হুকুমনামায় সব চেয়ে যদি কেউ অবাক হয় তো সে হলো মুর্শিদকুলী খাঁ নিজে। এতদিন সে ছিল বাংলার দেওয়ান। এখন থেকে সে বাংলা বিহার আর উড়িষ্যার শুধু দেওয়ানী নয়, নিজামৎ বিভাগও দেখবে। ফারুকশিয়ারের মুখ আবার তার সামনে ভেসে ওঠে। বয়স কম হলেও মনে হচ্ছে ভাল প্রশাসক। মুর্শিদকুলী খাঁ জানে না বাদশাহ অনেক ভেবেচিন্তে তাকে এই পদগুলি দিয়েছেন। নতুন বাদশাহ খুব কাছ থেকে দেখে বুঝে গিয়েছেন মুর্শিদকুলী খাঁ কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তিনি জানেন বাদশাহের কাছে নিয়মিত রাজস্ব পাঠাতে না পারলে সে শান্তি পায় না। তার কাছে বাদশাহ কোন ব্যক্তি বিশেষ নন। বাদশাহ হলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি পাকাপোক্তভাবে মসনদে আরোহণ করেছেন। সুদূর বর্ধমানের নিকটবর্তী সেই সুফী বায়েজিদের আশীর্বাদে ফারুকশিয়ার আজ সত্যিই বাদশাহ। আর বাদশাহ হয়ে তিনি মুর্শিদকুলী খাঁ সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বুঝতে পারেন মুর্শিদকুলী খাঁ সেদিন তাঁকে অর্থ না দিয়ে ঠিক করেছে। আজ বাদশাহ হয়ে তিনি চাইবেন না, মুর্শিদ অন্য কারও হুমকিতে নতি স্বীকার করুক। তাই তাকে বেশ কয়েকটি পদ দিলেন

ফারুক। তিনি মনে মনে ঠিক করে ফেলেন অদূর ভবিষ্যতে মুর্শিদকুলী খাঁকে পূর্ণ সুবাদারের পদ দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। তাঁর ধারণা ছিল নিজে যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী নয় বলে মুর্শিদকুলী খাঁ সৈন্যসংখ্যা কম রাখতো। কিন্তু যেভাবে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা দেখিয়ে অনায়াসে রসিদ খাঁকে সে পরাস্ত করেছে তাতে স্পষ্ট জানা হয়ে গিয়েছে সে যুদ্ধ বিশারদ। তাছাড়া সেই যুদ্ধে যে সব অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে তা রীতিমত বিস্ময়কর। বহু মানুষ দেখেছে। অবিশ্বাস করা যায় না।

হুকুমনামার বয়ান মুর্শিদকুলী খাঁকে এত বেশী আশ্বস্ত করল, যে মনে হলো শক্তি তার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সে ঠিক করে এবারে পূর্ণ উদ্যমে তার পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেবে একে একে।

হুকুমনামার বয়ান আর কারও দেখার কথা নয়। মুর্শিদকুলী খাঁ নিজে না দেখালে। তবে কিশোর রায়ের হাতে গোপনীয় সব পত্রই দিতে হয়। সে দেখলো। দেখে আনন্দে অস্ফুট চিৎকার করে উঠেছিল। সে তখন ছিল মহাফেজখানার পাশের কক্ষে। মুর্শিদকুলী খাঁ ছাড়া আর কেউ ধারে কাছে ছিল না।

মুর্শিদকুলী খাঁ বলে ওঠে—কি হলো! চিৎকার করলে বলে মনে হলো?

—না হুজুর।

—আমি শুনলাম। নিজের কানকে অবিশ্বাস করব?

—চিৎকার ঠিক করিনি। করতে যাচ্ছিলাম।

—কেন।

—আনন্দে।

—কিসের আনন্দ?

—হুকুমনামা দেখে। আমি জানি, অনেকে ভেবেছিল নতুন বাদশাহ আপনার ক্ষতি করবেন। কিন্তু তিনি আপনার পদোন্নতি ঘটিয়েছেন। ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন। তিনি মানুষ চেনেন। বয়স কম হলে কি হবে?

—অনেক কথা বলে ফেললে দেখছি। এত কথা কখনো বলো না তুমি।

কিশোর রায় সঙ্কুচিত হয়। ঠিক এভাবে জাফর খাঁর সামনে বাচালতা দেখায়নি কখনো। সে নীরব হয়ে যায়।

—আজ এখানে অন্য কেউ থাকতে পার তো। তুমি যেমন করে উঠলে শুনে ফেলতো। জিজ্ঞাসা করলে কি বলতে?

—অন্য কেউ নেই আমি জানতাম।

—ও, আমি আছি দেখে অমন করলে? তুমি দেখাতে চাও আমার উন্নতিতে তোমার কত আনন্দ হয়?

—না হুজুর। আপনার কথা মনে ছিল না। আমি কিছু দেখাতে চাইনি। আমি ওসব দেখাতে চাই না। হঠাৎ অমন হয়ে গিয়েছে। আমি খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম।

—তুমি আমার ব্যক্তিগত কাগজপত্র রাখো বটে, কিন্তু সেগুলো পড়া উচিত নয়।

—হুজুর আপনি আমাকে সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে রাখতে বলেছেন। কত সময় কত কথা আমাকে আপনি জিজ্ঞাসা করেন। তাই ভাবলাম—

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। কাউকে বলো না। দুদিন পরে আমিই বলব। ভূপতিকে বলতে পারতে। কিন্তু না বলাই ভাল। দুজনে মিলে আলোচনা শুরু করে দেবে। কে শুনে ফেলবে।

—আমি দাদাকে বলব না।

—তুমি বরং আজ রাতে রঘুনন্দন আর দর্পনারায়ণকে খবর দেবে, কাল সকালে দেওয়ানখানা খোলার আগে আমার কাছে চলে যায় দুজনা—আমার বাড়িতে।

—ওঁরা দুজনাই দপ্তরে আছেন। এখন বলব ?

—আঃ তুমি হঠাৎ বেশী বুঝতে শুরু করেছ। এখন ওরা জানুক আমি চাইনা। রাতের বেলায় ওরা যেন খবরটা পায়।

—যে আজ্ঞে।

কিশোরের গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে মুর্শিদকুলী খাঁ। এ এখনো সজীব আছে। কিন্তু ভূপতি অস্বীকার করলেও মনে হয় একটা কিছু হয়েছে ওর। বয়সে তার চেয়ে অনেক ছোট। সে যখন সফী ইস্পাহানীর সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে যায়, তখনই অন্তত বয়স পাঁচ বছরের এদিকে কিংবা ওদিকে হবে। নইলে স্পষ্টভাবে ওই গাছগুলোর কথা মনে থাকত না। নিজের নামটাও মনে থাকত, যদি দু একবার কেউ ওই নামে ডাকত। যাই হোক, ভূপতি তার চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু সেবারে দক্ষিণ ভারত থেকে ফেরার পরে সে স্পষ্ট বুঝতে পারে ভূপতির শরীরে ভাঙন ধরেছে। তারপর থেকে উন্নতি হয়নি। বরং খুব ধীরে ধীরে অবনতির দিকে চলেছে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, খুব ভাল আছে। শরীর সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করলে ওর মুখে আতঙ্কের ছায়া পড়ে। ও কি ভাবে স্বাস্থ্যের কারণে ওকে ওর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে ? হ্যাঁ, ভাবতে পারে বটে। মুর্খটা বুঝবে কি করে তাকে সরিয়ে দিলেও ভাল রকম ব্যবস্থা করে দেওয়া হতো। কিন্তু অর্থের ওপর ওর অহেতুক কোন লালসা নেই। হয়ত প্রতিদিন কাজের মধ্যে থাকতে তার ভাল লাগে। খুব স্বাভাবিক। থাকুক। কিন্তু এক এক সময় ওকে বড় ক্লান্ত দেখায়। ওর জন্যে কষ্ট হয়।

সারারাত দর্পনারায়ণের ঘুম হয়নি। দিল্লী থেকে কোন নতুন খবর এলো নাকি ? কিংবা তার মনোভাব জানতে পেরেছেন মুর্শিদকুলী খাঁ ? জানলে তো কানুনগোগিরি চলে যাবে। রঘুনন্দনটা যেভাবে কাজ রপ্ত করে নিয়েছে তাতে এখন সে একাই একশো। তবে ছেলেটা বিনয়ী। তাকে তার প্রাপ্য সম্মান ঠিক দেয়। আসলে সেয়ানা। ভাই রামজীবনও বলতে গেলে এখন অর্ধ বঙ্গেশ্বর। অথচ রঘুনন্দন কেমন সাদাসিদে। শুধু বউখানা এনেছে দারুণ। রামজীবন বলেছিল দাদার

বিয়েতে মুর্শিদাবাদবাসীকে দেখিয়ে দেবে বিয়ে কাকে বলে। কিন্তু রঘুনন্দনের এক ধমকে চুপ করে গিয়েছিল। রঘুনন্দন খুব ভালভাবে জানে, আড়ম্বর দেখালে মুর্শিদকুলী খাঁ নিজে হয়ত কিছু মনে করবে না। কিন্তু মুর্শিদকুলীর বংশের অনেকের মনে ঈর্ষার উদ্রেক হবে। সেটা মোটেও ভাল কথা নয়।

সারারাত ছট্‌ফট্‌ করে সকালে উঠে মুর্শিদকুলী খাঁর আবাসে গিয়ে দেখে রঘুনন্দন সেখানে বসে আছে। দর্পকে দেখে মৃদু হেসে উঠে দাঁড়ায়।

—তুমি এখানে ?

—আমাকে ডেকেছেন।

—কখন ডাকলেন ?

—কাল রাতে।

—আমাকেও তো ? কিছু বুঝতে পারছো ?

রঘুনন্দন মাথা নাড়ে।

দর্পনারায়ণ মনে মনে ভাবে, ছোকরা নিশ্চয় সব জানে। বোধহয় তাকে তাড়িয়ে দিয়ে রঘুনন্দনকে কানুনগো করা হবে। কিংবা তার নিজের অনুমান এতদিন পরে ফলতে চলেছে। ফারুকশিয়ার এবারে মুর্শিদকুলী খাঁকে সম্ভবত বাংলা ছাড়তে বলেছেন। উঃ তা হলে জোড়া পাঁঠা বলি দেবে সে। মানুষটাকে গোড়া থেকেই সহ্য হয় না।

একজন খানসামা এসে খবর দেয় দেওয়ান সাহেব তাদের ভেতরে ডাকছে। ভেতরে প্রবেশের সময় বহুদিন পরে দর্পনারায়ণের আত্মবিশ্বাস একটু টলে উঠলো।

দেওয়ান সাহেবের সামনে যে বসতে হয়, এ ধারণা রঘুনন্দনের নেই। মুর্শিদকুলী খাঁর আগে যারা ছিল তারা দর্পনারায়ণকে প্রথমেই আসন গ্রহণ করতে বলত। এমনকি সুবাদার আজিম-উস-সান্‌ অনেকবার তাকে আসন দেখিয়ে দিতেন বসার জন্য। নিজেকে সম্মানিত মনে হতো দর্পের। কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁ তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলেও সব সময় যেন মনে করিয়ে দেয় সে মালিক আর দর্পনারায়ণ যত কুশলীই হোক না কেন তার অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র। এই জিনিসটা দর্পনারায়ণের ভেতরে কুরে কুরে খায়।

রঘুনন্দনের অবশ্য সেই বালাই নেই। যদিও দর্পনারায়ণ তার মনের ভেতরে এই ব্যাপারে একটা দৃষ্টি ফেলার চেষ্টা করে আসছে বরাবর কিন্তু কোন কাজে লাগেনি। কারণ সে প্রথম থেকেই শিখে এসেছে দেওয়ান সাহেবের সামনে বসতে নেই। সে নিজের চোখেও দেখেছে বড় বড় মানী গুণী ব্যক্তিরাও তার সামনে বসতে সাহস পায় না। জমিদারদের তো তার সাক্ষাৎ পেতে হলে প্রথমে প্রার্থনা জানাতে হয় আর সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হতে অনেক সময় বেশ কিছুদিন কেটে যায়। সেই কদিন জমিদারদের মগরীতে কাটাতে হয়। দপ্তরে দপ্তরে ঘুরে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের উপঢৌকন দিতে হয়। তাছাড়া রঘুনন্দনের ওসব ভুয়ো আত্মসম্মানবোধ নেই।

দর্পনারায়ণ যে এই আত্মসম্মানের জ্বালায় মরছে, একথা সে ভালভাবে জানে। তবে বয়সে প্রায় পিতার সমান বলে এ ব্যাপারে সে কখনো কিছু বলে না। সে শুধু জানে তাকে উন্নতি করতে হবে। তার ভাই এর জমিদারীর সীমানা আরও বাড়িয়ে যেতে হবে। দিল্লী থেকে একটা 'রাজা' উপাধি যদি এনে দেওয়া যায় রামজীবনকে তাহলে বড় ভাল হয়।

ওরা দুজনাই বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে যায়, মুর্শিদকুলী খাঁর প্রথম উক্তিতেই। সামনের দু'খানা আসনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে—বসুন।

দুজনা ইতস্তত করে। অভ্যাস নেই এভাবে বসা। মুর্শিদকুলী খাঁর মাথার সম-উচ্চতায় তাদের মাথা থাকবে, চোখদুটো থাকবে সোজাসুজি এমন পরিস্থিতির কথা ভাবা যায় না।

—দ্বিধা করবেন না, বসুন। রঘুনন্দন তুমিও বসো। অনেক কথা আছে।

দর্পনারায়ণের অন্তরের গভীরে লাফ দিয়ে ওঠে কী যেন। ভাবে, এতদিনে পাট নিশ্চয় চুকতে বসেছে। এত বিনয় যখন। আসলে দর্পনারায়ণ বরাবর জানে, বাইরে যত আন্তরিক হোক আর ভাল ব্যবহার করুক না কেন দেওয়ান সাহেব, ভেতরে ভেতরে তাকে পছন্দ করে না। তবু সে কাজের ব্যাপারে কুশলী ও নিষ্ঠাবান বলে তার ওপর নির্ভর করে। মুর্শিদকুলী খাঁ এও জানে হিসাবে গোলমাল করে চুরি সে করে না। যদিও সেটা করা আদৌ অসুবিধার নয়। তবে সে কাজ করে দিয়ে বিশেষ বিশেষ জায়গায় উৎকোচ চায়। কে না চায়? একজন মানুষকে খুঁজে বের করুক দেখি দেওয়ান সাহেব, যে উৎকোচ নেয় না। নিজের সুবিধা, নিজের বংশের সুবিধা সবাই করে যেতে চায় যে ভাবেই হোক। দেওয়ান সাহেবও করছে, তবে সব-দিক বজায় রেখে। আসলে কাজকর্ম নখদর্পণে থাকলে উপরি অর্থ রোজগার করা যায়। দেওয়ানীগিরি খুব ভাল জানে বলেই মুর্শিদকুলী খাঁ নিজের মৃত্যুর পর জিন্নৎ-এর পুত্র আসাদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেইভাবে খাস জমির বন্দোবস্ত করে যাবার ব্যবস্থা করেছিল। তবে হঠাৎ দক্ষিণ ভারতে চলে যেতে হয়েছিল বলে বাধা পড়ে গিয়েছিল সাময়িকভাবে। ফিরে এসে পাকাপাকি করে ফেলেছে।

মুর্শিদকুলী খাঁ দর্পনারায়ণকে বলে,—আমি ভাবছি এবারে সুবে বাংলার জমি-জমাগুলোর একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করব।

—স্থায়ী ব্যবস্থা ?

—হ্যাঁ, আমার পরিকল্পনার কথা বুঝিয়ে বললে, ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। এমন ভাবে ব্যবস্থা করতে হবে যাতে চোখের সামনে সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এতে রাজস্ব আদায়ের সুবিধা হবে। কে ফাঁকি দিচ্ছে সহজে ধরা পড়ে যাবে। তখন তার কাছ থেকে সেটা আদায় করতে কোন অসুবিধা হবে না। তাছাড়া জমিদারীর আয়তন দেখে রাজস্ব আদায়ের মাত্রা ধার্য করা যাবে। এটা নতুন কিছু নয়।

শায়েস্তা খাঁ এমন করেছিলেন। সেই অনুযায়ী চলছে।

—হ্যাঁ, সুন্দর ব্যবস্থা। আগের হিসাব বাতিল করে দিয়ে শায়েস্তা খাঁ দ্বিতীয় হিসাব তৈরী করেন।

—ঠিক। আমি সেই কথাই বলছি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু পালটে যায়। রাজস্বের পরিমাণ বরাবর এক থাকতে পারে না। সাধারণত বেড়ে যায়। দুর্ভিক্ষ মহামারী হলে অবশ্য অন্য কথা। হ্যাঁ আপনি ঠিক ধরেছেন। আমি চাই তৃতীয় হিসাব প্রস্তুত করতে। আপনি আর রঘুনন্দন সেটি করবেন। এর নাম হবে "জমা কামেল তুমারী"।

দর্পনারায়ণ বলে—এতে আমাদের করণীয় কি?

—আমি ভাবছি, সুবে বাংলাকে তেরোটি চাকলা, পঁচিশটি জমিদারী আর তেরোটি জায়গীরে বিভক্ত করলে কেমন হয়?

দর্পনারায়ণ স্বাভাবিকভাবে সম্মতি জানালো। কিন্তু রঘুনন্দন মুর্শিদকুলী খাঁর এসব ব্যাপারে জ্ঞান আর দূরদৃষ্টি দেখে বিস্মিত হন। আসলে সে নিজেও মনে মনে প্রায় এই ধরণের একটা ব্যবস্থার কথা চিন্তা করে আসছিল। বিশেষ করে জায়গীরের নির্দিষ্ট জমি ঠিক করে দেওয়া খুবই দরকার ছিল। কারণ এই জায়গীর থেকে নাজিম, দেওয়ান আর সৈন্যদের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

কথা শেষ করে দুজনা পথ চলতে চলতে এবিষয়ে আলোচনা শুরু করে দেয়। এতবড় একটা দায়িত্ব পেয়ে দুজনাই খুশী। দুজনাই জানে সুচারুভাবে তারা এই 'জমা কামেল তুমারী'র ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলবে। তবে দর্পনারায়ণের মনে একটু সংশয় ছিল। ভাবছিল নতুন বাদশাহের রাজত্বে এমনভাবে এগিয়ে যেতে সাহস পেল কি করে মুর্শিদকুলী খাঁ?

সংশয় কেটে গেল সেইদিনই মধ্যাহ্নে। বাদশাহের হুকুমনামা প্রকাশ করা হলো। রঘুনন্দন প্রায় কিশোর রায়ের মত লাফিয়ে উঠতে গিয়ে সংযত হলো। সে এর মধ্যে শিখে ফেলেছে কোন ব্যাপারে বেশী উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা শোভা পায় না। তাতে বিপদ ঘটতে পারে। বাদশাহ, সুবাদার, দেওয়ান, নাজিম সবাই পদ্ম পত্রে জল। টলমল করছে। যখন তখন গড়িয়ে পড়তে পারে।

চাঁদ মেঘের কোলে বারবার মুখ লুকোচ্ছে। বর্ষার ভাঙা হাট। মেঘ কখনো সরস, কখনো রসের মাত্রা এত কম যে চাঁদকেও সবটা ঢেকে ফেলতে পারে না। তবু আকাশকে অনেক সময় যেমন প্রাণহীন বলে মনে হয় তেমন হচ্ছে না। নাফিসা

একদৃষ্টিতে তাই দেখছিল আর অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। সৈয়দ রেজা খাঁর বেগম সে। তবু এত আনমনা কেন? স্বামীকে তার অপছন্দ নয়। স্বামীর সোহাগে সে পৃথিবীকে ভুলে যায়। ছিমছাম সুন্দর চেহারা তার। সুন্দর স্বাস্থ্য। বুদ্ধিমান, কর্মঠ। সবই ঠিক। তবু কোথায় যেন মিলছে না। সবটা ভরাট হচ্ছে না। এজন্য সে মনে মনে নাজির আহমেদকে দায়ী করে। বেগমের সঙ্গে থাকার সময়ও রেজা শত মুখে নাজিরের প্রশংসা করে। এতটুকুও শুনতে ইচ্ছে করে না। এক এক সময় অসহ্য বলে মনে হয়। এত কি?

আসলে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে নাজিরের মুখ সে খুব কাছ থেকে ভালভাবে দেখেছে। সেই মুখে একটা ক্রূরতা ফুটে ওঠে। তার সম্বন্ধে অনেক কথাও সে শুনেছে, যা উপাদেয় মোটেই নয়। অথচ দাদু ওকে পছন্দ করে। আর পছন্দ করে বলেই সৈয়দ রেজার সঙ্গে দিয়েছে। এক এক সময় দাদুকে বলতে ইচ্ছে হয়, ওকে নাজিরের সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে নিতে। নইলে দেখা যাবে একসময় নাতনী ওর হৃদয় থেকে কখন একেবারে চলে গিয়েছে। কিন্তু সেটা বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যায়।

তবু এক একসময় নাফিসার কাঁদতে ইচ্ছা হয়। হ্যাঁ, সত্যি। তার মনে হয় রেজার কথাবার্তা আগের চেয়ে আজকাল অনেক উগ্র শোনায়। তার সঙ্গে সব সময় খুবই ভাল ব্যবহার করে ঠিকই কিন্তু কথাবার্তার ধরণ ধারণ ওর অজ্ঞাতেই পালটে যাচ্ছে। আর ওই সুন্দর কচি মুখে একটা অন্য ধরণের রেখা পড়ছে, যে রেখা সে নাজিরের মুখে দেখেছে। তাই কাঁদতে ইচ্ছা হয়। রেজা শেষে একেবারে পালটে যাবে না তো? তার বাবার মত? অন্য নারীতে আসক্ত হয়ে পড়বে না তো? উড়িষ্যায় আর এক সাদি করেও বাবা তৃপ্ত হয়নি। এক উপপত্নীর গর্ভে জন্মেছে পুত্র সন্তান, নাম তার তকি খাঁ।

কান্নায় ভেঙে পড়তে চাইছিল নাফিসা। কিন্তু তার আগেই একজন এসে তাকে জাপটে ধরে পেছন থেকে। এ ধরার বলিষ্ঠতায় এবং এক ধরনের পরিচিত গন্ধে বুঝতে পারে কে সে। রেজা খাঁ বুঝতে পারেনি তার বেগম ক্রন্দনোন্মুখ। সে তাকে সামনের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে আরও ঘনিষ্ঠ হয়।

—আমাকে বুঝি আর দেখতে ইচ্ছে করে না। তাই চাঁদ দেখছিলে?

নাফিসা কোন কথা বলে না। সে জানে রেজার কথায়, তার ছোঁয়ায় তার রাগ অভিমান সব ধীরে ধীরে চলে যাবে। একটা সময় আসবে যখন সে চূড়ান্ত আনন্দ সাগরে ডুব দেবে।

কিন্তু প্রথমেই আজ বোধ হয় ভুল করে ছন্দ কেটে দেয় রেজা। বলে—জানো নাফিসা, নাজির আজ—

নাফিসা চিৎকার করে ওঠে—না।

রেজা থতমত খায়। বেগমকে এমন চিৎকার করে উঠতে সে কখনো দেখেনি। বলে—কি হলো? আমার ওপর রাগ করেছ?

—জানি না। শুধু ওই নামটা আমার সামনে উচ্চারণ করো না।

—কোন্ নাম ?

—যে নাম অহরহ তুমি কর। তোমার ওই সব সময়ের সঙ্গী, যাকে দাদু তোমার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। ও নাম আমি শুনতে চাই না। ও তোমাকে অধঃপতনের শেষ সীমায় নিয়ে যাবে।

—তুমি পাগল হলে নাকি ? ওই একটি লোক তোমার দাদুর দেওয়ানী কায়েম রাখতে বোধহয় সব চেয়ে বেশী সাহায্য করে।

—তোমার ধারণা তাই। দাদুরও হয়তো সেই ধারণা। কিন্তু সব মিথ্যে।

রেজা খাঁ নাফিসাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে —আমার বেগমের আজ মেজাজ খারাপ।

গুলবিবি একটি গুপ্তস্থান বেছে নিয়ে এদের দাম্পত্য জীবনের সব কিছুই বরাবর দেখে। কখনো উত্তেজিত হয়, কখনো বিমর্ষ হয়। কিন্তু আজ দেখে বুঝল কিছুই কিছু নয়। সে অপেক্ষা করে, কবে রহিম তাকে আশ্রয় দেবে। সেই দিন কি জীবনে কখনো আসবে ? রহিম বলে, আলবত আসবে। সে খবর দিয়েছে, জমি কিনেছে গঙ্গার কিনারে। ছোটখাটো ঘরও তৈরী করেছে। শুধু সুযোগের অপেক্ষা। শত হলেও তারা পরাধীন।

সামান্য একটা শব্দ হয়। গুলবিবি ভেতরের দিকে দৃষ্টি ফেলে। মুখে হাসি ফুটে ওঠে। নাফিসার সব অভিমান রাগ ভেসে গিয়েছে। রেজার সঙ্গে এখন সে একাত্ম। বাঁদী হয়ে আসাদের সঙ্গেও সে এমন একাত্ম হয়ে গিয়েছে কতবার। তবু তারই মধ্যে মাঝে মাঝে মনে হতো সে অনেক নীচে, আসাদ কত ওপরে। তখনই দুটি দেহ এক হয়ে থাকা সত্ত্বেও মনে হতো যেন সে কত যোজন দূরে। এদের তেমন হয় না। এরা কত সুখী। এদের দেহ মন সবই বোধ হয় এক হয়ে যায়। আসাদের আতরের গন্ধ বুঝিয়ে দিত তাদের মধ্যে অনেক ফারাক। আতরের সুঘ্রাণও তাকে অত উঁচুতে ওঠাতে পারেনি। বরং একেবারে নীচে নামিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ তাই।

গুলবিবি ধীরে ধীরে সরে যায়। একেক সময় মনে হয় তার, পৃথিবীতে তাকে আকর্ষণ করার মত কিছু নেই। রাত এমন কিছু বেশী হয় নি। তাকে আরও অনেকক্ষণ জাগতে হবে। কখনো সে ঘুমিয়ে পড়লে নাফিসার লাথি খেয়ে ঘুম ভাঙে। তখন মনে হয়, এমন দিন হয়ত আর থাকবে না। রহিম তাকে নিয়ে যাবে। নাফিসা যেভাবে সৈয়দ রেজার সঙ্গে শুয়েছে তেমন ভাবে না হলেও রহিমের পাশে সে শোবে। মা সন্তানের পাশে শোয় না ? ভাই বোনের পাশে শোয় না ? তাতেও আনন্দ আছে। পুরুষদের মত নারীদেরও যদি খোজা করে দেবার ব্যবস্থা থাকতো, বেশ হতো।

দর্পনারায়ণ আর রঘুনন্দন সব কিছু সুন্দরভাবে শেষ করল। মুর্শিদকুলী খাঁ সন্তুষ্ট হয় এবং উঠে পড়ে লাগে খাজনা আদায়ের ব্যাপারে। এতদিন সে স্বাধীন-ভাবে সব কিছু করলেও, এতটা স্বাধীন কখনই ছিল না। এখন সে বুঝে গিয়েছে দিল্লীর মসনদ অন্তর্দ্বন্দ্বে অতি দুর্বল। সেই মসনদকে কায়েম রাখতে সে তার কর্তব্য করে যাবে। কিন্তু এতদিন নিজের দিকে সে তাকায় নি। এবারে তাকাবে। সুজাউদ্দিন জামাতা হলেও তার পছন্দ হয় না তাকে। কিন্তু আসাদকে দেখলেই বড় মায়া হয়। ওর মধ্যেই অন্তত বাঁচুক কিছুটা এককালের মহম্মদ হাদি বর্তমানের জাফর খাঁ বা মুর্শিদকুলী খাঁ। আসাদের বন্দোবস্ত একটা করে দিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ, সে হবে সুবে বাংলার নবাব।

তাই খাজনা আদায়ের ব্যাপারে রেজা খাঁ আর নাজির আহমেদকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেয়। বলে দেয়—তোমরা কি করছ না করছ আমার এসে যায় না। আমার টাকা চাই। কিছু বাকী থাকা চলবে না। যারা ইচ্ছে করে কিংবা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বছরের শেষে সবটুকু শোধ দিতে পারবে না, শাস্তি দিয়ে তাদের কাছ থেকে অর্থ বের করতে হবে। নইলে তোমাদের আমি রেহাই দেব না। বাংলা থেকে সরিয়ে দেব।

ব্যাস্। এইটুকুই চায় নাজির আহমেদ। সে মুর্শিদকুলী খাঁর অজ্ঞাতে হেসে ফেলে। আর সৈয়দ রেজা খাঁ এমন অট্টহাসি হেসে ওঠে বাইরে এসে যে নাজিরের অবধি তাক্ লেগে যায়।

রেজা খাঁ নাজিরের পিঠে বিরাশী সিক্কা ওজনের এক থাবড়া মেরে বলে—চলো।

—কোথায়?

—দেখি তোমার শিকারদের কেমন রেখেছ। চলো কাছারি ঘরে।

যারা খাজনা বাকী ফেলে রাখে তাদের কাছারি ঘরে সাধারণত রাখা হয়। এতদিন তাদের খাওয়া দাওয়া বিশেষ দেওয়া হতো না। তবে মারধর কম করা হতো। জমিদারদের গায়ে হাত দেওয়া হতো না। আসিল, ইজারাদার কিংবা জমিদারের নিজস্ব কানুনগোদের প্রহার করা হতো। তাদের পায়খানায় যেতে দেওয়া হতো না। কিন্তু এবারে এরা স্বাধীন। তাই যা খুশী তাই করবে। নাজির আহমেদ চলতে চলতে ভাবতে থাকে কিভাবে শুরু করা যায়। কিভাবে সৈয়দ রেজা খাঁকে অবাক করে দেওয়া যায়।

ওরা কাছারির একটা বড় ঘরে প্রবেশ করে। ঘরের জানলা খোলা—দিনের বেলায় সব দেখা যায়। অন্তত আট দশ জন সেই প্রশস্ত ঘরের এক এক কোনে বসে

রয়েছে। বাইরে তিনজন পাহারাদার বন্ধ দরজার সামনে মজুত। তারা বুক ফুলিয়ে পায়চারী করছে।

নাজির আহমেদ ঢুকতেই একজন পায়ের কাছে পড়ে বলে ওঠে—আমি আর পারছি না, আমাকে একটু পায়খানায় যেতে দিন।

সঙ্গে সঙ্গে এক লাথি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। তার পায়খানায় যাওয়ার আর প্রয়োজন হয় না।

নাজির আহমেদ চিৎকার করে ওঠে—আবু হোসেন।

একজন পাহারাদার এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়ায়।

পাশের একটা ছোট ঘর দেখিয়ে নাজির বলে—একে ওই ঘরে নিয়ে যাও।

—কিন্তু হুজুর, এ যে—

—চোপরও। যা বলছি তাই কর।

ঘেন্নায় মাথা খেয়ে আবু হোসেন অচেতন লোকটার দুহাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চলে।

সে চলে যেতে নাজির মৃদু হেসে বলে—কেমন দেখলেন ?

সৈয়দ রেজা খাঁ সেকথার জবাব না দিয়ে বলে—লোকটি কে ?

—ইদ্রাকপুরের রাজার কানুনগো। রাজা হয়েছে সব, এদিকে খাজনা বাকী পড়ে। এতদিন খুব মজায় ছিল। এখন বুঝবে ঠেলা।

—এরা সব কারা ?

—সব ওই রকম। ওই যে ফর্সা মত লোকটি চোখ লাল করে বসে আছে ? ও হচ্ছে পাঁচেট এর জমিদারের ছোট ভাই। ব্যাটা দুদিন খুব লম্বা চওড়া কথা বলেছে। এখন দেখাচ্ছি। আবু হোসেন—

আবু হোসেন পাশের ছোট ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে সামনে এসে বলে ওঠে—মালিক।

—তিন চার জনকে ডাক। দড়ি নিয়ে এসো, ঝামা নিয়ে এসো। একটা বেত এনো সেই সঙ্গে।

সৈয়দ রেজা খাঁ আগ্রহ ভরে নাজির আহমেদের কেরামতি দেখে। জিনিসগুলো আনা হলে দড়ি ঘরের ওপরের একটা আড়াআড়ি মজবুত কাঠের ওপর ফেলা হলো। দুই প্রান্ত দুইদিকে ঝুলতে থাকে। পাঁচেটের জমিদারের ছোট ভাইকে নিয়ে আসা হলো। সে বেচারা বুঝতে পারছে না তাকে নিয়ে কি করা হবে। তবে একটা কিছু যে করা হবে সেটা জানে। তবু নিজেকে যতটা পারে সংযত রাখার চেষ্টা করে। দাদার জমিদারীতে সে সুখে থাকে, দুঃখ কষ্টের উত্তাপ এ পর্যন্ত লাগেনি।

নাজির আহমেদ হঠাৎ নিজের লোকেদের চিৎকার করে বলে ওঠে—হাঁ করে, দেখছ কি ? এর পা দুটো জোড়া করে দড়ি দিয়ে বাঁধ।

তাকে ধরে শুইয়ে ফেলে তাই করা হলো। তারপর দড়ির অপর প্রান্ত ধরে টানে

দুতিন জন। লোকটির মাথা মাটিতে ঠেকে থাকে, পা ওপর দিকে উঠে যায়।

নাজির বলে—খাজনা দেবে ?

—আমি দাদাকে গিয়ে বলব। দাদা খুব চেষ্টা করেছিল। আমি মিথ্যে কথা বলছি না। পারেনি।

নাজিরের হুকুমে লোকটির পায়ের তলায় ঝামা ঘষা শুরু হয়। ওর চোখ আরও বেশী লাল হয়ে উঠেছে। মাথার শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। ঝামা ঘষায় ও আর্তনাদ করে ওঠে।

—আমাকে আর কষ্ট দেবেন না। যেভাবে হোক শোধ করে দেব।

নাজির আহমেদ চোখ টেপে। এবারে মাথা শূন্যে ঝুলতে থাকে। দুজনা মিলে পায়ের নীচে বেত মারতে থাকে।

লোকটির চোখ দুটো বড় বড় হয়ে ওঠে, তারপর আস্তে করে বন্ধ হয়ে যায়।

—নামিয়ে দাও। কালকে আবার—

রেজা খাঁ বলে—মরে যাবে না তো ?

—অত সহজে জান্ যায় না। তাছাড়া মরলেই বা কি ? আমার কাজ বকেয়া সব আদায় করা।

—ঠিক। কিন্তু ওই যে অন্ধকার কোণে একজন বসে আছে, ও কে ?

নাজির আহমেদ বলে—ও নিজেকে লুকিয়ে রাখছে। আমি দেখতে পাচ্ছি না ওকে। একটুও দেখতে পাচ্ছি না।

রেজা খাঁ হেসে ওঠে। নাজির বলে—ও হচ্ছে, বহরুলের জমিদারের আসিল। ওকে অমন দেখছেন। আসলে শয়তান একটা। আগের বারও বাকী ফেলেছিল। বুঝতে পারিনা দোষটা কার। ওর, না জমিদারের। ও জমিদারী থাকবে না। রাজশাহীর ভেতরে চলে যাবে।

—কিন্তু টাকাটা তো পাওয়া যাচ্ছে না। জমিদারী কারও থাকলো কি গেল আমাদের বয়ে গেল।

—হ্যাঁ। ওর জন্যে অন্য ব্যবস্থা করেছি। এবারে ও আবার ওর স্ত্রীকে আর ছেলেকে নগর দেখাতে এনেছে। তারাও আছে পাশের ঘরে।

—তাই নাকি ? তাদের শাস্তি দিচ্ছ ?

—না না।

—একে এখানে রেখেছ কেন ?

—আজ শেষদিন বলে দিয়েছি ওকে।

—তারপর ?

—দাঁড়ান ওকে ডাকি। এই যে—

কাঁপা কণ্ঠস্বরে লোকটি বলে ওঠে—আমি হুজুর ?

—হ্যাঁ। এদিকে এসো।

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে সামনে এসে দাঁড়ায়।

—কি ঠিক করলে ? টাকাগুলো বের করবে ?

—মা কালীর দিব্যি হুজুর। টাকা নেই। থাকবে কি করে। জমিদার অত জাঁকজমক করে বিয়ে দিলে টাকা থাকে ? কত মানা করলাম।

—কার বিয়ে ?

—মেয়ের বিয়ে হুজুর।

—আগের বারও বলেছিলে, কারও সাদি ছিল।

—এ্যাঁ, তাই নাকি ? না তো ? মনে নেই তো।

—তোমাকে একবার যে দেখবে সে ভুলবে না। তুমি আগের বারও জমিদারের কাঁধে দোষ চাপিয়েছিলে। হয়ত জমিদারের দোষ। কিন্তু তাকে এখন পাচ্ছি না। শাস্তি তোমাকে ভোগ করতে হবে।

—শাস্তি ? ওরে বাবা। ওই শাস্তি ? আমি মরে যাব হুজুর। তাছাড়া আমার স্ত্রী ছেলে, ওরা কি ভাববে। ওরা মরে যাবে হুজুর।

—তবে টাকা বের কর।

—শপথ নিয়ে বলছি হুজুর, জমিদারীর অবস্থা খুব খারাপ। কতটুকু জমিদারী এই-বহরুল, মঙ্গলঘাটের সমান হবে। একটুও বৃষ্টি হয়নি গতবার।

—তাহলে উপায় নেই। আবু হোসেন—

লোকটি নাম শুনেই আর্তনাদ করে ওঠে।

—আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার কোন ব্যথা লাগবে না, তোমার স্ত্রী পুত্রেরও গায়ে লাগবে না এমন শাস্তি হলে চলবে ?

লোকটি বিশ্বাস করতে পারে না। সে নাজির আহমেদের পা জড়িয়ে ধরে বলে—হুজুর মা বাপ।

—বেশ। আজ বিকেলে তোমাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করানো হবে।

লোকটি বুক ফাটা চিৎকার করে ওঠে।

কক্ষ থেকে বাইরে গিয়ে রেজা খাঁ বলে—এটা কি সত্যি কথা বললে।

—হ্যাঁ। একশো ভাগ সত্যি।

—দেওয়ান সাহেব শুনলে ?

—দেখা যাক্। উনি চান, খাজনা যেন বাকী না থাকে। তার জন্যে সব কিছুরই এক আধটা দৃষ্টান্ত থাকা ভাল। সবাই জানবে। যাদুর মত কাজ হবে। কিন্তু আপনি কি করবেন।

—বাকীগুলোকে রেখে দাও। পাঁচদিন পরে আসব। তখন দেখব।

খবরটা দাবানলের মত নগরীতে ছড়িয়ে পড়ল। ঠিক এই ধরনের ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। হিন্দুদের মধ্যে একটা সন্দেহ একটা অনিশ্চয়তা। সাধারণ

মুসলমানরা তাদের পরিচিত হিন্দুদের সঙ্গে কথা বলতে সঙ্কোচবোধ করে। যেন কি একটা অন্যায় করে ফেলেছে তারাও। দেওয়ান খানায় সবই চলছে শৃঙ্খলার সঙ্গে, তবে কেমন চুপচাপ। বহরুলের আসিল দুবার নাকি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল। দেশে ফিরে গিয়ে তার লাভ নেই। একদিনের ব্যবধানে সে আত্মীয়-স্বজন সমাজ-বন্ধু সবার থেকে দূরে বহু দূরে সরে গিয়েছে।

রাতের বেলায় বেগমসাহেবা মুর্শিদকুলী খাঁর কাছে এসে দাঁড়ায়। প্রথমে কিছু বলে না। সে অপেক্ষা করে দেখে স্বামী কিছু বলল না। তখন সে বলে—যা শুনলাম, সত্যি ?

মুর্শিদকুলী খাঁ প্রথম থেকেই জানে, এই প্রশ্নের সম্মুখীন তাকে হতে হবে। তাই সোজাসুজি বলে—হ্যাঁ, সত্যি।

—তোমার মদতে ?

প্রশ্ন এমন জটিল হবে মুর্শিদকুলী খাঁ ভাবেনি। সে একটু চুপ করে থেকে ভেবে নেয়। তারপর বলে—ওরা যখন আমার অধীনে কাজ করে, তখন ধরে নিতে হবে আমার মদতে ঘটেছে।

বহুদিন পরে বেগমসাহেবার গলা চড়ে। সে বলে—শুনি তুমি খুব ধার্মিক। কাছ থেকে দেখতেও তেমন লাগে। এটা কি জান না, সবার ধর্ম তার নিজের কাছে প্রাণের চেয়ে প্রিয়।

—পরিষ্কার করে বল।

—পরিষ্কার করেই বলব। আমি সাধারণ রমণী। তোমার ধর্ম কি শিখিয়েছে অন্যকে ধর্মচ্যুত করাতে ? আমি জানি না, তুমিই বলে দাও। আমি ধর্মপ্রচারের কথা বলছি না।

—আমি একটু পরিশ্রান্ত আজ।

—এ পরিশ্রম মনের। মনে হয়, তুমিও বুঝেছ তোমার এত সুনাম, এত কীর্তি সব কিছুর ওপর এই একটি ঘটনা কালি মাখিয়ে দিল।

—উঃ, বেগমসাহেবা। আমার কথা কি তুমি বুঝবে ?

—সারাজীবন যখন বুঝেছি, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কি বুঝব না ? আমি জানি নাজির আহমেদ নিজে এই কাজ করেছে।

—লোকে সেটা বিশ্বাস করবে না। আর নাজিরকে আমি শাস্তিও দিতে পারি না। আমি চাই বকেয়া খাজনা যে কোন ভাবে উসুল করে নিতে। সে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

—তাই বলে, মানুষকে তার ধর্ম খোয়াতে হবে ?

—আগে কখনো হতে দেখেছ ?

—না। কিন্তু ভবিষ্যতে হওয়ার আশঙ্কা আছে।

—হলে তখন বলো। শোন বেগমসাহেবা, মানুষ হিসাবে আমি যে জিনিস

সমর্থন করি না, প্রশাসক হিসাবে তাকে অনেক সময় মেনে নিতে হয়। নইলে রাজ্য চলে না।

—মেনে নেওয়ারও একটা সীমা আছে।

বেগমসাহেবা ধীরে ধীরে স্থানত্যাগ করে। এভাবে সে কখনো চলে যায় না। স্বামীর পাশে এসে বসে। হাল্‌কা ধরণের কথাবার্তা বলে। আজ ব্যতিক্রম।

বেগমসাহেবা ভেবেছিল, স্বামীর সুন্দর ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন থাকবে আজীবন। মনের মধ্যে একটা উষ্ণ গর্ববোধ লালন করে এসেছে এতদিন। সেই গর্ববোধের ওপর শীতল বারি ঢেলে দিল ওই নাজির আহমেদ। হয়ত আর কখনো এমন করতে সে সাহস পাবে না। কিন্তু যে দাগ সে দিল, সেটা লোহা গরম করে লাল করে দেহে দাগ দেওয়ার মত চিরস্থায়ী। নাজিরের এই কুকীর্তি স্বামীর নামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে। বেগমসাহেবা ভাবে, তার যৌবনের বাহুবন্ধন কত ক্ষীণ। মনের মেলবন্ধনও এত অটুট নয়। ও সব জিনিস মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। কিন্তু এই কুকীর্তিগুলো মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকে যুগ যুগ ধরে।

কুকীর্তি যে আরও কত কদর্য হতে পারে নাতজামাই সৈয়দ রেজা খাঁ তার উদাহরণ দিতে শুরু করল কদিন পর থেকে। নাজির আহমেদ তাকে শুধু তাতিয়ে যাচ্ছিল সেদিনের পর থেকে।

রেজা খাঁ নাজিরকে একদিন বলে—চলো, কাছারি বাড়িতে।

ইতিমধ্যে রেজা খাঁ কাছারির কাছাকাছি এক মাঠে অনেকখানি জায়গা ঘিরে ফেলেছে। নাজিরকে বলেছে ওখানে সে নতুন খেলা দেখাবে। তাই নাজির বলে—কেন? আপনার জায়গা তো ওই ঘেরা জায়গাটা।

—ওখানে পরে যাবে। আগে কাছারি বাড়ি চলো।

কৌতূহল নিয়ে নাজির আহমেদ রেজা খাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে। মনে মনে তার ঈর্ষা হয়। এই তরুণকে সে হাতে খড়ি দিয়েছিল, অথচ এখন তাকে ডিঙিয়ে যাবে কিনা কে জানে। আগে রেজা খাঁর সঙ্গে সাধারণভাবে কথা বলা যেত, এখন সমীহ করতে হয়। ওর চোখের দৃষ্টিতে কী যেন ফুটে ওঠে।

কাছারি বাড়ি গিয়ে দেখা যায় একটা বস্তার মধ্যে কয়েকটা বেড়াল ছট্‌ফট্‌ করছে আর চিৎকার করছে।

নাজির কিছু ভেবে না পেয়ে বলে—এগুলো এখানে কেন?

—বুঝবে।

ওরা প্রহরীদের পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই ঘরের সবার বুক কেঁপে ওঠে। অর্ধাশনে অনশনে তারা শীর্ণ। প্রাকৃতিক তাগিদ অনুভব করে প্রথম প্রথম তারা ভীষণ অসুবিধায় পড়ত। এখন তাদের অবস্থা আস্তাবলের ঘোড়া আর গোয়ালের গরুর মত।

নাজির আহমেদ বলে ওঠে—উঃ কি দুর্গন্ধ।

—হুঁ। দুর্গন্ধের কতটা দেখেছ?

নাজির আহমেদ কথাটার অর্থোদ্ধার করতে পারে না। সে জানে না, রাতের অন্ধকারে রেজা খাঁ চুপি চুপি ওই ঘেরা জায়গায় কুপ খনন করে সেটি বিষ্ঠা এবং পশুদের গলিত দেহাবশেষ দিয়ে পূর্ণ করেছে। তার শুভ উদ্বোধন হবে আজ।

এতদিন নাজির আহমেদ রেজা খাঁর কাছে নিজেকে বড় বেশী জাহির করত। দেখাতে চাইত এসব ব্যাপারে সে একজন ওস্তাদ। আজ রেজা খাঁর গাম্ভীর্য, রহস্য দিয়ে ঘিরে রাখা তার উদ্দেশ্যের থৈ না পেয়ে নিজেকে শিশু বলে মনে হয়।

রেজা খাঁ বেশ শান্ত কণ্ঠে তার পছন্দের প্রহরীকে ডাকে—ইয়াদালী।

—মেহেরবান।

—ওই যে কোনে পায়জামা পরে বসে আছে, ওই যে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, ওটাকে নিয়ে এসো তো?

ইয়াদালী ওকে হাত ধরে টেনে সামনে নিয়ে আসে।

নাজির আহমেদ বলে ওঠে—একে, আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি। বলেছে, ছেলে মারা গিয়েছে, তাই এবারে দিতে পারেনি।

—এ কি জমিদার?

—ইজারাদার।

—ঠিক আছে। কিন্তু পায়জামা ভিজে ভিজে কেন?

লোকটা কেঁদে ওঠে—হুজুর আর পারলাম না। বয়স হয়েছে, বেশীক্ষণ সামলে রাখতে পারিনা।

—বেশ করেছ। খুব ভাল কাজ করেছ। তা বাকীটুকু বাদ গেল কেন? সেটুকু করে ফেললেই ল্যাঠা চুকে যেত।

—হুজুর, ছয় মাসের মধ্যে দিয়ে দেব সব।

—আর এ-বছরের খাজনা?

—সেটা ঠিক সময়ে দেব। অতবড় ছেলেটা মারা গেল। বউ পাগল হয়ে গেল। তাই এমন হলো। আমি ফাঁকী দিইনি। চুরিও করিনি।

—দেখা যাক্। ইয়াদালী বস্তা আনো।

বেড়ালগুলো বস্তার মধ্যে যেন যুদ্ধ করছে। সেই বস্তা আনা হলো। ইয়াদালীর সঙ্গী রহমান হঠাৎ সামনে এসে লোকটার দুহাত পেছনদিকে করে বেঁধে ফেলল। আর একজন চট্ করে তার পায়জামার ফিতে খুলে দিল।

লোকটা বলে ওঠে—একি। ছি ছি।

রেজা খাঁ চিৎকার করে হেসে ওঠে—হাঃ হাঃ। নাজির আহমেদ লোকটা কি বলছে?

নাজির আহমেদও মজা পেয়ে যায়। বলে ওঠে—ছি ছি।

—হাঃ হাঃ, ছি ছি। ইয়াদালী একটা ছি ছি ওই পায়জামায় ঢুকিয়ে দিয়ে ফিতে বেঁধে দাও।

ঘরের সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দেখে এই দৃশ্য। একটা বেড়ালকে কোনরকমে ধরে পায়জামার ভেতরে ঢুকিয়ে ফিতে বেঁধে দেওয়া হয়। আর বেড়ালটি পায়জামার মধ্যে পাগলের মত আঁচড়াতে কামড়াতে শুরু করে। লোকটার চিৎকার সভ্যতা ভব্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। মনে হয় আদিম যুগের কোন মানুষ বন্য বরাহের খপ্পরে পড়ে অমন ভয়াবহ চিৎকার শুরু করেছে। কাছারি ঘরের সব জানালা তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়।

কত মানুষকে শূলে চড়ানো হয়, কত লোককে ফাঁসীতে লটকানো হয়, শিরচ্ছেদও করা হয় কতজনের, কিন্তু তারাও মৃত্যুর আগে এমন ভয়াবহ চিৎকার করে না। অথচ এই মানুষটি হয়ত বেঁচে যাবে। জমিদারী ভাঙিয়ে হোক, কিংবা যেভাবে হোক, সমাজে এর প্রতিষ্ঠা আছে। লোকটির হয়তো পাণ্ডিত্যও আছে। এখানে সেসব বিবেচনা করার জায়গা নয়। বাকী ফেলেছ কি মরেছ।

নাজির আহমেদ অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে সৈয়দ রেজা খাঁর সামনে এসে কুর্নিশ করে।

—কি রকম বুঝলে নাজির?

—জবাব নেই।

ইতিমধ্যে লোকটার পায়জামায় ধীরে ধীরে রক্ত ফুটে বের হতে থাকে, তারপর সমস্ত পায়জামা রক্তাক্ত হয়ে যায়। লোকটা এতক্ষণ গড়াগড়ি দিচ্ছিল কোন রকমে। পেছনে হাত দুটো বাঁধা আছে। এখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

—ইয়াদালী, বেড়ালটা অনেক কষ্ট করেছে। এবারে ওটাকে ছেড়ে দাও।

ফিতে খুলতেই বেড়াল ইয়াদালীকে একটা থাবা মেরে ছুটে বেরিয়ে যায়।

রেজা খাঁ হেসে ওঠে।

লোকটার পেছনের হাত খুলে দেওয়া হয়। সে অচেতনের মত পড়ে থাকে।

নাজির বলে—এবারে?

—এবারে চলো, ওই ময়দানে। কিন্তু কাকে নেওয়া যায়?

—আপনি বলুন।

—এবারে চাই জমিদার। আসিল কিংবা ইজারাদার হলে চলবে না।

—ঠিক আছে। ওই যে লোকটা চুপচাপ বসে আছে, ও হলো খোস্তাঘাটের জমিদার।

—খোস্তাঘাট? সেটা আবার কোথায়?

—সুহেস্তর নাম শুনেছেন?

—না।

—চাকলা কড়ইবাড়ীর ভেতরে। ছোট জমিদারী। ছোট হলে কি হবে জমিদারটি ভারিক্কি চালে থাকে। দেখছেন না কেমন বসে রয়েছে। যেন গদিতে বসে প্রজার

ওপর বাঁশ-ডলাই-এর হুকুম দিচ্ছে।

—বাঃ, নিয়ে চলো ওটাকে। একটু সুখের পরশ পাবে।

জমিদারকে নিয়ে যাওয়া হয় ঘেরা জায়গায়। নাজির আহমেদের কৌতূহল খুব বেড়ে যায়। সে দেখে দু'তিনজন মানুষ একটা জায়গায় দড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। পাশে একটা গর্ত। সেই গর্তের দুপাশে দুটো কাঠের খুঁটি পোঁতা রয়েছে। তার ওপরে আড়াআড়ি করে বাঁশ। নাজির আহমেদ ছুটে কাছে গিয়েই থুথু ফেলতে ফেলতে পালিয়ে আসে।

সৈয়দ রেজা খাঁ একটু হেসে জমিদারকে প্রশ্ন করে—তোমার কোথায় যাওয়ার সাধ?

—আপনি আমাকে মেরে ফেলবেন?

—না, পাগল। তবে হঠাৎ যদি মরে যাও, কি করতে পারি বল।

—যা অত্যাচার দেখলাম। মরেই যেন যাই। জেনেশুনে অন্যায় করিনি কখনো। ভগবান যেন বৈকুণ্ঠে স্থান দেন।

—কি বললে? বৈকুণ্ঠ? হাঃ হাঃ ওই যে দেখ ওরা দড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে? তোমার বৈকুণ্ঠ ওখানে আছে। সোজা বৈকুণ্ঠে চলে যাও। মরতেও হবে না।

জমিদার দাঁড়িয়ে থাকে। রেজা খাঁ দড়ি হাতে লোকদের ইশারা করে। তারা এসে জমিদারের কোমরে দড়ি বাঁধতে শুরু করে।

জমিদার বলে—আমার মৃত্যু হবে তো?

—না না, মরবে কেন এত তাড়াতাড়ি। সোজা বৈকুণ্ঠে চলে যাও। হাঃ হাঃ হাঃ।

লোকদুটো জমিদারকে টানতে টানতে কুপের পাশে নিয়ে যায়। দড়ির একপ্রান্ত তাড়াতাড়ি বাঁশের ওপর ফেলে দেয়। তিনজন সেইপ্রান্ত চেপে ধরে। অন্য একজন হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে জমিদারকে কুপের মধ্যে ফেলে দেয়। তারপরে অপর প্রান্তের লোকেরা তাকে একবার চোবায় একবার ওঠায়।

দূর থেকে সেই দৃশ্য দেখে রেজা খাঁ হঠাৎ উন্মত্তের মত লাফাতে শুরু করে, সেই সঙ্গে অট্টহাসি। ছোঁয়াচ লাগে নাজির আহমেদরও। সেও নাচে আর হাসে। দেখে মনে হয় উন্মাদ আগার।

ওদিকে লোকগুলো জমিদারকে একেবারে ডুবিয়ে দেয় নি। তাহলে দমবন্ধ হয়ে মারা পড়ত। তারা গলা পর্যন্ত চুবিয়েছে। হাঁকপাক করার জন্য কিছু পদার্থ মুখবিবরে প্রবেশ করেছে মাত্র। জমিদার সব কিছু ভুলে যায়। প্রথম কয়েকবার নিজেকে ওই সব পদার্থের ছোঁয়াচ বাঁচানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। তারপর হাল ছেড়ে দেয়। মনে মনে বলে, ভগবান, আমি বৈকুণ্ঠ চাইনা। আমাকে নরকে পাঠাও। শুধু পৃথিবী থেকে আমাকে তুলে নাও।

সন্ধ্যার পরে একটা শকট এসে থামে মুর্শিদকুলী খাঁর ভবনে। শকট থেকে অবতরণ করে বোরখা-পরা রমণী। সে দ্রুত পায়ে ভেতরে ঢুকে যায়। বোঝা যায় এবাড়ির সব কিছু তার নখদর্পণে।

রমণী আর কেউ নয় নাফিসা। সে বেগমসাহেবার কক্ষে প্রবেশ করে। সোজা ছুটে গিয়ে বেগমসাহেবার বুকের ওপর আছড়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

বেগমসাহেবা কিছুটা অনুমান করতে পারে নাতনীর মনোবেদনা। সে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে না প্রথমে। কিছুটা শান্ত হওয়ার সময় দেবার জন্যে তার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

নাফিসা শান্ত হয়ে বলে—আমাকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দাও।

—কেন? অত কি হয়েছে?

—তুমি জান না?

বেগমসাহেবা কিছু কিছু অবশ্যই জানে। তবে সবটা জানে না। সবটুকু জানতে পারত যদি মুর্শিদকুলী খাঁ আগের মত অকপটে সব বলতো। কিন্তু এখন রেজার কাণ্ড-কারখানা অনেক কিছু রেখে ঢেকে বলে।

—আমি শুনেছি অনেক কথা। তবে সবটা জানিনা।

—তুমি বৈকুণ্ঠের কথা শুনেছ?

—না। সেটা কি জিনিস।

নাফিসা ধীরে ধীরে সব কথা বলতে থাকে আর বেগমসাহেবার মুখে নানান রকমের রেখা ফুটে ওঠে। সেই রেখায় আতঙ্ক, সেই রেখায় বিষণ্ণতা, সেই রেখায় হতাশা, সেই রেখায় নাফিসার জন্য তীব্র বেদনার অভিব্যক্তি। নাফিসা শক্তভাবে সব বলে। এতটুকুও বিচলিত হয় না। মায়ের সঙ্গে মেয়ের কী আশ্চর্য সাদৃশ্য। জিন্নৎ ঠিক এইভাবে সুজাউদ্দিনের চরিত্রহীনতার কথা তার মাকে বলত।

নাফিসা সব কিছু বলার পর অনেকক্ষণ কেটে যায়, তবু বেগমসাহেবা নীরব।

—তুমি পাথর হয়ে গেলে দেখছি। পাথর হওয়ার কথা আমার। কিংবা মরে যাওয়া উচিত।

—না।

—এর চেয়ে ও যদি বাবার মত চরিত্রহীন হতো আমি মায়ের কথা ভেবে সান্ত্বনা পেতাম। তুমি বুঝবে না। যারা মানুষ তারাই চরিত্রহীন হয়। কিন্তু যারা মানুষ নয় তাদের আবার চরিত্র কি? ও অমানুষ।

—ও কথা বলিস না।

—এটা রাগের কথা নয় দাদি। অভিমানের কথাও নয়। এটা বহুদিন ধরে কাছে থেকে থেকে বিচার করে আমার সিদ্ধান্ত। ওর মন বিকৃত। মানুষের দুঃখ দেখলে ও আনন্দ বোধ করে। মানুষকে যন্ত্রণা দিতেই ওর উল্লাস। এই পরিবর্তন একদিনে হয় নি। নাজির আহমেদের সাহচর্যে তিলে তিলে এমন হয়েছে। ওর কোমল মুখ একটু একটু করে কঠোর হতে দেখেছি। এখন সেই মুখে ফুটে ওঠে বিকৃত হাসি। তুমি শুধু 'বৈকুণ্ঠের' কথা শুনলে। এমন আরও অজস্র কথা ও রাতের বেলা এসে আমাকে বলে, আমাকে আনন্দ দিতে।

—নাফিসা।

—হ্যাঁ। তুমি আমাকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দাও। মাকে লিখে দাও, আমি তার চেয়েও দুর্ভাগিনী।

নাফিসা একসময় উঠে চলে যায়।

বেগমসাহেবা বসে থাকে চুপচাপ। তারপর স্বামীর কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করে।

—আজ বেগমসাহেবা একটু দেরীতে এসেছ।

—হ্যাঁ, নাফিসা এসেছিল।

—নাফিসা? আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে গেল?

—কি লাভ?

মুর্শিদকুলী খাঁ নড়ে চড়ে বসে? বলে—তার মানে?

—ওকে তো আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ।

—কী বলছ তুমি?

—তাছাড়া কি? রেজা খাঁয়ের কীর্তিকাহিনী তুমি জাননা বলতে চাও?

—কীর্তি কাহিনী? জমিদারদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের কথা বলছ?

—শোন! খাজনা আদায় কিংবা সাধারণ হুমকি বা অত্যাচার হলে আমি কিছু বলতাম না।

—তবে?

—তুমি কি বৈকুণ্ঠের কথা জান না?

—জানি। একটু রসিকতা করেছে। সব জমিদারই তো হিন্দু! মুসলমান কেউ নেই। তাই অমন রটেছে।

—কেন, বীরভূমের জমিদার আসাদউল্লা আছেন। তাঁকে এনে কি ওই কুপের মধ্যে চুবিয়ে চিৎকার করে রেজা বলেছে, "বেহেস্ত্ দেখো?"

মুর্শিদকুলী খাঁর মুখ থমথমে হয়ে যায়। বলে—বেগমসাহেবা কার সম্বন্ধে কি বলতে হয় তুমি জান না। আসাদউল্লা ধার্মিক ফকির। তাঁর সম্বন্ধে একথা বলো না।

—আঁতে ঘা লাগবে জানতাম। তোমার বুঝি ধারণা সব হিন্দু জমিদার খারাপ।

—কে বলল সেকথা? যারা খাজনা বাকি রাখে শুধু তারাই শাস্তি পায়।

—তাই বলে এই বিকৃত পথে? তাই বলে অন্যের ধর্মে আঘাত দিয়ে? রেজা আর নাজির পশু। নিজের ধর্মের মর্যাদা দিতে জানে না বলে, অন্যের ধর্মের অমর্যাদা করে।

—ওরা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। দেখি—

—একশো বার করেছে। কিন্তু শুধু সেইজন্যে তোমাকে বলছি না। তোমাকে দোষারোপ করছি একটা মানুষকে টাকা আদায়ের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে ধীরে ধীরে অমানুষ করে দিলে। সরল সাদাসিধে মানুষটা ধীরে ধীরে শয়তান হয়ে গেল। তাই নাফিসার জীবন আজ ব্যর্থ।

—ব্যর্থ?

—হ্যাঁ, সে উড়িষ্যায় চলে যেতে চায়। এখানে আর থাকবে না।

—কেন?

—সৈয়দ রেজা খাঁর মধ্যে মনুষ্যত্বের ছিটেফোঁটাও সে আর খুঁজে পায় না। আমার কি ধারণা জান?

—বল।

—এই ধরণের মানুষ বেশীদিন বাঁচে না। এরা খুব দ্রুত পালটে যায়। কেউ ভালোর দিকে কেউ খারাপের দিকে চূড়ান্তভাবে পেঁাছে যায়। এদের আয়ুও বেশী দিনের হয় না। ফস্ করে যেমন জ্বলে ওঠে, দপ্ করে নিভে যায় তেমনি।

—তোমার কল্পনা এটা।

—হতে পারে। তাছাড়া রেজা খাঁর মৃত্যু হলে বোধহয় নাফিসা বেঁচে যাবে।

মুর্শিদকুলী খাঁ গর্জন করে ওঠে—বেগমসাহেবা।

—হ্যাঁ। তুমি নিজে হাতে তোমার নাতনীর ভাগ্য গড়ে দিয়েছ। তুমি ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক একজন মানবকে দানব করে তুলেছ।

বেগমসাহেবা উঁচু মাথায় কক্ষ ত্যাগ করে।

মুর্শিদকুলী খাঁ একটা কথাও বলতে পারে না। সে একই ভাবে বসে থাকে। শত ঝড় ঝঞ্ঝা উত্থান পতনে যা কখনো হয়নি আজ তাই মনে হলো তার। বুকের ভেতরে ফাঁকা ফাঁকা লাগলো—যে বুক বরাবর পরিপূর্ণ বলে অনুভব করে এসেছে সে। রেজা খাঁর রুচি এত বিকৃত হবে সে ধারণা করেনি কখনো। জমিদার খাজনা দেয় নি, তার জন্যে মারধোর কর, না-খাইয়ে রাখো—কতদিন না খেয়ে থাকবে? কিন্তু এ কি! আজ মনে হয় রেজা খাঁর মত অত উঁচু বংশের তরুণের সঙ্গে নিম্নমানের নাজির আহমেদকে ভিড়িয়ে দেওয়া মারাত্মক ভুল হয়েছে। নাজির রেজা খাঁকে টেনে নীচের দিকে নামিয়েছে। তাছাড়া তার নিজের দোষ কি নেই? যথেষ্ট আছে। সে চোখ বন্ধ করে ছিল। ভাবটা চোখ বন্ধ থাকলে প্রলয় আর ঘটবে না। নিজের বিচার বুদ্ধির ওপর অগাধ বিশ্বাস তার। সপ্তাহে দুদিন বিচারে বসে সে যে সিদ্ধান্ত নেয় সবাই তার বাহবা দেয়। আত্মশ্লাঘা বাড়তে বাড়তে আশমানে গিয়ে ঠেকেছিল।

তাই আজ হঠাৎ বুক খালি বলে মনে হচ্ছে। যে কখনো তাকে অবহেলা করেনি, আজ সে তাকে তুচ্ছ করে উন্নত মস্তকে চলে গেল। আজ প্রথম নিজেকে বড় একা বলে মনে হয় মুর্শিদকুলী খাঁর। আজ প্রথম সে অনুভব করে, যা স্বাভাবিক তার বিরুদ্ধাচরণ করলে একদিন না একদিন প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়। বড় ভীষণ সেই প্রতিশোধ। বাইরে থেকে কেউ আঁচ করতে পারে না—ভেতরে অহর্নিশি একটা জ্বালা। নাজির আর রেজা খাঁ সম্বন্ধে প্রথম থেকে অনেক কিছু সে শুনেছে। প্রথম প্রথম বেশ ভালই লাগতো সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে দেখে। কারণ সব জমিদারদের মধ্যে এখানকার ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়বে। তারপর শুরু হলো ওই দুজনের বাড়াবাড়ি। তবু সে আমল দেয়নি। বহরুলের আসিলকে সপরিবারে যেদিন ধর্মান্তরিত করা হয়, সেদিন ভূপতি তার দিকে কেমন করে তাকাচ্ছিল। সেদিন দেখেছে কিশোর আর রঘুনন্দনের মত তার ঘনিষ্ঠ কর্মীরাও বারবার আড়চোখে তাকে দেখেছে। তারা কথা বলেনি বেশী। আর সেও কথা বলতে পারেনি। বাধো বাধো ঠেকেছে। সেইদিনই উচিত ছিল দুজনকে দেওয়ানখানায় ডেকে এনে সবার সামনে কড়কে দেওয়া। সেদিন তার নরম হওয়া উচিত হয়নি। তাতে তার ওপর থেকে অনেকের বিশ্বাস নিশ্চয় চলে গিয়েছে। পরে সে ওদের এ ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছে বটে, কিন্তু কারও সামনে এ কথা বলেনি। তখনো মনে মনে তার বাসনা ছিল, লোকে জানুক এতে তার নীরব সমর্থন রয়েছে। তাতে কাজ হবে বেশী।

আজ বুঝেছে ভুল করেছিল সেদিন। বাদশাহী সাম্রাজ্য দেখতে গিয়ে নিজের ঘরে আগুন লেগেছে। মেয়েটা সুখী হলো না। মেয়ের মেয়েও সুখ পেল না। জীবনে আজ প্রথম মনে হলো বেগমসাহেবা পর্যন্ত একটু দূরে সরে গেল। কী লাভ হলো? একান্ত আপনজন যদি আপন না থাকে, তারা যদি দুঃসহ জ্বালায় জ্বলতে থাকে, তবে কিসের দেওয়ানী! ক্ষমতা? হ্যাঁ ক্ষমতার একটা আশ্চর্য মোহ আছে সন্দেহ নেই, যা অর্থ কিংবা আত্মীয়স্বজন দিতে পারে না। কিন্তু কোনটা বড়? অনেকে বলবে, ক্ষমতা। ক্ষমতা অনেক সময় মানুষকে মৃত্যুর পরেও বাঁচিয়ে রাখে।

হ্যাঁ ক্ষমতা। আজ সে বড় একা। তবু উপায় নেই। সমস্ত ক্ষমতা পরিত্যাগ করে সে ফকির হয়ে যেতে পারে না। তেমন অবস্থা যদি হয় কখনো, বেগমসাহেবাই সহ্য করতে পারবে না। সে কখনো পারবে না দীন-দরিদ্র অবস্থায় বেঁচে থাকতে। এখন নিরাপদ আশ্রয়ে প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে সে অনেক কথা ভাবার অবসর পাচ্ছে। অনেক বড় বড় কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে। তখন তা পারবে না। দীন অবস্থার জন্য দোষারোপ করবে স্বামীকে। ক্ষমতায় উঠতে হলে, প্রাচুর্যের মুখ দেখতে হলে, সাধারণ মাপকাঠির অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়। আজ নাফিসা যদি অতি দরিদ্র মিষ্টি স্বভাবের চরিত্রবান পুরুষকে স্বামী হিসাবে পেত, তাতে শান্তি পেত? সে নিশ্চয় চাইত ঐশ্বর্য। সব দিক বজায় রাখা যায় না। রেজা খাঁ আর নাজির খুবই বাড়াবাড়ি করেছে ঠিকই কিন্তু তাই বলে জমিদারদের নিষ্কৃতি দেওয়া চলবে না।

তাদের শাস্তি পেতেই হবে। বাড়াবাড়িগুলো বাদ দিতে হবে। তবে হ্যাঁ কঙ্কর সেন আর দর্পনারায়ণকে যখন ফাঁদের মধ্যে পাওয়া যাবে, তখন তাদের শাস্তি সাধারণ শাস্তি কখনই হবে না। তারা বৈকুণ্ঠ দেখবে না ঠিকই, কিন্তু শুধু অনশনে রেখে বা বেত্রাঘাত করে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে না। দেখতে হবে যাতে তারা পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। দর্পনারায়ণ এক কথায় অপূর্ব। তার কাছে ঋণের শেষ নেই। তবু তার নিস্তার নেই। তবে তার ছেলে সম্বন্ধে ভাবতে হবে। যাতে সে ভাল পদ পায়। ছেলেটি বুদ্ধিমান। কঙ্কর সেন সম্বন্ধে কোনরকম দায়দায়িত্ব নেই। সে কোন উপকার করেনি দর্পনারায়ণের মতো।

গোলাপ রায় চলেছে পালকীতে। মুর্শিদকুলী খাঁর কাছ থেকে এজন্যে আগেভাগে অনুমতি নেওয়া হয়েছে। নইলে মুর্শিদাবাদে হিন্দু জমিদারেরাই পালকীতে চাপতে পারে না। তাদের যেতে হয় ডুলীতে। গোলাপের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা। শত হলেও আজ তার বিয়ে। বিয়ে তো জীবনে বেশী হয় না। একবার, বড় জোর দুবার। যারা আরও একটু ভাগ্যবান, তাদের বিয়ে তিনবারও হয়। তিনবার বিয়ে করতে হলে একটা বউকে অন্তত মরতে হয়। নইলে বদনাম। তেমন ভাগ্যবানের অভাব নেই যদিও। কুলীন ব্রাহ্মণের কথা আলাদা।

গোলাপ রায়ের বিয়ে করার মোটেও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সে দেখেছে তার বাবার চেহারা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, আর মেজাজও সপ্তমে চড়ছে। বিয়ে করব না একথা বলার ক্ষমতা তার হয়নি। কোন ছেলে যে বাপের পছন্দ করা কনেকে বিয়ে করতে চায় না এমন কথা সে জীবনে শোনেনি। তাই সে পালকীতে চলেছে আজ। আর ভাবছে সেই মানস-প্রিয়ার কথা। মেয়েটি পঞ্চবটীর কাছে আর কখনো আসেনি। কিন্তু একদিন একটা ছোট্ট খেজুর গাছের আড়াল থেকে তাকে দেখেছিল। চোখাচোখি হতে পালিয়ে যায়। একটু কাছে কেন এলো না? তার নাম জিজ্ঞাসা করতে পারত। তাকে বলতে পারত, তার জীবন থেকে সে একেবারে মুছে যাবে।

পালকী দোল খাচ্ছে, তবু তার মন ভার। সে শুনেছে তার শ্বশুর বাড়িও গঙ্গার ধারে। তাই পঞ্চবটীর কাছে এলে তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তারপর সেই ছোট্ট খেজুর গাছ পার হতে গিয়ে তার চোখ সজল হয়ে ওঠে। ইচ্ছে হয় গাছটিকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু পৃথিবী বড় নির্দয়। তার সঙ্গে যে সব বরযাত্রী ছুটতে ছুটতে আসছে, তারা কত হাসি কত ঠাট্টা করছে। তার ভাল লাগছে না। বাবা আর কাকা ঘোড়ায় চেপে আসছে। দেওয়ান সাহেব নিজে সেই ঘোড়ার ব্যবস্থা করেছে।

বিয়েতে বসে লাল চেলি পরিহিতা অবগুণ্ঠিতা কন্যার হাত দুটো বেশ গৌরবর্ণ দেখলো সে। সঙ্গে সঙ্গে ভাবলো, কত গৌরবর্ণা পাত্রী পৃথিবীতে আছে। কিন্তু মানস-প্রিয়া তো একজনই হয় জীবনে। তবু সামনের ওই কন্যা তার ধর্মপত্নী হতে চলেছে। সুতরাং এখন অন্য কথা মনে আনা পাপ। সামনের এই কন্যা শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে তার সঙ্গিনী হবে। এর প্রতি তার কর্তব্য রয়েছে। মানস-প্রিয়ার কথা এখন না ভাবাই ভাল। তবে সে যদি আজ জীবনে আসত জীবন ধন্য হতো। সেই পদযুগল গঙ্গার পলির প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছিল যাতে, সেদিন রাতে তিনটে পদাবলী আর সুন্দর সায়ার রচনা করেছিল।

মেয়েটির হাত তার হাতে রাখা হয়। কী নরম হাত। সে নিজেও গৌরবর্ণ, কিন্তু মেয়েটির রঙও মানস-প্রিয়ার মত শ্বেতবর্ণ। নিজেকে তার কৃষ্ণবর্ণ বলে মনে হতে লাগলো। সে আড়চোখে একবার বাবা আর কাকার দিকে দেখে নেয়। মেয়েটার হাত তার হাতে দেওয়াতে তার নিজের কোন দোষ নেই। ওরা দিয়েছে। তবু বাবা রেগে যেতে পারে। সে দেখে এদিকে বাবার ভ্রূক্ষেপ নেই। দেখে নিশ্চিন্ত হয়।

শুভদৃষ্টির আগে তার মন ব্যথায় ভরে গেল। মানস-প্রিয়া যদি হতো। কিন্তু সে কোথায়? এই সব বাড়ির কাছাকাছি কোন বাড়িতে রয়েছে সে। তার তো বাবা নেই।

শাঁখ বাজলো, মেয়েরা উলুধ্বনি দিল। তবু গোলাপ বধূর দিকে তাকাতে চায় না। সবাই চেঁচিয়ে ওঠে—তাকাও তাকাও, এ হলো শুভদৃষ্টি—তাকাতে হয়। নইলে বিয়ে সিদ্ধ হয় না।

গোলাপ তাকালো। মেয়েটিও তাকালো। মেয়েটির মুখে আবছা হাসি ফুটে ওঠে। গোলাপ দেখে এযে তার মানস-প্রিয়া! বধূ মাথা নীচু করে—গোলাপ তাকিয়েই থাকে। তার বুকের ভেতরে ঘূর্ণিঝড়।

ভূপতি রায় খিঁচিয়ে ওঠে—হয়েছে, হয়েছে। নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার।

কাকা কিশোর রায় কন্যার খুল্লতাত অর্থাৎ নতুন বেয়াইকে হেসে বলে—আমাদের বাড়ির বধূ-ভাগ্য বরাবর ভাল।

—আমাদের মানসী খুব শান্ত প্রকৃতির। আপনাদের ঘরে গেলে বুঝতে পারবেন।

কন্যার নাম মানসী গোলাপ জানত। কিন্তু এই নাম এমন অর্থবহ হয়ে ওঠেনি আগে। সে আশেপাশে বন্ধু-বান্ধব কারও সঙ্গে কথা বলে না। বাবা-কাকার সঙ্গেও নয়। নিজের আনন্দে নিজে নিজে গদগদ হতে থাকে।

পরদিন বাসী বিয়ে, অগ্নিসাক্ষী করার জন্য হোম ইত্যাদি সব কিছু ঘোরের মধ্যে কাটে। কত কাছাকাছি সে মানস-প্রিয়ার। অথচ কথা বলতে পারে না। মাথা নীচু করে ঘোমটার আড়ালে লুকিয়ে আছে তার বধূ। কী বিশ্রী নিয়ম। এই রাতে বধূর মুখ দেখতে নেই আবার—কাল রাত্রি। এখন অবশ্য মুখ দেখা যায়। কিন্তু

মানস-প্রিয়া নিজে পাতলা ওড়নার আড়াল থেকে তাকে দেখছে ঘন ঘন। অথচ সে দেখতে পাচ্ছে না। ছেলেদের যদি ঘোমটা দেওয়ার নিয়ম থাকত বেশ হতো। ও মজা বুঝতো।

পরদিন সারাটা দিন কষ্টেসৃষ্টে কাটাতে হলো। শ্বশুরবাড়ি থেকে সন্ধ্যার সময় আগের দিন চলে আসার সময় মানস-প্রিয়া কেন যে অত কাঁদলো তার মাথায় এলো না। ওর বাবা নেই, শুধু মা। তাই বোধ হয় মাকে জড়িয়ে ধরে অমন কাঁদছিল। গোলাপেরও কান্না পাচ্ছিল। চোখ ভিজে ভিজে লাগছিল। এ বাড়িতে এসে কিন্তু কান্নাটান্না কিছুই রইল না। বেশ ভিড়ে গেল বাড়ির সবার সঙ্গে। গোলাপ ওদের কাছাকাছি যেতেই সবাই চেঁচিয়ে উঠছিল—আজ নয়, আজ নয়। মুখ দেখতে নেই। চলে যা এখান থেকে।

কিন্তু ফুলশয্যার সময় যাবে কোথায়? পরদিন সারাটা দিন তাই কত ছোটাছুটি করেছে। যেন কাজের সীমা নেই। মা আর কাকীমা শুধু বুঝেছিল এসব লোক দেখানো। তারা মুখ টিপে হেসেছিল। বলেছিল—গোলাপ এত কাজের মানুষ জানা ছিল না। আর কাজ করতে হবে না। ঢের হয়েছে। চুপচাপ গিয়ে বসে থাক। বউভাতের খাওয়া দাওয়ার সময় শুধু সামনে হাজির থাকবি।

মুর্শিদকুলী খাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ভূপতি রায়। সে রাজী হয়েছিল বটে, কিন্তু সে এলে সামাজিক অসুবিধা আছে সেটা তার জানা। তাই মূল্যবান উপহার পাঠিয়েছে নব-দম্পতির জন্য। আর বলেছিল, কদিন পরে যেন গোলাপ আর তার বউকে দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ভূপতি রাজী হয়েছিল।

অবশেষে ফুলশয্যা। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল গোলাপ রায়।

কাকীমা এসে বলে—যা গোলাপ এবারে শুতে যা।

—কোথায়?

—বাঃ তোর ঘরে। কী সুন্দর ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে দেখিস নি?

—না। আমাকে কেউ ঢুকতে দেয়নি। আমার গামছা কাপড় জামা সব ও ঘরে। তবু ঢুকতে দেয়নি। যতবার গিয়েছি, ওরা সব আমার জিনিস এগিয়ে দিয়ে বের করে দিয়েছে।

—ওরা তোর সঙ্গে মজা করেছে। ঘর সাজানো দেখতে দেয়নি। এখন দেখিয়ে অবাক করে দেবে বলে। যা গিয়ে দেখগে।

নিজের ঘরে গিয়ে সত্যিই অবাক হয় গোলাপ। যেন স্বর্গপুরী। কী সুন্দর। সবাই হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে।

পাড়ার একটা মেয়ে বলে ওঠে—আজ কিন্তু গোলাপদাকে একা একা থাকতে হবে।

গোলাপ চমকে ওঠে। বলে—কেন? একা কেন?

সবাই খিলখিল করে হেসে কুটিকুটি হয়।

—ও মা। কী নির্লজ্জ গো। বিয়ে যেন আর কারও হয় না।

—আমি কি বলেছি হয় না? তোরও তো হলো পাঁচ মাস আগে। তুই ফুলশয্যার দিন একা শুয়েছিলি?

হাসির ধুম পড়ে যায়। তখন গোলাপের খেয়াল হয় সে বোকার মত কথা বলে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি চুপ করে যায়।

মেয়েটি মুখ ভার করে বলে—ঠিক আছে বাবা। তোমার জিনিসকে তোমার কাছে দিয়ে যাচ্ছি। কোথায় রে নিয়ে আয় নতুন বউদিকে। গোলাপদা চটে গিয়েছে।

অবশেষে মানসীকে ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে ওরা দরজা বন্ধ করে দেয়। মানসী ঘরে দাঁড়িয়ে আস্তে করে ভেতর থেকে খিল তুলে দেয়; তারপর দরজায় ঠেস দিয়ে গোলাপের দিকে মুখ করে তাকায়। তার মুখে হাসি। গোলাপ ভাবে, স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে তার মানস-প্রিয়া। কী সুন্দর সাজিয়েছে ফুল দিয়ে। ওকে কি ওইভাবে আলগোছে সারারাত বসে থাকতে হবে? নইলে ফুলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে যে। ওকে ছোঁয়াও যাবে না।

গোলাপ খাটের ওপর বসে থাকে। সে জানে না কি বলতে হয়। এ তো আর পঞ্চবটী নয় যে গঙ্গা থেকে কাদা তুলে এনে পায়ে মাখিয়ে দেবে।

মানসী এক পা এক পা করে এগিয়ে আসে। তারপর হঠাৎ দুহাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে—সব বাইরে আছে। আমাদের কথা শুনবে বলে রাত জাগছে। আমরা একটাও কথা বলব না লক্ষ্মীটি।

গোলাপ মোহিত হয়ে ঘাড় কাত করে। কেউ জড়িয়ে ধরলে এমন লাগে সে জানত না। জগবন্ধুর সঙ্গে কুস্তীকরার সময় অন্যরকম লাগত। মানসী ইসারায় গোলাপকে বিছানায় শুয়ে পড়তে বলে। গোলাপ তাই করে। মানসী মশারী গুঁজে দিয়ে ফুলের অলংকার একটা একটা করে খুলে আস্তে করে গোলাপের পাশে শুয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফিসফিস্‌ করে বলে—তোমার নামে শিবের মাথায় জল দিতাম রোজ।

গোলাপ চেঁচিয়ে উঠতে যায়—এ্যঁ।

মানসী তাড়াতাড়ি তার মুখ চেপে ধরে। গোলাপ হাল ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকে। মানসী কখনো তার চুল নিয়ে খেলা করে। কখনো গালে হাত বোলায় কখনো নাকটা নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখে, কখনো হাতের লোম ধরে টানাটানি করে। আর গোলাপ কিছু করতে গেলেই বলে ওঠে—চুপ্‌।

মুর্শিদকুলী খাঁ ভূপতি রায়কে দেখে একদিন চমকে ওঠে। এ কী চেহারা হয়েছে এক রাতের মধ্যে। দিনের পর দিন তাকে কৃশ হয়ে যেতে দেখেছে। কয়েকবার শরীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে দেখেছে সদুত্তর দেয় না। এড়িয়ে যায়। কিন্তু আজ তার এ কী অবস্থা।

—ভূপতি।

—হুজুর।

—এদিকে এসো। এখানে বসো।

—বসবো ?

—হ্যাঁ। বসো।

বসতে পেয়ে ভূপতি বেঁচে যায়। তার দৃষ্টিতে ক্লান্তি ঝরে পড়ে। ভেতরে মনে হয় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।

—তোমার কি হয়েছে ভূপতি ?

—হুজুর।

—ওসব হুজুর-টুজুর বলতে হবে না। আমাকে লুকিও না। তোমার কিছু হোক আমি তা চাই না। তোমার কিছু হলে আমি খুব ব্যথা পাবো ভূপতি।

—আমি অনেকদিন ধরে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছি। কাউকে বলতে চাই নি। আপনাকে বললে, আপনি আমাকে রাখবেন না। ঘরে বসে রোগ যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে কাজের মধ্যে থাকতে চেয়েছি।

—কি হয়েছে ?

—কবিরাজ মাধব বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন আমার কর্কট রোগ হয়েছে। আমার দিন ফুরিয়ে আসছে। তাই ছেলেটার বিয়ে দিয়ে দিলাম।

মুর্শিদকুলী খাঁ গম্ভীর হয়ে যায়। ভূপতির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ উঠে তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে এক হাত দিয়ে সস্নেহে তাকে বেষ্টন করে।

ভূপতি ভয় পেয়ে বলে ওঠে—হুজুর। একি করছেন।

—কিছু না ভূপতি। তুমি আমার কত প্রিয় তা তো জান না। আমরা যতই ক্ষমতাবান হই, মৃত্যুকে ঠেকাতে পারি না। এ বড় আফশোসের ব্যাপার। আল্লার কাছে দোয়া করি তিনি যেন তোমাকে শান্তি দেন।

ভূপতি দেওয়ান সাহেবের স্পর্শে কেঁদে ফেলে। তারপর সামলে নেয়।

—তুমি এত কষ্ট করে এসো না। তোমার যদি আপত্তি না থাকে আমি গিয়ে দেখে আসব। তুমি রুগী, তোমাকে দেখতে গেলেও কি তোমার ঘরের কোন কিছু অপবিত্র হবে ? হাকিমও তো রুগী দেখতে যায় হিন্দুদের বাড়িতে।

—না হুজুর। আপনি গেলে আমার কোন কিছুই অপবিত্র হবে না। বরং আরও পবিত্র হবে।

—তুমি বাড়ি যাও। তোমার সংসার সম্বন্ধে কোন চিন্তা রেখো না। গোলাপ কিছু করুক না করুক, তার কোন অসুবিধা হবে না।

মৃত্যু পথযাত্রী ভূপতি স্তম্ভিত হয়ে সব শোনে। মুর্শিদকুলী খাঁর এই কোমল হৃদয়ের পরিচয় সে আগেও পেয়েছে তবে এমন ভাবে নয়।

সেই রাতেই ভূপতি ইহলোক ছেড়ে চলে গেল।

দুদিন মুর্শিদকুলী খাঁ দেওয়ান-খানায় এসে বিমর্ষ হয়ে বসে থাকে, ভূপতি যেখানে এসে বসত সেখানে এসে দেখে যায়। ভূপতির বসার একটা বিশেষ ভঙ্গী ছিল। আর সে চার আঙুল দিয়ে কলম ধরে ঝুঁকে বসে হিসাবের খাতায় লিখত। লেখার কালি সে নিজে বাড়ি থেকে তৈরী করে আনতো। সাধারণ কালি তার পছন্দ হতো না।

তিনদিনের দিন বসে থেকে থেকে একসময় মুর্শিদকুলী খাঁর মনে হয় ভূপতির কাজের দায়িত্বটা দর্পনারারণকে দিতে হবে। আরও একটু উঠুক ও। সে দর্পনারায়ণ আর রঘুনন্দনকে ডেকে পাঠায়।

ওরা এলে সে বলে—ভূপতি চলে গেল।

ওরা চুপ করে থাকে।

মুর্শিদকুলী খাঁ প্রশ্ন করে—ওর ওই পেশকারের কাজটা সোজা নয়। কাকে দেওয়া যায়?

দর্পনারায়ণ আর রঘুনন্দন নীরব থাকে।

—আমি স্থির করেছি দর্পনারায়ণ, আপনি ভূপতির কাজের ভার নিন।

দর্পনারায়ণ উৎফুল্ল হয়ে বলে ওঠে—যে আজ্ঞে হুজুর।

রঘুনন্দন সামান্য মনঃক্ষুণ্ণ হয়। সে ভেবেছিল ভূপতি রায়ের কাজটা তাকে দেওয়া হতে পারে। যা হোক, বাইরে সে তার মনোভাব প্রকাশ করল না। বরং দর্প-নারায়ণ কাজটা পাওয়ায় যে আনন্দিত এমন ভাব দেখালো।

ভূপতির মৃত্যুতে মুর্শিদকুলী খাঁর অন্তরের দাগা বেগমসাহেবার কাছেও প্রকাশিত হয়নি। এই আঘাত একা সহ্য করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এরই মধ্যে বাদশাহের কাছ থেকে প্রাপ্ত একটা সংবাদ তার ভেতরে আবার নয়া প্রাণের জোয়ার আনলো। এও আল্লার রহমত বলতে হবে। সে দেখেছে যখনই সে একটা আঘাত পেয়েছে তখনই মৃত সঞ্জীবনীর মত কোন ঘটনা কিংবা অন্য কিছু তাকে জীবন প্রবাহে দ্বিগুণভাবে ফিরিয়ে এনেছে। বাদশাহ ফরমান পাঠালেন, এবার থেকে মুর্শিদকুলী খাঁ শুধু দেওয়ান নয় এবার থেকে সে হলো বাংলার পরিপূর্ণ সুবাদার। তার সেই বিস্মৃত-প্রায় উপাধি যা শাহানশাহ আলমগীর বহু ব্যক্তির ঈর্ষার উদ্রেক করে তাকে দিয়েছিলেন, সেই উপাধির কথাও আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো। বলা হলো, সেটাই যেন হয় এবার থেকে, তার পরিচয়। সেই মুতামান-উল-মুল্‌ক আলাউদৌলা জাফর খাঁ বাহাদুর নাসিরি নাসির জং।

মুর্শিদাবাদ নগরী বহুদিন পরে এই উপলক্ষে সজ্জিত হলো। মানুষ-জন ঘর ছেড়ে রাস্তা ঘাটে বেরিয়ে পড়ল। গঙ্গা বক্ষের জলযানগুলিতে পতাকা উড়লো। চারদিকে লোক পাঠানো হলো ঘোষণার জন্যে নবাব জাফর খাঁ এখন থেকে বাংলার সুবাদার এবং সেই সঙ্গে দেওয়ানও। এই সঙ্গে বিহার আর উড়িষ্যার নিজামত আর দেওয়ানীর ভারও তার ওপর দেওয়া হলো। তাই সেই দুই সুবাতেও ঘোষণার ব্যবস্থা করা হলো।

সেই রাতে এই বয়সেও মুর্শিদকুলী খাঁ জেগে-জেগে স্বপ্ন দেখল। এতবড় এক এলাকার তার। এ যে একটা সাম্রাজ্য! এক কথায় বাংলা বিহার উড়িষ্যার দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা সে। জীবনে প্রথম তার মনের অজ্ঞাত স্থান থেকে কে যেন বলে উঠলো, মুঘল সাম্রাজ্যের যা দশা, ইচ্ছে করলে তুমি এই বিরাট রাজ্যের স্বাধীন সর্বময় অধীশ্বর হতে পার। এতদিনের মুঘলদের অনুগত কর্মচারীর আনুগত্যে চিড় ধরার উপক্রম হলো। আপন মনে সে মৃদু প্রতিবাদ করে ওঠে—না না, আমি নই। তবে আসাদ যদি তেমন কিছু করে উপায় কি? আমি তখন জীবিত থাকব না। এতদিন তো সুবাদারী ও দেওয়ানী কখনো একজনের হাত পড়েনি। এখন যখন পড়েছে, আসাদের স্বপ্ন দেখতে ক্ষতি কি? তবে আমি অনুগত। আমি আর কদিন।

সুবাদার হয়ে কার্যভার গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যে একজন বহু-প্রার্থিত ব্যক্তি অত্যন্ত নির্বিকার চিত্তে এসে চেহেল সেতুনে তার দর্শনপ্রার্থী হলো। লোকটি কঙ্কর সেন। চলতি নাম যার কাঁকর বাঙালী। হুগলীর ফৌজদার জিয়াউদ্দিন খাঁর সঙ্গে সে চলে গিয়েছিল দিল্লীতে। কিন্তু সেখানে গিয়েই তার প্রভুর মৃত্যু হয়। সে ফিরে আসে হুগলীতে। সেখানে কিছুদিন বাস করে সোজা চলে আসে মুর্শিদাবাদে নবাবের সঙ্গে দেখা করতে। তার মত অমন চালাক চতুর ব্যক্তি এমন মূর্খের মত কাজ কেন যে করল মুর্শিদকুলী খাঁ নিজেও বুঝতে পারে না। কঙ্কর সেন তার সাক্ষাৎ-প্রার্থী শুনে সে প্রথমে বিশ্বাস করেনি। পরে যারা তার পরিচিত তারাই মুর্শিদকুলী খাঁকে বলে, হ্যাঁ, কঙ্কর সেনই বটে।

লোকটা শুধু মূর্খ নয়, মাথার ছিট আছে বোধ হয়। নইলে নিজেকে খুব উঁচুদরের কিছু ভাবে। কারণ নবাবের সামনে এসে সে বাঁ হাতে তাকে কুর্নিশ করে।

একজন ধমকে ওঠে—নবাবকে তুমি বাঁ হাতে কুর্নিশ করলে কেন?

সে হেসে বলে—আমি হিন্দুস্তানের বাদশাহকে ডান হাতে সেলাম জানিয়েছি। সেই হাতে একজন সামান্য সুবাদারকে কীভাবে সেলাম জানাই?

এবারে মুর্শিদকুলী খাঁ নিজেই বলে—তা বটে। কিন্তু তোমার আগমনের হেতু কি?

—আমি একটা কাজ চাই।

—হুঁ। কিন্তু কাঁকর এতদিনে যে সত্যিই আমার জুতোর তলায় এলে।

—কি বললেন?

—কিছু না। কাজ চাও, কাজ দিচ্ছি। তোমাকে হুগলীর চাকলাদার করলাম।

কঙ্কর সেন খুশী হয়ে চলে গেল। বুঝলো না, নবাব লম্বা সুতো ছাড়লো।

তারপর বছর শেষের হিসাব পরীক্ষার সময় তাকে বন্দী করা হলো। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে তহবিল তছরূপ করেছে। সুতরাং ক্ষমা নেই।

সৈয়দ রেজা খাঁ অসুস্থ। কিছুদিন থেকে তার কিছু হজম হয় না। অমন

সুন্দর চেহারা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। জমিদারদের শাস্তি দেওয়ার ভার বেশ কিছুদিন হলো তার ওপর নেই। নাফিসার চেষ্টায় তাকে নাজির আহমেদের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তবু সে নাকি মাঝেমাঝে ছুটে যায় নিজের বিকৃত মনের পরিতৃপ্তির জন্য। তবে কঙ্কর সেনের ভার সে পেল না। তার শরীরের অবস্থাও তেমন ছিল না।

নাজির আহমেদও তেমন কিছু করল না। সে কঙ্কর সেনের কক্ষে আহার্য কিংবা পানীয় কিছু না রেখে শুধু রাখলো লবণ মেশানো মোষের দুধ। দিনের পর দিন বন্দী থেকে বাধ্য হয়ে সেই দুধ খেতে থাকল কঙ্কর। কয়েক দিনের মধ্যেই শুরু হলো মারাত্মক পেট খারাপ। সেটা আর বন্ধ হলো না। কাঁকরকে পায়ের নীচে গুঁড়িয়ে দিল নবাব জাফর খাঁ। শরীরের সমস্ত জল নিঃশেষিত হয়ে মারা পড়ল কঙ্কর সেন।

হিন্দুস্থানের মসনদকে ঘিরে যে একটা অস্থিরতা বিরাজ করছে এ খবর মুর্শিদকুলীর জানা। তার চর খবর এনেছে ঢাকায় ফারুকশিয়ার থাকার সময় যে কাজী ছিল সেই মীর জুমলা আর সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে মনে মনে। সৈয়দ হুসেইন আলি খাঁ আর সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ মহান বংশের সন্তান হলেও, এদের কার্য-কলাপের মধ্যে মহত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নি কখনো। মীরজুমলাও তেমন সুবিধার নয়। ওদিকে আর একজন জুটেছে। সে হলো সৈয়দ আবদুল্লা খাঁর দেওয়ান রতন চাঁদ।

ওখানে কি হচ্ছে, তাতে মুর্শিদকুলী খাঁর কিছু এসে যায় না। তার একমাত্র চিন্তা নজরানা পাঠালে সেটি প্রকৃত বাদশাহের হাতে পেঁছোবে কিনা। অনেকবারই এই টালমাটাল অবস্থায় বিপুল অর্থ হাতছাড়া হয়েছে। কারণ নিয়ম হলো, যখন যে সুবার মধ্যে দিয়ে সেটি যাবে, তখন সেই সুবাদারের ভার থাকে তার সীমান্ত পর্যন্ত নিরাপদে পেঁছে দেওয়া। নতুন এলাকার সুবাদারের লোকজন এসে সেটির ভার গ্রহণ করে। কিন্তু দেখা যায় সুবাদারের পক্ষে অনেক সময় শাহাজাদারা থাকে। তারা এক এক দিকে ভিড়ে যায়।

বেশীদিন মুর্শিদকুলী খাঁকে অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হলো না। খবর এলো ফারুকশিয়ার নিহত হয়েছেন। ওই সৈয়দ ভাইরা ক্ষমতার লোভে এমন রক্তলোলুপ হয়ে উঠেছিল যে ফারুককে বন্দী করে ফেলে অন্যান্য কর্মচারীদের সাহায্য নিয়ে। তারপর তাকে হত্যা করে। মুর্শিদকুলী খাঁর চোখের সামনে এক তরুণের মুখাকৃতি মুহূর্তের জন্য ভেসে উঠল। এই তরুণ তাকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছে। কিন্তু উপায়

কি ? নতুন বাদশাহ কে হলেন সেই খোঁজ নিতে হবে। রাজস্ব পাঠাতে হবে তাঁকে। উপঢৌকন পাঠাতে হবে।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্য নিয়ে পুতুল খেলতে শুরু করল। তারা বাহাদুর শাহের পুত্র বাদশাহজাদা রফি-উস্-সানের পুত্র রফিউদ্দরজৎকে বাদশাহ করল। কিন্তু পাঁচমাসের মধ্যেই ক্ষয় রোগে তার মৃত্যু হলো। তখন তার পরের ভাই সুলতান রফিউদ্দৌলাকে মসনদে বসানো হলো। ওরাই যেন হিন্দুস্থানের আসল মালিক। মসনদে লোক বসবে ওদের মর্জি মাফিক। রফিউদ্দৌলার উপাধি হলো শাজাহান দ্বিতীয়। কিন্তু নতুন বাদশাহও বেশীদিন টিকলো না। পাঁচমাসের মধ্যে তারও মৃত্যু হলো।

ইতিমধ্যে বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের সব চাইতে প্রিয় পুত্র আকবরের পুত্র নেকোশিয়ার মসনদ দখলের জন্য অভিযান চালালো। তখন সৈয়দ ভাইরা তাড়াতাড়ি সৈন্যসামন্ত নিয়ে বাদশাহ জাহানশাহের পুত্র সুলতান রোশন আখতারকে তখ্‌ত্-তাউসে বসিয়ে দিল। উপাধি দেওয়া হলো আবুল ফত নাসিরুদ্দিন মুহম্মদ শাহ গাজী।

মুহম্মদ শাহকে যতটা নরম প্রকৃতির বলে মনে হয়েছিল, তিনি মোটেই তেমন ছিলেন না। সৈয়দ ভাইরা হাড়ে হাড়ে সেটা টের পেল। কিছুদিনের মধ্যেই দুই ভাই খুন হয়ে গেল।

খবর এসে পেঁছিতেই মুর্শিদকুলী খাঁ জীবনে যা কখনো করেনি, তাই করল। সে রাজস্বের সঙ্গে নানা উপঢৌকন তো দিলই, সেই সঙ্গে পত্র লিখে বাদশাহের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানালো। লিখল, হিন্দুস্থানের ওপর থেকে একটা অশুভ প্রভাব কেটে গেল।

মানুষটার প্রতি এখন আর একবিন্দু ঘৃণা নেই নাফিসার। তাকে দেখলে মায়া হয়। কোথায় চলে গেল ওর তারুণ্য, কোথায় গেল যৌবন। কঙ্কালসার জীবন্মৃত এক ব্যক্তি পালঙ্কের ওপর শুয়ে রয়েছে। হাকিম এসে দেখে যাচ্ছে। সেবা করছে তিনজন বাঁদী। বেগমসাহেবা দিনের শেষে একবার এসে দেখে যায়। মুর্শিদকুলী খাঁ সপ্তাহে একবার এসে কিছুক্ষণ থাকে। উন্নতি কেউ দেখতে পায় না। হাকিমকে জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলতে চায় না। বলে শুধু, চেষ্টা করে যাচ্ছে সাধ্যমত।

নাফিসা বুঝতে পারে মানুষটা বাঁচবে না। এত যে অত্যাচার করেছে ও, তারই ফল কি ? বলা মুশকিল। সে যখন কাছে যায় তার হাত চেপে ধরে। ছাড়তে চায় না। বিশেষ কিছু বলে না। চোখ দুটো সজল হয়ে ওঠে মানুষটার। সে-ও বোধ হয় বুঝেছে বাঁচবে না। দিন ঘনিয়ে আসছে। অথচ কত অন্যরকম হতে

পারত। এত তাড়াতাড়ি কত দায়িত্বপূর্ণ পদ দিয়েছিল দাদু। ছোট বোনের স্বামী মির্জা লুৎফুল্লাকে দাদু ঢাকায় নিজের সহকারী নিযুক্ত করল। তারপর বোধ হয় বুঝতে পারল রেজা খাঁর কোন আশা নেই। তাই নিজের এতদিনের উপাধি "মুর্শিদকুলী খাঁ" মীর্জা লুৎফুল্লাকে দিয়ে দিল। খবরটা শুনে নাফিসার হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল। বোন তার ছোট হলেও তার প্রতি হিংসা হয়েছিল। ভাগ্যে নেই। সবই পেয়েছিল সে, টিকলো না। এমন কি রেজার ওপর তার ভালবাসাও মরে গিয়েছে। একথা দাদিকে বলা যায় না, মাকেও লেখা যায় না। কিন্তু এটাই চরম সত্য। রেজা তার হাত চেপে ধরলে একবিন্দুও বিচলিত হয় না সে। কাঠের পুতুলের মত চুপচাপ বসে থাকে। রেজা আগে বুঝতো না, এখন ওর দৃষ্টি দেখে বোঝা যায় নাফিসার মনের খবর জেনে ফেলেছে। অনেকদিন রোগে ভুগলে মানুষের অনুভূতির তীব্রতা বৃদ্ধি পায় মনে হয়। তবে এজন্যে রেজার কোন অনুযোগ নেই। বোধহয় অনুযোগ অভিযোগের ঊর্ধে চলে গিয়েছে সে। পৃথিবীকে সে এখন আর নিজের আবাসভূমি বলে ভাবতে পারে না সম্ভবত।

আসাদ সেদিন এলো সৈয়দ রেজা খাঁকে দেখতে। সে বহুদিন আসেনি। দেখে চমকে ওঠে। একি মরে গিয়েছে নাকি? না তো, হাত নড়ছে একটু। সে এসেছিল বলতে যে দাদু আজ একটু পরে দেখতে আসবে। কিন্তু কাকে বলবে? তিনজন বাঁদী ছাড়া আর কেউ নেই। বাঁদী তিনজনের একজনও দেখতে তেমন নয়। সে এদিক ওদিক চেয়ে নাফিসাকে খোঁজে। সামনের বড় বারান্দা পার হলে নাফিসার কক্ষ। সে এগিয়ে যায়। অনেক পর্দা ঝুলছে বারান্দায়। পর্দা তুলে তুলে এগিয়ে যেতে একজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। দেখে গুলবিবি।

সে হাত বাড়িয়ে দেয় তাকে ধরতে। গুলবিবি ভয় পেয়ে যায়। তার দারুণ লোভ হয় ধরা দিতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নাফিসার মুখ মনে পড়ে। ছুটে পালায়। পদশব্দে নাফিসা বাইরে আসে।

—ছুটছিস কেন? কি হলো?

নাফিসা ভেবেছে ওদিকে ভালমন্দ কিছু বুঝি হয়ে গেল। কিন্তু গুলবিবি বলে—উনি আসছেন।

—কে?

গুলবিবি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সামনে আসাদ। নাফিসা চটে গিয়ে বলে—বেরিয়ে যা এখুনি।

গুলবিবি হারেমের বাইরে এসে হাঁফ ছাড়ে।

—ভাল আছ গুলবিবি।

কথা শুনে ভয় পেয়ে যায় গুল। তাকিয়ে দেখে খোজা রহিম মিটিমিটি হাসছে।

—তুমি।

—হ্যাঁ, মালিক এসেছেন যে। সঙ্গে আসতে হলো। তা এত হাঁফাচ্ছ কেন?

ষাঁড়ে তাড়া করেছিল বুঝি ?

—না। তোমার মালিক—

—ওই একই হলো। পালিয়ে এসেছ তো? আমার খুব আনন্দ হয়েছে। নিশ্চয় আমার কথা মনে হয়েছিল তোমার ?

গুলবিবি অল্প একটু মাথা হেলায়। সে বলতে পারে না, রহিমকে দেখার আগে তার কথা ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি।

খোজা রহিম সন্তুষ্ট হয়ে বলে—ঘর তুলে ফেলেছি গুলবিবি। ঘরের দাওয়ায় বসলে নদীর হাওয়ায় প্রাণ জুড়িয়ে যায়। উঠোন ঘিরে দিয়েছি। বাইরে থেকে কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না। একটা কুয়ো করতে হবে। নদীর জল তো খাওয়া যাবে না।

—কবে নিয়ে যাবে ?

—অপেক্ষা করতে হবে। শত হলেও আমরা কেনা বান্দা।

সেই সময় বাইরে ব্যস্ততা লক্ষ করা যায়। আওয়াজ ওঠে সুবাদার সাহেব আসছেন। রহিম জানত তিনি আসবেন। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি? সে গুলবিবিকে তাড়াতাড়ি তার নিজের জায়গায় চলে যেতে বলে। আর সে নবাবের আসার পথের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

নবাব জাফর খাঁ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। বয়সের ভার শরীরের ওপর পড়েছে বোঝা যায়। নবাব একবার রহিমের দিকে চায়। রহিম তার অপরিচিত নয়। আসাদ বাইরে এসে নবাবকে সঙ্গে নিয়ে যায়।

—রেজাকে তুমি দেখেছ ?

—হ্যাঁ, বেঁচে আছে বোঝা যায় না।

নবাব গম্ভীর হয় আরও। তারপর বলে—নাফিসা কি বলে ?

—কি আর বলবে ?

—ভেঙে পড়েছে ?

—না। ও জানে রেজা বাঁচবে না।

—সত্যি ?

—হ্যাঁ, নিজে আমাকে বলল। আরও বলল 'মুর্শিদকুলী খাঁ' উপাধিটা রেজার পাওয়া উচিত ছিল। সে বড়। তাকে কিছু না দিয়ে শুধু রাজস্ব আদায়ের কাজে লাগানো হয়েছে, উপাধি পেলে তার সম্মান রাখতে রেজা অত নীচে নামতে পারত না।

নবাব জাফর খাঁর বুকের ভেতরে কেঁপে ওঠে। সেই নাফিসা, সেদিন যে জন্মালো, তার কত আদরের, তার মনও আজ তিক্ততায় ভরে উঠেছে। সে সমালোচনা করছে দাদুর। কিন্তু সে কি মিথ্যা বলেছে ?

সৈয়দ রেজা খাঁর শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়ায় নবাব জাফর খাঁ। দেখে আফশোসে

মন তার ভরে যায়। সে ঝুঁকে পড়ে রেজার মুখের ওপর। মনে হলো ঠোঁট নাড়িয়ে রেজা কিছু বলার চেষ্টা করছে।

মুখের কাছে কান নিয়ে নবাব বলে—বল রেজা।

—আমি ভুল করেছি। আপনি বাধা দেননি।

নবাব জাফর খাঁ জবাব দিতে পারে না। জবাব দেওয়ার কিছু নেই তার। আজ মৃত্যু পথযাত্রী মানুষটির মন্তব্যে আসল সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার মনে। সেও চেয়েছিল পায়জামার মধ্যে বেড়াল ঢুকিয়ে দেওয়ার শাস্তি, সে চেয়েছিল সবাইকে অনশনে রাখতে, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে সে চেয়েছিল। রেজা খাঁর আবিষ্কৃত 'বৈকুণ্ঠের' শাস্তি, বকেয়া খাজনা দিতে যারা অপারগ, তারা ভোগ করুক, সে-ও চেয়েছিল। এমনকি কয়েকটি ধর্মান্তরকরণের ঘটনা ঘটুক এটাও সে চেয়েছিল। আসলে সে চেয়েছিল প্রতিটি কড়ি যেন আদায় হয় এবং বাদশাহের কাছে পাঠানো হয়। এইটুকুকে সে পৃথিবীতে তার সবচেয়ে বড় কর্তব্য বলে ভেবে বসেছিল। এর জন্যে কত লোকের যে মৃত্যু হলো, কত লোক মানসিক ভারসাম্য হারালো সেদিকে সে ভ্রূক্ষেপ করেনি। তার লক্ষ্য পূর্ণ হতে যারা সাহায্য করল তাদের একজন এই রেজা খাঁ। তার বড় আদরের নাতনীর স্বামী। বিবেকের দংশনের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে বোধহয় আজ সে মৃত্যুর কিনারায় এসে উপস্থিত হয়েছে। ওর ওই সামান্য কথাটুকু প্রমাণ করে দিল অনেক উঁচুতে বসে থেকে নীচের সব কিছু না দেখার ভান করে ভালমানুষ হওয়া যায় না। অনেকের চোখে ধুলো দিলেও সবার চোখে দেওয়া যায় না।

নবাব জাফর খাঁ সৈয়দ রেজা খাঁর হাতে হাত রেখে তাকে বলে—তুমি কোন অন্যায় করনি। আমার দোষ।

রেজা খাঁর চোখে একটু জল। সে আর কিছু বলল না। বলতে পারল না। কারণ নবাব বসে থাকতে থাকতে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

নবাব জাফর খাঁ সেদিন নাফিসার চোখে একবিন্দু অশ্রু দেখেনি। নাফিসা তাকে শুধু জিজ্ঞাসা করেছিল, তাকে দীর্ঘ জীবন কি সবার অবহেলার পাত্রী হয়ে বেঁচে থাকতে হবে? নবাব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিল, ব্যবস্থা করা হবে।

মৃত্যু যার শিয়রে অপেক্ষমান তেমন ব্যক্তির সামনে হৃদয় কত নরম হয়ে যায়। অথচ বিরাট এক ভূখণ্ডের শাসনব্যবস্থা চালাতে হলে কত সময় কত কঠোর হতে হয়। না হয়ে কি উপায় আছে? রেজা খাঁর সামান্য উক্তি তার বিবেককে নাড়া দিয়েছিল। তেমনি বেগম সাহেবাও অহরহ বিবেকের বাণী শুনিয়ে যায়। শুনতে ভাল। মেনে চলতে পারলে খুবই ভাল। কিন্তু তাহলে বিবেকের গলায় রাশ পরিয়ে ঘরে বসে থাকতে হয়। কিংবা ফকির হয়ে যেতে হয়। সেটা সম্ভব নয়। যেভাবে এতদিন চলেছে, সেইভাবে তাকে চলতে হবে। কারণ সে সার্থক। সে যে অতিমাত্রায় সার্থক

বাদশাহ আলমগীরের মত বিরল ব্যক্তির পত্র তার প্রমাণ। সেই পত্র তার কাছে আছে। সে যে সার্থক তার বড় প্রমাণ দিল্লীর তখ্‌ত্‌-তাউসে কত পরিবর্তন হলো, অথচ বাংলা শান্ত থেকে গেল। বাংলার সাধারণ মানুষকে এতটুকু উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে চলতে হলো না। সে যে সার্থক তার প্রমাণ এই দেশের ব্যবসা বাণিজ্য। সার্থকতার আরও কত প্রমাণ আছে। রাজস্ব এরাজ্য থেকে নিয়মিত গিয়ে পৌঁচেছে। সেই রাজস্বের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। চুরি ডাকাতি এবং ঠ্যাঙাড়ের উৎপাত খুব একটা বেশী নেই। কাটোয়া আর মুর্শিদগঞ্জে রাজপথের ওপর দুটো থানা করায় দৌরাত্ম্য নেই বললেই হয়। আরও কত বলার আছে। প্রতি পদে বিবেকের বাণী অনুযায়ী চলতে গেলে কিছুই করা হতো না। সুতরাং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাকে একইভাবে চলতে হবে। দর্পনারায়ণ তাকে চূড়ান্ত অপমান করেছিল, প্রতিশোধ না নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে? অবশ্যি দর্পনারায়ণের কুশলতায় আজ তার নাম ডাক। তাই বলে তাকে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। তবে তার ছেলের ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে একটা বিরাট আলোড়ন শুরু হবে। সেই আলোড়নের ধাক্কা এই বয়সে সামলানো কঠিন হবে। দর্পনারায়ণ তার শত্রু, কিন্তু দর্পনারায়ণের কাছে সে যে চিরকৃতজ্ঞ এটা প্রশ্নাতীত।

তাছাড়া দিন ঘনিয়ে এলো। নিজের একটা ব্যবস্থা এবারে করতে হয়। দেহটা যখন একদিন নিস্পন্দ হয়ে যাবে, তখন সেটি কোথায় আশ্রয় পাবে? আগেভাগে তার ব্যবস্থা করে যেতে হবে যাতে চিরকাল শান্তিতে থাকে সেটি। কোন এক মসজিদের লাগোয়া হবে তার অবস্থান। যেখানে মসজিদের প্রতিবারের প্রার্থনার অস্ফুট আওয়াজ ভেসে আসবে তেমন একটি স্থান তাকে খুঁজে বের করতে হবে।

এই উদ্দেশ্যে একদিন অপরাহ্নে নবাব জাফর খাঁ প্রাসাদ থেকে নির্গত হলো, কিছু বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে নিয়ে। নগরীর পূর্বদিকে রয়েছে নবাবের খাস তালুক। সেখানে একটি জায়গা তার খুব পছন্দ হলো। সুন্দর জায়গাটা। এখানেই নির্মিত হবে একটি মসজিদ আর মসজিদ সংলগ্ন কাটরা। হ্যাঁ এখানেই। এখানকার হাওয়া বড় মিষ্টি। সেই আম আর নিমগাছের মধ্যবর্তী কুটিরের সামনে দিয়ে বয়ে যাওয়া হাওয়ার মত প্রাণ জুড়িয়ে দেয় এখানকার বাতাস। এখানে থাকবে একটা গভীর বাঁধানো কূপ। সেই কূপের জলে ওজু করবে সবাই। সেই জল পান করবে কত তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি। আর মসজিদের সোপানশ্রেণীর নীচে সে নিজে শুয়ে থাকবে অন্তিম শয়ানে, যে সোপান শ্রেণীতে পা দিয়ে নমাজ পড়তে উঠবেন কত উলেমা, সৈয়দ সুফীরা। ভাবতে শিহরন জাগে বৃদ্ধ নবাবের।

অনুচর-বৃন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করে নবাব। কার ওপর এই ভার দেওয়া যায়? চোখ পড়ে তার ব্যক্তিগত ভৃত্য মোরাদের ওপর। লোকটার আনুগত্যে এতটুকু খাদ নেই। যে কোন কাজে তার আগ্রহ অপরিসীম। তবে অতি আগ্রহে অনেকসময় ধরে

আনতে বললে বেঁধে আনার অবস্থা করে। তবু মোরাদ সঠিক ব্যক্তি যার হাতে এই কাজ অর্পণ করা যেতে পারে।

—মোরাদ।

—মেহেরবান।

—এখানে সুন্দর একটা মসজিদ তৈরী করতে হবে। সেই সঙ্গে কাটরা। একটা বাঁধানো কূপ থাকবে। মসজিদের সোপান শ্রেণী হবে প্রশস্ত। মনে রাখবে তারই নীচে আমি চিরকালের জন্যে শুয়ে থাকব। তোমার ওপর ভার দিতে চাই। হ্যাঁ, একটা জলাশয়ও খনন করতে হবে।

মোরাদের চোখ সজল হয়ে ওঠে। সে বলে—হুজুর আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

—আগামী কাল থেকে শুরু কর। আমার নিজের কাজ তোমার আর করতে হবে না। লোক যোগাড় কর, মিস্ত্রি যোগাড় কর। মাল-মশলা সংগ্রহ কর। আমি আর কদিন বাঁচব। তার আগে শেষ হওয়া চাই। আর প্রতিদিন কতটা কাজ এগোলো আমাকে জানিয়ে যাবে।

মোরাদ আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানায়। সে বুঝল শেষ সময়ে নবাব তাকে এমন একটি মহৎ কাজ দিলেন তার আনুগত্যের বিনিময়ে যাতে তার নাম থেকে যায়। যাতে সে বেশ ধনী হয়ে যেতে পারে। তার নয়নদ্বয় পুলকাশ্রুতে সিক্ত হয়।

দিন শেষ হয়ে আসছে, বেশ বুঝতে পারে নবাব জাফর খাঁ। ভাবে কত পরিবর্তন তার জীবনে হলো। অখ্যাত এক পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণ ঘরের শিশু পুত্র হয়ে জন্মে, পরে সে হলো মহম্মদ হাদি, তারপরে কারতলব খাঁ, খোলস পাল্‌টে হলো মুর্শিদকুলী খাঁ, সেই খোলসও সে ত্যাগ করল নাত-জামাই লুৎফুল্লার জন্যে। এখন সে নবাব। নবাব জাফর খাঁ। এই নবাবী এখন যাতে পুরুষানুক্রমে হয়, সেই ব্যবস্থা তাকে করতে হবে। আসাদ যার নাম হবে সরফরাজ তার জন্যে নবাবীর অনুমতি পত্র চেয়ে শিগ্‌গির বাদশাহের কাছে চিঠি দিতে হবে। এখন বাদশাহ নামেই বাদশাহ। এ কি আলমগীর? এঁকে যা বলা যাবে তাই করবেন। নইলে যদি চিরকালের প্রবাহমান রসধারা বাংলা থেকে প্রবাহিত না হয়। সেই ভয়েই সম্মতি দেবেন।

কিন্তু দর্পনারায়ণ? তার ব্যবস্থা করার আগেই যদি মৃত্যু হয়? না, এত হিসাবী হয়ে এমন বেহিসাবী কাজ করা যায় না। সে যখন মসজিদের সোপান শ্রেণীর নীচে শুয়ে থাকবে, তখন দর্পনারায়ণ গায়ে হাওয়া লাগিয়ে মুক্ত বিহঙ্গের মত মুর্শিদাবাদের রাজপথে ঘুরে বেড়াবে? এ সহ্য করা যায় না। আশু ব্যবস্থার প্রয়োজন।

পরদিনই দর্পনারায়ণের কাজের ভার কিছু কমিয়ে সেগুলো রঘুনন্দনের হাতে দেওয়া হলো। দর্পনারায়ণ খুবই বিস্মিত হলো। কারণ এবারে সে রাজস্ব তুলে দিয়েছে সব চাইতে বেশী। কিন্তু সে জানে না নবাবের মনের গোপন কথা।

দুদিন পরে আরও কিছু দপ্তর কমানো হলো। প্রবীণ বয়সে দর্পনারায়ণ নিজেকে অপমানিত বোধ করল। কিন্তু কিছু বলতে পারে না।

শেষে তার পেশকার খালসা পদটিও গেল। আর সহ্য করতে পারে না দর্প নারায়ণ। সে নবাবের কাছে গিয়ে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করে তার কি অপরাধ।

—আপনি কি জানেন না, আপনার কি অপরাধ?

—আজ্ঞে না।

—তহবিল তছরূপ।

আকাশ থেকে পড়ে দর্পনারায়ণ। বলে—আমি! জীবনে এমন কাজ আমি করিনি।

নবাব বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে—তাই নাকি? আপনি সাধু? মনে নেই, আমার কাছ থেকে লাখ টাকা চেয়েছিলেন একটা দস্তখত দেবার বিনিময়ে?

দর্প নিভে যায়। সে সহজ সত্যটা এতক্ষণে বুঝতে পারে? সেও হিসাবী মানুষ। বুঝতে পারে নবাব শেষ বয়সে হিসাব মেলাচ্ছে। সে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ায়।

—দাঁড়ান, যাচ্ছেন কোথায়?

—দপ্তরে। কিংবা আপনি যদি না চান, বাড়িতে চলে যাব।

—তাই কি হয়? আপনাকে আবদ্ধ থাকতে হবে কাছারি বাড়িতে। তহবিল তছরূপের জন্যে শাস্তি পেতে হয় সেকথা ভুলে গেলেন?

দর্পনারায়ণের চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টি ফুটে ওঠে। কিন্তু না, নবাবের চোখে কোনরকম কৌতুক নেই। সেই দৃষ্টি স্থির নিষ্ঠুর। শাস্তির ভয়ের চেয়েও অপমানে তার সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে।

সিপাহী এসে তাকে নিয়ে যায় কাছারি ঘরে সেখানে গিয়ে দেখে আরও দু-একজন হতভাগ্য সেই ঘরে রয়েছে। তাদের একজন তার পরিচিত। কিন্তু তাকে দেখে সেই ব্যক্তিও নিজের কথা ভুলে যায়। চোখে-মুখে তার বিস্ময়। সে জমিদার। সমস্ত জমিদারের মত সে জানে মুর্শিদকুলী খাঁ আজ নবাব হয়েছে যে কয়জন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির পরিশ্রমে দর্পনারায়ণ তাদের একজন।

ওদিকে রঘুনন্দন শুনলো, জয়নারায়ণ শুনলো। ওরা জানে, যে কোন কারণেই হোক নবাবকে দর্পনারায়ণ কখনো সুনজরে দেখেনি। নবাবকে যখন আজিম-উস্-সানের পরামর্শে ভূতপূর্ব বাদশাহ বাহাদুর শাহ দক্ষিণ ভারতে পাঠিয়েছিলেন তখন দর্পনারায়ণের আনন্দের সীমা ছিল না। তার মনোভাব কি নবাব জাফর খাঁ কোন-রকমে জেনে ফেলেছে। তবে দর্পনারায়ণ কখনো তহবিল তছরূপ করতে পারে না। সে কঙ্কর সেনের মত কাঁচা ব্যক্তি নয়। সে বরাবর ধনী হতে চেয়েছে, তবে হিসাবে গড়মিল ঘটিয়ে কখনো নয়। অনেকের মত রঘুনন্দন আর জয়নারায়ণও দর্পনারায়ণকে এভাবে বন্দী করে রাখার গূঢ়ার্থ আবিষ্কার করতে পারল না। জয়নারায়ণের বুদ্ধি যদি আর একটু স্বচ্ছ হতো তাহলে হয়ত সেই দস্তখত্ না দেবার ঘটনা তার মনে পড়ে যেত,

যাতে সে নিজে স্বাক্ষর দিয়েছিল। পিতার এই পরিণতিতে শিবনারায়ণ খুবই মর্মাহত হলো। পিতার জন্যে তার একটা গর্ববোধ ছিল। সেই গর্ববোধ গুঁড়িয়ে গেল। সারা বাড়িতে শোকের ছায়া নামলো।

সেই শোক গভীর হলো কদিন পরেই। সারা মুর্শিদাবাদবাসী জানলো, বন্দী-জীবনের কষ্ট প্রবীণ দর্পনারায়ণ সইতে না পেরে প্রাণত্যাগ করেছে। সবাই শুনলো, কিন্তু কেউ কোন মন্তব্য করল না। শিবনারায়ণ আত্মীয়স্বজনকে সঙ্গে করে পিতার মৃতদেহ নিয়ে গেল শেষকৃত্য করার জন্য। সেও কিছু বলল না।

অন্দরমহলে বেগমসাহেবা খবরটা শুনে তাজ্জব বনে গেল। সে শুধু বলে—তোমার ভীমরতি হয়েছে। এতদিনে বুঝতে পারছি তোমার দিন শেষ হয়ে এসেছে।

কোরাণ নকল করে উঠে কিছুক্ষণ পরে নবাব জবাব দেয়—তুমি তখন ঠিকই বলেছিলে বেগমসাহেবা। দেখলাম, নকল করতে আমার হাত কাঁপে, লেখা বেঁকে যায়। আগে আমার লেখার কত সুখ্যাতি ছিল। কত জায়গা থেকে পত্র পেতাম প্রশংসাসূচক। এখন কেউ পত্র দেয় না। আজ দেখলাম নকল করতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে। চোখেও কম দেখছি। তাই তো সব কাজ শেষ করে যেতে চাই। ভীমরতি না হোক বয়স হয়েছে।

—দর্পনারায়ণকে হত্যা করেছ তুমি।

—হয়ত তাই। বন্দী না করলে নিশ্চয় কয়েক বছর বেশী বাঁচতো। তাই বলে অপমানের প্রতিশোধ নেব না, এমন তো হয় না। হতে পারে না। সবার ওপর আমি প্রশাসক।

—সবার ওপরে তুমি মানুষ নও তাহলে।

—ওসব ভাবাবেগের কথা।

বেগমসাহেবা থমকে যায়। বলে—ও।

জিন্নৎ কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। অনেকদিন হলো সে সুজাউদ্দিনের কাছ থেকে বাংলায় চলে এসেছে। সুজাউদ্দিনের এখন বয়স হয়েছে। জনপ্রিয় সুশাসক হিসাবে উড়িষ্যাতে সে নামও কিনেছে। কিন্তু জিন্নৎ-এর সঙ্গে সম্পর্ক জোড়া লাগেনি।

পিতার কথা শুনে মায়ের মত সে-ও চমকে যায়। তারপর ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে—এতদিনে একটা কথা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

নবাব বলে—কি কথা।

—সৈয়দ রেজা, আমার নাফিসার স্বামীর অমন ফুলের মত মন কি করে বিকৃত হলো।

—আমার জন্যে ?

জিন্নৎ উন্নিসা সেকথার জবাব না দিয়ে চোখে ওড়না চাপা দিয়ে স্থানত্যাগ করল।

দর্পনারায়ণের শ্রাদ্ধশান্তি চুকলে নবাব একদিন তার পুত্র শিবনারায়ণকে ডেকে

পাঠালো। বাড়িতে আবার কান্না কাটি পড়ে গেল। শিবনারায়ণের স্ত্রী আছড়ে পড়ল স্বামীর পায়ের কাছে। তার ছেলে-মেয়েরা পিতাকে ঘিরে কাঁদতে লাগলো। শিবনারায়ণ গৃহদেবতার সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে গৃহত্যাগ করে। হয়ত তার শেষ গৃহত্যাগ।

দেওয়ানখানায় গিয়ে শিবনারায়ণ দেখে তাকে বেশ খাতির করা হলো। স্বয়ং নবাব সেখানে উপস্থিত আছে। তাকে নবাবের সামনে নিয়ে যাওয়া হলো।

নবাব জাফর খাঁ বলে—তুমি খুব আঘাত পেয়েছ জানি। কিন্তু উপায় ছিল না। আমার বিচারের কথা তুমি নিশ্চয় জান। আমি নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলেও রেহাই দিই না। লোকে আমাকে বলে আদালত গস্তার। দর্পনারায়ণের মৃত্যু আমার মনের অনেকটা খালি করে দিয়েছে।

নবাব একবার শিবনারায়ণের মুখের দিকে চায়। সেই মুখ ভাবলেশহীন। সে তখন মনে মনে শ্বাসে প্রশ্বাসে গৃহদেবতার নাম জপ করে যাচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে জয়নারায়ণ। তাকেও ডেকে পাঠানো হয়েছে। সে নবাবের উদ্দেশ্য অনুমান করার চেষ্টা করে করে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

নবাব শেষে বলে—আমি তোমাদের ডেকেছি দর্পনারায়ণের কানুনগোগিরি দুই ভাগে ভাগ করে দুজনকে দেব বলে।

জয়নারায়ণের চোখে উৎসাহ কিন্তু শিবনারায়ণ আগের মতই মূক।

নবাব বলে—আজ থেকে দর্পনারায়ণের কানুনগোগিরির দশ আনা শিবনারায়ণের বাকী ছয় আনা জয়নারায়ণের।

এতবড় সৌভাগ্য কখনো হবে বলে জয়নারায়ণ কখনো ভাবেনি। তবে শিবনারায়ণের মুখের রেখার কোন পরিবর্তন হয়নি।

নবাব শিবনারায়ণকে বলে—তুমি কি খুশী নও?

—হুজুর, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না এখনো। হয়ত কালকে সবটা বুঝতে পারব। তবে হঠাৎ যে দারিদ্র্যের মধ্যে পড়তে পারতাম, তা থেকে উদ্ধার পেলাম।

—ঠিক আছে, তুমি আজ তাহলে যাও। কাল থেকে এসো।

শিবনারায়ণের সঙ্গে জয়নারায়ণও চলে যাচ্ছিল। নবাব তাকে অপেক্ষা করতে বলে। শিবনারায়ণ কক্ষ ত্যাগ করলে নবাব বলে—তোমাকে ছয় আনা কেন দিলাম জান?

—অনেকদিন কাজ করছি হুজুর।

—না। মনে আছে তোমার? আমি প্রথম মুর্শিদাবাদে এসে নিজে বাদশাহ আলমগীরের কাছে রাজস্ব নিয়ে যাব বলে দর্পনারায়ণকে বলেছিলাম, হিসাবে দস্তখত করতে?

—হ্যাঁ হুজুর মনে পড়েছে।

—সে করেছিল দস্তখত?

—না হুজুর। কিন্তু আমি তো করে দিয়েছিলাম আপনি বলার সঙ্গে সঙ্গে।
—হ্যাঁ, সেই জন্যেই তোমাকে এই পুরষ্কার। আর দর্পনারায়ণকে শাস্তি।
জয়নারায়ণের মাথা টলতে থাকে।

এদিকে মোরাদ জীবনে প্রথম একটি বিরাট কাজের ভার পেয়ে সাপের পাঁচ পা দেখলো। সে আদেশ জারি করে দিল মুর্শিদাবাদ এবং সেখান থেকে হাঁটা পথে চারদিনের দূরত্বের মধ্যে হিন্দুদের কোন মন্দির থাকতে পারবে না। হিন্দুদের মধ্যে মহা আলোড়ন শুরু হলো। কিন্তু নবাবের কাছে খবরটা পেঁছে দেবে কে? কেউ সাহস পেল না। সবাই ভাবতে লাগলো, এটা নবাবের আদেশও হতে পারে। মসজিদ আর কাটরা তৈরী করার সহজলভ্য উপাদান হলো ভেঙে ফেলা মন্দিরগুলোর ইট পাথর আর কাঠ। একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হলো সারা অঞ্চলে। ওদিকে হিন্দু জমিদারদের শ্রমিকদের ধরে নিয়ে গিয়ে বেগার খাটানো শুরু হলো। দূর-দূরান্তের গ্রাম্য গরীব হিন্দুদের ভয় দেখানো হলো, তাদের ঘর বাড়িও ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করা হবে। তারা না খেয়ে না পরে নিজেদের মধ্যে অর্থ সংগ্রহ করে মোরাদকে তুষ্ট করলো।

এইভাবে মসজিদ তৈরীর কাজ দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগলো। আর হিন্দুরা ভাবতে থাকে, মোরাদের রাজত্ব কবে শেষ হবে। এমন অরাজকতা তারা জীবনে দেখেনি। তারা জানত নবাব গরীবদের কখনো কষ্ট দেয় নি। অনেক অত্যাচার করেছে বটে কিন্তু গরীবরা কখনো অত্যাচারিত হয়নি। অথচ এখন এই মুর্শিদাবাদের আশে-পাশের মানুষদের মনে সন্দেহ জাগতে শুরু করেছে। তারা ভাবে, এত কাণ্ড যে ঘটে চলেছে, নবাবের কানে কি তার কিছুই পেঁছোয় না। নবাবের যে সমস্ত চর সারা দেশে ছড়িয়ে আছে তারাই নাকি তার চোখ তার কান। সেই সব চোখ কি অন্ধ হয়ে গিয়েছে? সেই সব কান কি কালা হয়ে গিয়েছে।

নবাবের চিরকালের সাথী বেগমসাহেবা এখন কিছু বলা ছেড়ে দিয়েছে। তার নিজেরও বয়স হয়েছে। তাছাড়া দর্পনারায়ণের প্রসঙ্গ আর একদিন ওঠায় কন্যা জিন্নৎ আর দৌহিত্রী নাফিসার সামনে নবাব একটু বিদ্রূপ করেছিল। সেদিন নিজেকে খুব অপমানিত বোধ হয়েছিল বেগমসাহেবার। শেষে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে স্বামীর কাছে এমন ব্যবহার পেতে হলো? তাও জিন্নৎ আর নাফিসা সাক্ষী? কী হবে আর ওর নবাবী নিয়ে মাথা ঘামিয়ে? কয়েক বছর ধরে লোকটা নিজের কথা

ছাড়া কিছুই ভাবতে চায় না। এখন তার একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে কবে মরবে আর কোথায় তাকে সমাহিত করা হবে। আর এই সমাহিত করার ব্যাপারে যে মোরাদের মত একটা খল চরিত্রের মানুষের ওপর ভার দিয়ে বসবে কে জানত? কবে কোন্ বিস্মৃত অতীতে মোরাদ নিজের জীবন বিপন্ন করে তার প্রাণ বাঁচিয়েছিল! সুতরাং ওর সাত খুন মাফ। ও যে মুর্শিদাবাদের আশেপাশের অঞ্চলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, হিন্দুদের মনে নবাবের বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষ সৃষ্টি করছে একথা শুনেও শুনতে চায় না নবাব জাফর খাঁ। একটার পর একটা পাথর আর ইঁট বসিয়ে মসজিদ উঠছে, আর নবাবের স্বপ্ন দীর্ঘতর হচ্ছে।

শেষে কাটরার মসজিদ গড়া শেষ হলো। হিন্দুরা হাঁফ ছাড়লো। নবাব নিজে গেল দেখতে। দেখে মুগ্ধ হলো। নিজেকে যেখানে সমাহিত করা হবে সেই স্থানটিও দেখল নবাব। হ্যাঁ, একটা আদর্শ স্থান বটে।

মোরাদ নবাবের মন্তব্য শোনার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল।

নবাব বলল—সুন্দর কাজ হয়েছে মোরাদ। তোমার কাজে আমি খুশী।

মোরাদ বিগলিত হয়। সে বলে—আশেপাশে ক্রোশের পর ক্রোশ গেলেও কেউ হিন্দুদের একটা মন্দির খুঁজে পাবে না হুজুর। সব সাফ্ করে দিয়েছি।

নবাব মনে মনে ভাবে, সবই সে জানে। তাই বলে মোরাদ উচিত কাজ মোটেই করেনি। তাকে উৎসাহও সে দেবে না। আবার এত খেটেখুটে একটা চমৎকার জিনিস তৈরী করেছে। সুতরাং নিরুৎসাহিতও করবে না। এটাই হলো প্রশাসনের মূল কথা। একজনকে একটা কাজের ভার দিয়ে পদে পদে সেই কাজে বাধা সৃষ্টি করলে আসল কাজ হয় না। সে যদি বাড়াবাড়ি করে ফেলে সেটুকু না দেখার ভান করে থাকতে হয়। তবে এইসব বাইরের অত্যাচারে মানুষের মন বিষিয়ে যায়। বয়স যদি তার কম থাকত, যদি সে সঠিক ভাবে জানতে পারত কবে তার মৃত্যু হবে, তাহলে মোরাদের ওপর ভার দেওয়া হতো না কখনো। খুব তাড়াতাড়ি কাজটা করাতে চেয়েছিল বলেই মোরাদের ওপর ভার দিয়ে চোখ বুঁজে বসেছিল। যদি মসজিদ গড়ে ওঠার আগেই তার মৃত্যু হয়?

হিন্দুদের রাগের কারণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু তারা কি বুঝবে না, সে দেওয়ান হয়ে আসার আগে এই বাংলার প্রশাসনে তাদের কোন স্থানই ছিল না। তারা কি বুঝবে না, দেশের টাকার ভাগ তারা ছিটেফোঁটাও পেত না। আজ সব বড় বড় পদগুলো হিন্দুদের। সেনাবিভাগেও তারা বড় বড় পদ পেয়েছে। আজ দেশে ধনী হিন্দুর সংখ্যা অনেক বেশী। সব জমিদারই হিন্দু। এসব কি কেউ বুঝবে না। শুধু তার অত্যাচারের কথাই মনে গেঁথে থাকবে?

সারাজীবন দুনৌকোতে পা দিয়ে তাকে চলতে হলো। সে খাঁটি মুসলমান, অথচ ভূপতি আর কিশোর তার ভাই। একটু আধটু বাড়াবাড়ি না করলে মুসলমানেরা যে

তার অতীতকে খুঁচিয়ে তুলবে। হয়ত হিন্দুদের জন্যে এত কিছু করার অন্য অর্থ খুঁজে বের করবে।

সেদিন ছিল আষাঢ়ের ঠিক মাঝামাঝি। সকাল থেকে অঝোরে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির কান্নার যেন বিরাম নেই। আগের দিনও অনেক কষ্টে উঠে নমাজ পড়েছে নবাব জাফর খাঁ। কিন্তু সেদিন সূর্য ওঠার অনেক আগে থেকেই তার শরীর অবশ হয়ে আসে।

বেগমসাহেবা গিয়ে লক্ষ্য করে নবাবের যে বাঁদী সেবা করছে সে সারারাত জেগে পাশে বসে ঢুলছে। একটু পরেই নমাজের সময় হবে। নবাবকে এখন ওঠাতে হয়।

ধীরে ধীরে নবাবের শিয়রে গিয়ে দাঁড়ায় বেগমসাহেবা। মনে হয় নবাব ঘুমে অচেতন। এই দুর্বল শরীরে ঘুমের ব্যাঘাত করা কি ঠিক হবে? নবাবের সেবা যে করছিল সে সামান্য শব্দে জেগে উঠে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে।

বেগমসাহেবা তাকে বলে—হাকিমকে ডেকে আনো।

হাকিমের থাকার জন্য অদূরে একটি কক্ষ নির্দিষ্ট করা আছে। সে ছুটতে ছুটতে গিয়ে হাকিমকে ডেকে আনে।

বেগমসাহেবা বলে—নবাব ঘুমোচ্ছেন। অথচ নমাজের সময় চলে যাচ্ছে। ওঁর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানো কি ঠিক হবে?

হাকিম একটু ভেবে নিয়ে নবাবের শয্যার পাশে মাটিতে বসে তার একটি হাত সযত্নে তুলে নিয়ে নাড়ি পরীক্ষা করতে গিয়ে চমকে ওঠে। আতঙ্কে তার চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। নাড়ি ছেড়ে দিয়ে সে নবাবের বুকের কাছে কান পাতে। কিছু শুনতে পায় না। কম্পিত হাত বুকে রাখে। হ্যাঁ, একটু স্পন্দন অনুভূত হলো কয়েকবার। তারপরেই থেমে গেল।

হাকিম কেঁদে উঠে বলে—নবাবের এই মাত্র মৃত্যু হলো।

কথাটা যেন অনেকদূরে থেকে ভেসে আসছে বলে মনে হলো বেগমসাহেবার। সে একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল। আজীবনের অটুট সম্পর্ক জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যেন সামান্য একটু নাড়া লেগেছিল। মানুষটা এককালে ছিল সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। শেষের দিকে একটু অধৈর্য একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠতো। কিন্তু সেটা কিছুই নয়। একটা বিরাট গাছ সারাজীবন ঝড় ঝাপটা সামলায়—তার এক আধটা ডালের ক্ষতি হতে পারে। এটা কিছুই নয়। গাছের আড়ালে থেকে কত কি ভাবা যায়। ঝড়ের ঝাপটা তো খেতে হয় না।